ছবি কাকে বলে

অশোক মিত্র

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৯

প্রথম সংস্করণ

প্রচ্ছদ : ভিনাসের জন্ম। শিল্পী বত্তিচেল্লি

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ফণিভূষণ দেব কর্তৃক ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলিকাতা ৭০০০০৯ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ প্রেস এণ্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক পি-২৪৮ সি আই টি স্কীম নং ৬ এম কলিকাতা ৭০০০৫৪ থেকে মুদ্রিত।

মূল্য ৩০·০০

স্বীকৃতি

আনন্দবাজার পত্রিকা প্রতিষ্ঠানের শ্রীযুক্ত কানাইলাল সরকার ও শ্রীযুক্ত নিখিল সরকার বইটির পাণ্ডুলিপি বিষয়ে উৎসাহ প্রকাশ না করলে এবং শ্রীযুক্ত সাগরময় ঘোষ 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশে সাগ্রহে সম্মত না হলে বইটি আদৌ পাঠকের হাতে পৌঁছতো কিনা সন্দেহ। শ্রীযুক্ত সাগরময় ঘোষ বইটিতে আলোচিত চিত্রাদি মুদ্রণে কার্পণ্য হবে না আশ্বাস দেওয়ায় আমি বিশেষ উৎসাহিত বোধ করি। তাঁর তৎপরতা ও আগ্রহে দীর্ঘ-পাঁচ মাস ধরে 'দেশ' পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে রচনাটি প্রকাশিত হওয়ায় আমি বিশেষ সার্থকতা লাভ করেছি। আশা করি 'দেশ' পত্রিকার পাঠক-পাঠিকাবৃন্দও কিছু আনন্দ পেয়েছেন।
শ্রীযুক্ত বিপুল গুহ আমার বাছাই করা ছবিগুলি একে একে 'দেশ' পত্রিকায় যে-ভাবে সন্নিবেশ করেন, তা যেমন সুচিন্তিত তেমনি মনোজ্ঞও হয়। রচনার সঙ্গে বর্ণিত ছবির সংযোজনে চিত্রকলা সম্বন্ধে তাঁর গভীর বোধ ও জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে আমি বিশেষ তৃপ্তিলাভ করি।
শ্রীযুক্ত বাদল বসু ও শ্রীযুক্ত বিপুল গুহ বইটির মুদ্রণ বিষয় সমস্ত ভার নিয়ে আমাকে বিশেষ নিশ্চিন্ত করেন।
এঁদের সকলকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।
এই বইটির পরিপূরক হিসেবে আমার লেখা পশ্চিম ইউরোপের চিত্রকলা ও ভারতের চিত্রকলার পুনঃ প্রকাশভার আনন্দ পাবলিশার্স গ্রহণ করেছেন। সে দুটি বইয়ে এই বইটির নানা ইঙ্গিত সুস্পষ্ট হতে পারে।
সূচনায় উল্লিখিত যাঁদের জন্য বইটি লেখা তাঁদের বোধ ও মতামত যদি আমার বোধ ও মতামতকে অতিক্রম করে তবেই আমার শ্রম সার্থক হবে।

নতুন দিল্লী

অশোক মিত্র

সূচনা

আমেরিকার মেরিয়ন পেনসিলভ্যানিয়ার বার্ণস্ ফাউণ্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা অ্যালবার্ট সি বার্ণস্ (Barnes) চিত্রদর্শন বিষয়ে একটি বই লেখেন। বার্ণস্ মাতিসের শিল্পসৃষ্টি সম্বন্ধেও একটি প্রামাণ্য বই লেখেন। মাতিস, রেণোয়ার প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত শিল্পীদের তিনি বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বিরাট ধনী ছিলেন। বার্ণসের অনুরোধে মাতিস বার্ণস্ ফাউণ্ডেশন গৃহে ১৯৩৪ সালে কয়েকটি মিউরাল সৃষ্টি করেন। সমসাময়িক প্রখ্যাত চিত্রৈতিহাসিক ও সমালোচকদের অনেকে বার্ণস্‌কে উৎকেন্দ্রিক বা খেয়ালী চিত্রামোদী ধনী বলে উল্লেখ করে চিত্র বা শিল্পরস বিষয়ে তাঁর রচনার অধিকার সম্বন্ধে কখনও ঠারে-ঠোরে, কখনও বা সোজাসুজি, সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। অন্যপক্ষে আলেকজাণ্ডার রমের মত সর্বজনগ্রাহ্য পণ্ডিত ও বিদগ্ধ চিত্ররসিক ও শিল্প সমালোচক বার্ণসের মতামতকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করতেন।

বার্ণসের চিত্রদর্শন-বিষয়ক বইটি ১৯৫৩ সালে কিছুদিনের জন্য শ্রীযুক্ত যামিনী রায় মহাশয় আমাকে পড়তে দেন। বইটি পেয়ে আমি বিশেষ উত্তেজিত বোধ করি। তার আগে ওঅল্টার পেটার থেকে শুরু করে রজার ফ্রাই, হার্বার্ট রীড প্রভৃতি বহু লেখকের রচনায় চিত্রনিহিত সাহিত্যিক বা কাব্যিক রসের আলোচনা পেয়েছি কিন্তু ছবির রক্ত, মাংস, ফুস্‌ফুস, পাকযন্ত্র , কঙ্কালের কৃপায় কিভাবে প্রাণস্পন্দন হয় তার বিশদ আলোচনা পাইনি। সেজন্য অধিকাংশ লেখা ভাসাভাসা অথবা কথার ভুরভুরি মনে হয়েছে। বার্ণার্ড বেরেন্‌সনের 'থ্রি এসেজ ইন মেথড' বাদে এই প্রথম একটি বই পেলুম যা চিত্রশাস্ত্র আলোচনায় চিত্রের হাড়গোড়, রক্ত-মাংস, ত্বক, আকার, বিষয়ে লেখা। ঠিক যেমন ক্লোদ মনে'কে ভাল লাগতে গেলে জানতে হবে কেন তিনি, কি ভাবে তিনি, ইওরোপীয় পরিপ্রেক্ষিত ঘুচিয়ে দিয়ে ছবির সম্মুখভূমি, মধ্যভূমি ও পশ্চাদ্‌ভূমি পরিষ্কার আলাদা প্রায় সমান্তরাল ভাবে আঁকলেন, অনেকটা প্রাচ্য পরিপ্রেক্ষিতের রীতিতে, যেন তিনি মধ্যভূমির অন্তরীক্ষে অচঞ্চল অবস্থায় থেকে ঘরটা নিরীক্ষণ করছেন (যার সবচেয়ে প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাই প্যারিসের অরাঁজ্‌রির বা

নিউইয়র্কের মিউজিয়ম অব মডার্ণ আর্টে ওয়াটার লিলিজ সিরিজে)। অথচ সেই সঙ্গে তাঁর নিজস্ব আলোর খেলা দিয়ে অন্য নতুন পরিপ্রেক্ষিতের সৃষ্টি করলেন। এর কাঠামো এবং ব্যাকরণ যতক্ষণ না কেউ হাতে পাঁজি মঙ্গলবার করে বুঝিয়ে দিচ্ছে বা বুঝছে ততক্ষণ মনে' সম্বন্ধে আহা উহু উচ্ছ্বাসই সম্বল থাকবে। পরিতোষ সেন ভারতীয় মিনিয়েচারকে প্রথমে বিরাট আকার দিয়ে পরে তাকে কিভাবে ভাঙ্গলেন এবং পুনর্গঠন করলেন, এবং সে পুনর্গঠনে কী ধরনের ইওরোপীয় সাহায্য নিলেন, এর ব্যাকরণ কিছুটা না বুঝলে তাঁর সম্বন্ধে কাতরোক্তি ছাড়া অন্য পাথেয় থাকে না। আবেগ মোড়া সংশ্লেষণের পূর্বে বিশ্লেষণের প্রয়োজন।

বর্তমান রচনাবলী মূলত বার্ণসের বিষয়সূচী অবলম্বনে লিখিত। বস্তুত বার্ণসের মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গী. যুক্তি, বিশ্লেষণ, বক্তব্য তখন আমার বহু ক্ষেত্রে এত সম্যক অথচ স্বল্পভাষী, যথার্থ অথচ শ্রদ্ধাবান বোধ হয়েছিল যে এই রচনাবলীতে আমি তাঁর বই মুখ্যত অনুবাদ আকারে রেখে, তাকে পরিবর্ধিত করে উপস্থাপিত করেছি মাত্র। মৌলিকতার দাবী আমার সীমিত। পরবর্তীকালে বহু চেষ্টা সত্ত্বেও আমি বার্ণসের বইটি পুনরায় সংগ্রহ করতে পারিনি। ফলে বইটির নাম, বিবরণ, মুদ্রণের সন তারিখ ইত্যাদি বিষয়ে ঋণ স্বীকার করা এখানে সম্ভব হলো না। তবুও আশা করি সুধীসমাজ বার্ণসের প্রতি আমার এই খণ্ডিত অথচ সকৃতজ্ঞ ঋণ স্বীকার যথেষ্ট বিচার করে প্রসন্ন মনে গ্রহণ করবেন।

যে-সময়ে আমি এই প্রবন্ধাবলীর খসড়া প্রস্তুত করি, সে-সময়ে ইংলণ্ডের কয়েকটি চিত্রশালা ব্যতীত অন্যান্য দেশের চিত্রশালার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না। তখনও সারা ভারতময় ঘোরার সুযোগ হয়নি। এই রচনার অধিকাংশ মন্তব্য আমি নানা অ্যালবামে মুদ্রিত ছবির উপর ভিত্তি করে প্রথমে লিখি। অবশ্য এটাও এখানে বলা প্রয়োজন আজকাল ছবির মুদ্রণ, বিশেষত সুবিখ্যাত মুদ্রণাগার হলে, এত ভাল হতে পারে যে, যে-কোন মূল ছবির অধিকাংশ গুণাগুণ মুদ্রণে প্রতিফলিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে গ্যানেমীড কর্তৃক তাঁর চিত্ররাজির অ্যালবাম মুদ্রণ। সেই দ্বিধাহেতু আমি বহুবছর পাণ্ডুলিপিটি ফেলে রেখেছিলুম। পরবর্তীকালে নানা দেশের চিত্রশালায় এই রচনায় উল্লিখিত অনেক মূল ছবি দেখার সুযোগ ঘটে। তার ফলে পাঠক প্রত্যয়ের দৃঢ়তা এই প্রবন্ধগুলিতে কিছুটা পাবেন। ইতিমধ্যে শ্রীযুক্ত পৃথ্বীশ নিয়োগী ও মহাশিল্পী ও সর্ব দেশের ঐতিহ্যে বিচরণকারী

শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছেও আমি নানা বিষয়ে অবহিত হবার এবং শিক্ষা লাভ করার সুযোগ পাই। তাঁদের কাছে আমার ঋণ অপরিশোধ্য। কিন্তু আমার নিজস্ব ভুল ত্রুটি বা গলদের জন্য তাঁরা কোন মতেই দায়ী ন'ন, এমন কি বার্ণসও ন'ন। এই রচনার প্রথম কিছু অংশ শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত সুভো ঠাকুর মহাশয় তাঁর 'সুন্দরম' পত্রিকায় প্রকাশিত করেন। সেও প্রায় পঁচিশ বছর আগের কথা। সুতরাং আমার নিজস্ব অনেক মন্তব্যে পাঠক অল্প বয়সের তীক্ষ্ণতা, রূঢ়তা এবং ঔদ্ধত্য পাবেন। এমন কি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ও মহান শিল্পীদের কিছু কিছু কাজ সম্বন্ধেও পাঠক এমন সব মন্তব্য পাবেন যা হঠোক্তির সামিল মনে হতে পারে। পাণ্ডুলিপি সমর্পণ করার আগে ভেবেছি অনেক মতামত বাদ দেবো কিনা, বা ভাষা বদলে দেবো কিনা, বিশেষত সে-সব ক্ষেত্রে যেখানে আমাদের স্বাজাত্যাভিমান অনেক কিছু মেনে নিতে দ্বিধাগ্রস্ত করে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অল্পবয়সকালের অভিমত অপরিবর্তিত রেখেছি। তার কারণ এখনকার বয়সে শিক্ষক হিসাবে নিত্যই বুঝতে পারি, আমি যেখানে রেখে ঢেকে গোঁজামিল দিয়ে কথা বলতে চাই, সেখানে আমার ছাত্রছাত্রীরা রূঢ় শোনালেও, অনেক বেশী স্পষ্ট, সত্যবাদী এবং যুক্তিবাহী।

এই বই পড়ে ছবি সম্বন্ধে নবীন বয়সের পাঠক ও শিক্ষার্থীর মনে যদি নানা প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা, আপত্তি বা যুক্তিপ্রসূত বিপরীত মতের উদ্রেক হয় তবে আমার শ্রম সার্থক হবে।

নতুন দিল্লী

অশোক মিত্র

প্রথম ভাগ : চিত্রলক্ষণ

ছবি দেখতে শেখা

যে কোন দেশ ও কালের চিত্রকলার রসাস্বাদ কিভাবে করতে হয়, সেই রসাস্বাদের মূলে কি কি থাকে, এই রচনায় তার অবতারণা করা হয়েছে। প্রথমভাগে আমরা খুব সংক্ষেপে চিত্ররসের সাধারণ লক্ষণগুলি নিয়ে আলোচনা করব। দ্বিতীয়ভাগে বলব কেমন করে চিত্রের বিচার করতে হয়, কি করে যে কোন ছবি ভাল ভাবে দেখে তার থেকে আনন্দ পেতে হয়। পরিশিষ্টে ভারতীয় ছবি কি করে আঁকা হয়, ছবি আঁকার বিভিন্ন রীতি পদ্ধতি সম্বন্ধে মোটামুটি আলোচনা করে যে-কোন ছবি কিভাবে বিশ্লেষণ ও বিচার করতে হয় তার কয়েকটি উদাহরণ দেব। তবে কোনখানেই পাঠক যেন না মনে করেন যে চিত্রবিচার বা রসাস্বাদের একমাত্র পথের নির্দেশ দেবার স্পর্ধা এই রচনার কোথাও করা হয়েছে। যেখানেই কোন মতামত জোর করে বলা আছে, সেটা তিনি অনেক মতের মধ্যে একটি মত বলেই যেন ধরেন। কোন মতই চূড়ান্ত মত হতে পারে না, ঠিক যেমন সৃষ্টির কোন ব্যাখ্যাই চূড়ান্ত ব্যাখ্যা হতে পারে না।

রসাস্বাদ কথাটিকে এখানে ইংরেজিতে ইস্থেটিক এক্স্পিরিয়েন্সের সামিল করা হয়েছে। চিত্রকলার প্রকৃত রসাস্বাদের পথে আমাদের অনেক বাধা উপস্থিত হয়। আমরা যে সমাজে বাস করি সে সমাজ শিল্পকলা সম্বন্ধে উদাসীন। সেই সমাজে প্রত্যহ বাস করার ফলে আমাদের অগোচরে যে সমস্ত অভ্যাস এবং ধ্যানধারণা আমাদের চৈতন্যকে আবৃত করে, কালক্রমে সেগুলি রসাস্বাদের পথে বিশেষ অন্তরায় হয়ে ওঠে। যখন চিত্ররসবহির্ভূত অন্যান্য কারণ এসে রসবোধের পথ আটকিয়ে দাঁড়ায়, তখন সেগুলি আমাদের প্রায়ই ভুল পথে নিয়ে যায়, বিভ্রান্তি ঘটায়, রসের মূল্যবিচারে গণ্ডগোলের সৃষ্টি করে। ব্যবহারিক, ভাবাবেগজাত, অথবা সামাজিক বিচারে দুর্নীতি সুনীতির মূল্যবোধ চিত্ররসের প্রকৃত বিচারে অনেক সময়ে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং ছবির প্রকৃত মূল্য কিসে আসে সে বিচারের আগে কিসে সে মূল্য কোনমতেই আসে না প্রথমে সেটুকু স্পষ্ট করে বলা দরকার।

চোখে যেমনটি দেখছি তার যথাযথ ফোটোগ্রাফিক প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি করা

ছবির কাজ নয়। বিষয়বস্তুর নিখুঁত, হুবহু প্রতিচ্ছবি অথবা নথি প্রমাণ হিসেবে সার্থকতা অসার্থকতা ছবির আসল মূল্য নয়। নিছক অনুকরণে বিষয়বস্তুর আসল সত্তা বা চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য ফুটে বেরোয় না, আর যার মূল্য নথি বা প্রমাণ হিসেবেই মুখ্য তারও ব্যবহারিক মূল্যই প্রধান। বাহ্য গুণাগুণ এবং লক্ষণ ক্যামেরা খুব ভালভাবেই নথিবদ্ধ করে, কিন্তু বাহ্যরূপের অন্তরে কি লুকিয়ে আছে তার সন্ধান ক্যামেরা দেয় না। আর আমরা ছবির কাছে ঠিক এইটেই দাবী করি। বস্তুর বাহ্যরূপের তলায় কি গুণাগুণ আছে, তাদের স্বরূপ কি, কোন ঘটনা বা বিশেষ অবস্থার অন্তর্নিহিত মূল্য, তাৎপর্য কি, চিত্রে আমরা তাই দেখতে চাই, তারই রসসৃষ্টির মাধ্যমে অভিভূত হতে চাই ; অর্থাৎ আমাদের সাহায্য না করলে আমাদের না দেখালে আমরা নিজে নিজে যা কোনদিন দেখতে পেতুম না, চিত্রশিল্পী আমাদের সেই জিনিস দেখতে শেখান, সে বিষয়ে চোখ খুলে দেন। এইভাবে দেখতে শেখাতে গিয়ে, চোখ খুলে দিতে গিয়ে তাঁকে কতগুলি ব্যবস্থার সাহায্য নিতে হয় : যেমন, সাধারণ জিনিস যেভাবে সাজানো দেখতে আমরা অভ্যস্ত তাদের চিরাচরিত রূপ এবং আকার তিনি কিছুটা বদলে দেন ; তার পরিবর্তে তাদের এমনভাবে সাজান, তাদের এমন এক রূপের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করান যা হয়ত ফোটোগ্রাফির দিক দিয়ে মোটেই যথাযথ নয়। উপরন্তু চিত্রশিল্পীর কাছে আমাদের দাবী বেড়েই চলে। যেমন, আমরা প্রাকৃতিক দৃশ্যের চিত্রে আশা করি যে শিল্পী তাতে প্রকৃতির প্রাণরহস্যের আভাস দেবেন ; প্রতিকৃতি বা পোর্ট্রেটে আশা করি যে শিল্পী যাঁর প্রতিকৃতি এঁকেছেন তাঁর চরিত্রটি বা বিশেষ লক্ষণগুলি, ঠিকমত ফুটিয়ে তুলবেন। বলা বাহুল্য এসব আভাস বা লক্ষণ ক্যামেরার নাগালের বাইরে ; নথি-দলিলের মধ্যে কোন মতেই আবদ্ধ থাকবার নয় ; এসব বিষয় নিতান্তই শিল্পীর বিচারবোধের কথা।

একটা নিতান্ত ভুল ধারণা খুব প্রচলিত আছে। সাধারণত লোকের ধারণা যে ছবিতে একটি গল্প থাকা চাই, আর শিল্পীর উৎকর্ষ প্রমাণ হয় সেই গল্পটি তিনি কত ভাল করে রসিয়ে, অথবা নীতিসুধারসে সিঞ্চিত করে, বলতে পারেন তার উপর। এ ধারণা অন্যায়ও নয় অস্বাভাবিকও নয়। তার কারণ আমরা সকলেই জীবন সম্বন্ধে আগ্রহশীল এবং বাস্তবজীবনে বাস্তব জিনিস বা বাস্তব ঘটনা আমাদের মনে যে কৌতূহলের সৃষ্টি করে ছবিতেও আমরা অনেক সময়ে তা প্রতিফলিত দেখতে চাই। সার্থক চিত্রে গল্প থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে ; যদি থাকে তবে

চিত্রবিচারে সেটা অধিকন্তু। কারণ ছবির একমাত্র সত্যবিচার হয় রসোত্তীর্ণ প্ল্যাস্টিক শিল্পসৃষ্টির কাজে শিল্পী তাঁর উপাদান কতখানি সার্থকভাবে নিয়োগ করেছেন তার উপর ; সেখানে ছবির আখ্যানটি কতখানি সার্থকভাবে বলা হয়েছে, অথবা তার নীতি উপদেশটি কত মহৎ, সে প্রসঙ্গ অবান্তর। মুশকিল হয় যখন এই বিভিন্ন বিচারের জগৎগুলি আমরা গুলিয়ে ফেলি ; অর্থাৎ চিত্রের সাহিত্যিক মূল্য বা নীতিগতমূল্য আমরা তার চিত্রগত মূল্যের তুল্যমূল্য বলে ভুল করি। ছবিকে সাহিত্যিক রস বা সুনীতি প্রচারের ক্ষেত্র বলে ধরে নিই। অধিকাংশ লোকের পক্ষে এই ভ্রমটিই দুস্তর বাধা হয়ে দাঁড়ায়। (চিত্র ১)।

চিত্ররসানুভূতির পথে আরেকটি খুব বড় অন্তরায় আছে। আমরা সাধারণত নিছক নৈপুণ্য, কৌশল, ওস্তাদি, বাহাদুর কাজকে রসোত্তীর্ণ শিল্পের শামিল করি, ভাবি যে-কাজে যত কৌশল, দক্ষতা থাকবে ততই তা রসোত্তীর্ণ, শুদ্ধ শিল্প হবে এরকম ভুলকে খুব দোষ দেওয়া যায় না, কারণ চিত্রকলা ত শুধু সৃজনীপ্রতিভার প্রকাশ নয়, তার মধ্যে কারিকরিও যথেষ্ট থাকে ; চিত্রশিল্প এক ধরনের হাতের কাজ, বিশেষ এক ধরনের টেকনিক আয়ত্ত ও প্রয়োগের মধ্যেই তার প্রকাশ হয়। অন্যান্য হাতের কাজের কারিকরির মতই ছবি আঁকার ব্যাপারে স্বভাবপটুত্বের সঙ্গে চাই শিক্ষা ; তার উপরে অনুশীলন থাকলে মানুষ আস্তে আস্তে রঙের তুলি ব্যবহার করতে শেখে। সুতরাং শতেক কারিকরের মধ্যে যেমন এক আধজনই ওস্তাদ বা সেরা কারিকর হতে পারে তেমনি শত শত নিপুণ চিত্রকরের মধ্যে এক আধজনই সত্যকারের ভাল চিত্রশিল্পী হতে পারেন। ছবিতে এই সব টেকনিক্যাল কৌশল চেনবার বিদ্যা আয়ত্ত করা খুব কঠিন নয়, কিন্তু টেকনিক্যাল কৌশলপ্রসূত কাজের মধ্যে কোনটি মহৎ, কোনটি বা মামুলি, তা চেনবার বিদ্যা আয়ত্ত করা সত্যই শক্ত ; শত শত নিপুণ কাজের মধ্যে কোনটি শিল্পীর প্রতিভামণ্ডিত, অভ্রান্ত চোখে বার করা খুবই কঠিন। চিত্রশিল্পে শুধু নৈপুণ্য এবং কৌশল খোঁজা, আর পাণ্ডিত্যাভিমান বা অ্যাকাডেমিক দক্ষতা সম্বন্ধে ভক্তি, একই কথা, তাতে মানুষ শাঁসটি ফেলে খোসাটি ধরে, কায়ার বদলে ছায়াকে সত্য মনে করে, সোনা ফেলে আঁচলে গেরো দেয় (চিত্র ২)।

দ্বিতীয় ভুলটি প্রথম ভুলের চেয়ে অনেক বেশী মারাত্মক। কারণ শিক্ষার্থী যখন প্রথম ছবি দেখতে শুরু করে, বর্ণনা আখ্যান সাহিত্যিক রস বা ফটোগ্রাফসুলভ যাথাযথ্যের সঙ্গে চিত্ররসের গোলমাল করে ফেলেন,

তখন সেটা খুব মারাত্মক দোষ হয় না এই হিসেবে, যে তিনি জানেন যে তাঁর ভুল হবে, কারণ তিনি সবে শিখছেন। কিন্তু অ্যাকাডেমিশিয়ান বা অ্যাকাডেমিক শিল্পী অথবা সমালোচক, যিনি মহারথীদের কাজের কৌশল সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল, তিনি মনে করেন তিনি সব শিখে ফেলেছেন, তাই তাঁর মন নিছক চিত্রকৌশল বা টেকনিক ছাড়া অন্য সবকিছুর অস্তিত্ব অস্বীকার করে ; তিনি খোলামনে অনাবৃত চোখে দেখতে ভুলে যান(চিত্র ১৩)। অতীতের প্রাণস্পন্দন ও আত্মা, অতীতের সৃষ্টরূপে ও ফর্মে যেভাবে আবদ্ধ আছে তাঁর চোখ শুধু তাতেই নিবদ্ধ থাকে, ফলে তাঁর সমসাময়িক কাজে তিনি সেই প্রাণের স্ফুরণ, প্রকাশ ও ব্যঞ্জনাকে অবহেলা করেন, এমনকি তাঁর চোখে আঙুল দিয়ে সেইসব অভিব্যক্তি দেখিয়ে দিলেও তিনি তা দেখতে চান না। ঠিক এই কারণেই যুগে যুগে শিল্পজগতে যেসব নিত্য নতুন আন্দোলন হয়েছে তার সবচেয়ে দুর্ধর্ষ শত্রু হয়েছেন অসহিষ্ণু, বিরুদ্ধবাদী, কুৎসাব্রতী, পণ্ডিতম্মন্য অ্যাকাডেমিশিয়ানের দল, অনুৎসুক জনসাধারণ নয়। কারণ জনসাধারণ জানতে বা বুঝতেও পারে না যে এই ধরনের পণ্ডিতরা যা বলেন তা শুধু চিত্রের কলাকৌশল বা টেকনিক সম্বন্ধেই প্রযোজ্য, তার শুদ্ধ শিল্পসত্তা সম্বন্ধে নয় ; ফলে তারা সেসব কথা শুনে খুব চমৎকৃত হয়। অবশ্য পণ্ডিতদের উক্তি জ্ঞানত দুরভিসন্ধিজাত নাও হতে পারে, এবং খুব সম্ভবত নিশ্চয়ই দুরভিসন্ধিপ্রণোদিত হয় না। তার কারণ যিনি চিরকাল পুরনো চেনা জিনিস নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেছেন, তাঁর কাছে যে কোন নতুন জিনিসের নতুনত্বই সবিশেষ পীড়াদায়ক হয়, বিরক্তি ঘটায়। পুরনো, বহুযত্নে সঞ্চিত, বহুমূল্য অভ্যাসের মূলে টনক নড়ে, যুদ্ধ ঘোষণার শোরগোল পড়ে যায় (চিত্র ৩)। যে সব বিচারের রায় অনেকদিন জারি হয়ে গেছে, সেসব সিদ্ধান্তের সঙ্গে বহুদিন ধরে অ্যাকাডেমিক পণ্ডিত একমত থাকার দরুন তাঁর কাছে তখন সেসব অভিমত অতিপ্রিয় হয়ে গেছে ; সেগুলি ঝেড়ে ফেলা বা উল্টে দেয়া তাঁর পক্ষে তখন খুবই কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। তখন স্বাভাবিক জাড্য ও স্থবিরত্বের সঙ্গে অহঙ্কার এসে যোগ দেয়। দুইয়ে মিলে যা মৃত তার পক্ষ নিয়ে, যা জীবন্ত তার বিরুদ্ধাচরণ করে।

জনসাধারণ কোনদিন প্রকৃতপক্ষে ঠিকমত দেখতে শেখেনি বলেই এইসব ভুল ও গোলমাল আরও প্রশ্রয় পায়। সাধারণ লোক চেনাজানা জিনিস চিনতে পারে ; তার মধ্যে কোন্ কোন্ লক্ষণগুলি ব্যবহারিক জীবনে কাজে লাগবে অথবা বাস্তবজীবনে ভাবাবেগের সহায় হবে তা সে

জানে ; কিন্তু এই ধরনের চেনা বা জানার সঙ্গে প্রকৃত দৃষ্টি বা অনুভূতির কোন সম্বন্ধ নেই। সাধারণ লোক একটিকে অবলম্বন করে অন্য আরেকটি বিষয়ে যাবার সোপান হিসেবে যে কোন জিনিসকে চেনে বা জানে—যেমন তা কি প্রয়োজনে লাগে, তার পরিণাম কি, ইত্যাদি ; অথবা হয়তো কোন জিনিস নিতান্ত ব্যক্তিগত কোন ভাব বা কল্পনার উদ্রেক করে ; যার সঙ্গে জিনিসটির আসল নিজস্ব চরিত্রের কোন সম্পর্ক নেই। সাধারণ লোকেব ধারণা যে-কোন উৎকৃষ্ট শিল্পসৃষ্টির মধ্যে নিশ্চয় কোন গূঢ় রহস্য বা গুপ্তমন্ত্র নিহিত থাকে ; সেটি যতক্ষণ না প্রকাশ হচ্ছে, জানা যাচ্ছে, ততক্ষণ শিল্পবস্তুটি বোঝবার উপায় নেই। এরকম ধারণা যদিও নিতান্ত আজগুবি, তবুও তার মধ্যে একটি বড় সত্য লুকিয়ে থাকে ; সেটি হচ্ছে যে যে-কোন জিনিস প্রথম দেখা মানেই তাকে নতুন করে জানা চেনার প্রশ্ন আসে ; অর্থাৎ নিশ্বাস প্রশ্বাসের মত সেটি আপনা আপনি জানা শেখা হয়ে যায় না, চেষ্টা করে জানতে হয়, শিখতে হয়।

নতুন জিনিস নতুন করে দেখতে শেখা কত দরকার সে কথাটা আমরা সর্বদা মনে রাখি না। কিন্তু অনুভূতি সম্বন্ধে মনোবিজ্ঞানের গোড়ার কথাগুলি একটু বললেই এর যথার্থতা প্রমাণ হবে। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি হচ্ছে অনুভূতির যন্ত্র বা বাইর্জগতের সংযোগদ্বার। বিশ্ব জগতের যেসব ছাপ আমাদের উপর অহরহ পড়ে তাদের এমনিতে কোন মূল্যই থাকে না, যতক্ষণ না তাদের আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি, মানে বার করতে পারি। ব্যাখ্যা তখনই সম্ভব হয় যখন আমরা স্মৃতিতে যেসব অভিজ্ঞতা সঞ্চিত আছে তাদের মধ্যে থেকে কতগুলি স্মৃতি বেছে, টেনে বার করে, নতুন অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে তার মূল্য নিরূপণ করি। যে কোন একটি বিশেষ মুহূর্তে আমাদের যতগুলি অনুভূতি একসঙ্গে ভীড় করে আমাদের কাছে স্বীকৃতি দাবী করে তাদের সবগুলি একত্র করলে তার যোগফল নিতান্ত এক অরাজক অবস্থার সৃষ্টি করে ; অজস্র রকমের দৃশ্য, শব্দ, গন্ধ, শীতাতপবোধ, শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য অস্বাচ্ছন্দ্য ইত্যাদি, চারিদিকে অহরহ আক্রমণ চালায় ; তাদের অধিকাংশের মধ্যেই কোন সম্বন্ধ নেই, পারম্পর্য নেই ; তারা সবাই মিলে কিছুতেই একটি একক অভিজ্ঞতায় স্থান পেতে পারে না ; অতএব কোন একটি বিষয়ে চেতনাশীল হতে হলে, মগজ সুস্থ রাখতে হলে, এইসব অনুভূতির অধিকাংশই বাদ দিতে হয় ; ওরই মধ্যে মাত্র কয়েকটিকে বাছতে হয় যা নাকি বোধগম্য কোন ছক বা ছবির মধ্যে পড়ে। কিন্তু এইভাবে অনুভূতিকে বোধগম্য করতে হলে, যেসব

যোগসূত্রের দরকার হয় সে সবই পুরনো অভিজ্ঞতার থলি থেকে বেরোয় ; এই অভিজ্ঞতা সঞ্চিত থাকে স্মৃতিতে : যখন যেমন দরকার পড়ে তখন তেমন অভিজ্ঞতার উপর তলব পড়ে। সেই অভিজ্ঞতার বলে বর্তমান অবস্থার কতগুলি বিশেষ দিকের প্রতি আমরা নজর দিই ; সেই অভিজ্ঞতার জোরেই তাদের মধ্যে আমরা বিশেষ কোন রূপ বা ফর্ম এবং অর্থ পাই, অর্থাৎ সেই অবস্থাটিকে বুঝি, অনুভব করি। আমরা সকলেই কোন না কোন সময়ে অপরিচিত অবস্থায় পড়েছি, ফলে চারদিকে কি ঘটছে তার সামান্যই বুঝতে পেরেছি। যেমন প্রথম যখন জাহাজে চড়ি তখন তার খোলের মধ্যে কি যন্ত্রপাতি চলছে তা জানি না ; চারদিকে বিদেশী ভাষায় আলাপ চললে বুঝতে পারি না ; যাদের কোনদিন দেখিনি তাদের খাওয়াপরা, বসা, চালচলন, আচার ব্যবহার সবই বিদঘুটে লাগে। সব যেন গোল লেগে যায়, অস্পষ্ট হয়। না পারি সবটা দেখতে, না পারি বুঝতে, তাতেই মুশকিল হয়। এরই মধ্যে সামান্য যেটুকু দেখি শুনি, চিনি, যেমন জাহাজের চাকা বা বড় বড় পাইপ স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ, ভাবভঙ্গী থেকে খুব অস্পষ্ট একটি বোধ আসে কিন্তু প্রথমে বেশীর ভাগই আমাদের ফাঁকি দেয়। পরে যখন আস্তে আস্তে বোধের উদয় হয় তখন আমাদের অনুভূতি স্পষ্ট হয়, সম্মুখের দৃশ্যপটে অনেক বেশী জিনিস নজরে পড়ে। কিন্তু তখনও যা দেখি খুবই অল্প, অস্পষ্ট, তাতে পরিপ্রেক্ষিত থাকে না। যেগুলি বেশী প্রয়োজনীয় বা তাৎপর্যময় তা অনেক সময়ে আমাদের ফাঁকি দেয়, তখনও যেসব টুকিটাকি নজরে পড়ে তা তালগোল পাকিয়ে যায়। তার মানে এ নয় যে যিনি সেই দৃশ্যের সবকটি জিনিস খুব ভাল করে দেখতে পারছেন, তাঁর চেয়ে আমাদের ইন্দ্রিয় কম তীক্ষ্ণ। হয়ত তাঁর চেয়ে আমাদের ইন্দ্রিয় অনেক বেশী তীক্ষ্ণ, অনেক বেশী শক্তিশালী, তবুও তাঁর চেয়ে সেই দৃশ্য থেকে আহরণ করার ক্ষমতা আমাদের কম। তার কারণ আমরা সেই বিশেষ দৃশ্যপটে আমাদের ইন্দ্রিয় ব্যবহার করতে শিখিনি, আর তিনি শিখেছেন।

'ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার' শব্দটিতেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে দেখা বা শোনা একটি সকর্মক ক্রিয়া, মোটেই অকর্মক নয় ; অর্থাৎ দেখা বা শোনা কোনটাই আপনা আপনি হয় না। যখন জাহাজের যন্ত্রপাতির মোটামুটি উদ্দেশ্য এবং ব্যবস্থাটা বুঝি তখন খুঁটিনাটি কলকব্জার দিকে দৃষ্টি যায়, যা নাকি আগে চোখে পড়ত না। যখন বিদেশী ভাষার কিছু কিছু শব্দ আয়ত্ত করি, যখন শুনতে শিখি, তখন তার নানারকম সূক্ষ্ম আওয়াজ, মানে, কানে

ধরা পড়ে। অভিজ্ঞতার বলে আমাদের যে শিক্ষা হয় তারই কৃপায় আমরা জাহাজের যন্ত্রপাতি চিনি, বিদেশী ভাষা বুঝি।

প্রতিমুহূর্তে যে অবিচ্ছিন্ন স্রোত চলেছে তার সামান্য দুয়েকটি বিষয়ের উল্লেখমাত্র করলুম। যতদিন আমরা প্রকৃতপক্ষে সজীব থাকি ততদিন ক্রমাগতই আমাদের অভিজ্ঞতার পরিধি বেড়ে চলে, সেই অভিজ্ঞতার উপযুক্ত ব্যবহারে আমরাও বেড়ে চলি ; ক্রমশই প্রতিটি জিনিস আরও স্পষ্টভাবে তীক্ষ্ণভাবে দেখতে, বিচার করতে শিখি ; প্রতিটি জিনিসে আমরা ক্রমশ অনেক বেশী অর্থ খুঁজে পাই। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই এমনটি ঘটে, সে টেনিস খেলা, মোটর চালানো, ডাক্তারি করা বা বৈজ্ঞানিক গবেষণা যাই হোক, নানারকম অর্থের শৃঙ্খলায় পরিপুষ্ট হয়ে আমাদের মন গড়ে ওঠে, বাড়ে ; আমাদের অনুভূতির মূলধন বাড়ে, সেগুলি অনেক বেশী প্রশান্ত, ঐশ্বর্যমণ্ডিত হয়। অর্থাৎ সোজা কথায় দাঁড়ায় এই যে ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধি সংযোগে নির্ভর — একটি ছাড়া অন্যটি কাজ করে না, দুটি পরস্পরের উপর সর্বদা কাজ করে বলেই মানুষের প্রজ্ঞা, জ্ঞান, বিবেচনা, বিচার বাড়ে।

আমরা যদি এই সাধারণ সত্যটি মনে রাখি তাহলে শিল্পবিষয়ে বিশেষ শিক্ষা কেন প্রয়োজন তা বুঝতে পারব। তার কারণ আমরা যা দেখতে শিখি, তাই দেখি, অনুভব করি সে বাস্তব জীবনেই হোক, আর শিল্পকলাতেই হোক। এক কথায় বলা যায় শিল্পী তাঁর অভিজ্ঞতাকে রূপ দেন, শরীর দেন, সুতরাং তাঁর ছবি কাব্য বা সঙ্গীত বুঝতে গেলে আমাদের মধ্যে নিজেদের সাধ্যমত তাঁর অভিজ্ঞতাকে ফিরেফিরতি গড়তে হয়। শিল্পীর অভিজ্ঞতা আর তাঁর শ্রোতা বা দর্শকের অভিজ্ঞতার মধ্যে মূলগত তফাৎ কিছু নেই, যদিও দুজনের ক্ষমতার আকাশপাতাল তফাৎ থাকতে পারে। শিল্পীর অভিজ্ঞতা আসে তাঁর পটভূমি থেকে, তাঁর নিজস্ব প্রিয় বিষয় থেকে, তার অনুভব করবার বিশেষ অভ্যাস-সমষ্টি থেকে। মূলত কিন্তু বৈজ্ঞানিকের চিন্তার অভ্যাস-ধারার সঙ্গে তাদের মিল আছে। সুতরাং দুই ক্ষেত্রেই অর্থাৎ শিল্পী এবং বৈজ্ঞানিকের উভয়ের অভিজ্ঞতায়, তৃতীয় ব্যক্তির ভাগ বসানর সম্ভাবনা সর্বদাই খোলা থাকে। কিন্তু তৃতীয় ব্যক্তি তখনই ভাগ বসাতে পারেন, ভাগ বসানর যোগ্যতা অর্জন করতে পারেন, যখন তিনি শিল্পীর পটভূমির সমতুল্য পটভূমি, তাঁর অভ্যাসের সমতুল্য অভ্যাস, আয়ত্ত করার কষ্ট স্বীকার করতে রাজী থাকেন। শিল্পী যেমনভাবে দেখেন তেমন ভাবে দেখতে শেখা খুবই দুরূহ

ব্যাপার ; সে শিক্ষায় কোন মুষ্টিযোগ বা শর্টকাটের অবকাশ নেই ; তাতে কোন মন্ত্রতন্ত্র বা টোটকাবাজি চলে না। তাতে আমাদের সমস্ত উদ্যম, সমস্ত শক্তি ব্যয় করতে হয়। শুধু তাই নয়, আমাদের যতকিছু শক্তি, তার অনুশীলন করে, তাকে উপযুক্ত ব্যবস্থামত নিযুক্ত করতে হয় ; তার জন্যে দরকার হয় শিল্পের অর্থ সম্পর্কে, মানব প্রকৃতির সঙ্গে শিল্পের কি সম্বন্ধ, সে বিষয়ে বিজ্ঞানসম্মত বোধ। বৈজ্ঞানিক যেমন তাঁর অঙ্ক এবং যন্ত্রপাতি দিয়ে আমাদের চোখের সমুখে বিশ্বের স্বরূপ উন্মোচন করতে চান, শিল্পীও ঠিক তেমনি তাঁর নিজস্ব যন্ত্রপাতির সাহায্যে বাহ্যজগৎকে আলোকিত করতে চান। পদার্থ বা রসায়ন বিদ্যাকে আমরা কখনও যেমন নিজের মনগড়া জগৎ বলে মনে করি না তেমনি শিল্পকেও ছেলেখেলা ভাবার অভ্যাস পরিত্যাগ করতে হবে ; শিল্প মনগড়া জগৎ, বা খেয়ালখুশির ব্যাপার, এ কল্পনা একেবারে বর্জন করতে হবে। বিজ্ঞানের মত শিল্পেও অনুশীলন শিক্ষা, অনুসন্ধানের বিশিষ্ট ধারার একান্ত প্রয়োজন আছে : সেখানেও অত্যন্ত যত্নসহকারে দেখতে শিখতে হয়, তা না হলে সব বৃথা হয় : অর্থাৎ বিশ্বজগতের কোন কোন্ অভিব্যক্তি সম্বন্ধে শিল্পীর উৎসাহ থাকা সম্ভব, তিনি কি কি উপায়ে সেই সব অভিব্যক্তিকে রূপ দিতে পারেন, নিজের কাজে কিভাবে সব উপাদানগুলি তিনি গোছান, কি উপায় অবলম্বন করেন, কি উপায়ে সাফল্য আসে, সে সম্বন্ধে জানা দরকার, তবেই চিত্রকলা বা অন্য কোন শিল্পকলা বোঝা যায়, শিল্পরসের সন্ধান পাওয়া যায়।

ছবিতে প্রকাশশক্তি ও অলঙ্কার

শিল্পী আর সাধারণ্যের মধ্যে পার্থক্য আছে। প্রথমত শিল্পী যা দেখেন তা তিনি সাধারণ দশজনকে দেখাতে পারেন : দ্বিতীয়ত এবং মুখ্যত, সাধারণ লোকের চেয়ে তিনি অনেক বেশী এবং অনেক গভীরভাবে দেখতে পারেন। প্রথমটি অবশ্য শিক্ষা-দীক্ষা, ক্ষমতা ও অনুশীলনের উপর নির্ভর করে কিন্তু সার্থক সৃষ্টির কাজে শুধু এগুলিই যথেষ্ট নয়। তার জন্যে দরকার হয় এমন এক অন্তর্দৃষ্টি যার কল্যাণে শিল্পীর কাজে দেখা দেয় নতুন রূপ, আকার, ফর্ম ও শৃঙ্খলা। বৈজ্ঞানিকের মত শিল্পীরও প্রধান কাজ হচ্ছে নতুন করে দেখা, আবিষ্কার করা। বৈজ্ঞানিক অঙ্ক এবং সাঙ্কেতিক চিহ্নের সাহায্যে আবিষ্কার, গণনা ভবিষ্যদ্বাণী করেন, আর শিল্পী জাগতিক বস্তুর মধ্যে এমন গুণ আবিষ্কার করেন যার ফলে মানুষের চোখে তার মূল্য বেড়ে যায়। এইসব গুণের প্রকাশ নির্ভর করে শিল্পীর ব্যক্তিস্বরূপের উপর, তাঁর উপায় উপকরণ, যন্ত্রপাতির উপর। যেমন সাহিত্যের প্রকৃত বিষয় হচ্ছে মিলনান্ত বা বিয়োগান্ত আখ্যান, হাস্যকৌতুক অথবা শ্লেষ, বিদ্রূপ বা করুণা, ঘৃণা কিম্বা মহান ঘটনার সমাবেশ। এসব কাহিনীর সার্থক বর্ণনা সাহিত্যিকই ভাল করতে পারেন, কারণ এসব ঘটনায় যে কালক্ষেপ হয় সে কালাতিপাত সাহিত্যেই দেখানো সম্ভব। চিত্রকলায় ঘটনা পরম্পরা যদিও ভাল মত দেখানো যায় না, তবুও চিত্রশিল্পী ছবিতে মানুষের মনের অথবা কোন ঘটনার অন্তর্নিহিত ভাব সাহিত্যিকের মতই নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারেন, যেমন গোইয়া বা দ্যমিয়ে তাঁদের ছবিতে ফুটিয়ে তুলেছেন শ্লেষ, ক্লোদ ল লোরেনের ছবিতে আছে মহৎভাব (চিত্র ১৪)। এল গ্রেকোয় ধর্মাপ্লুত, মরমী আবেগ, রেমব্রান্টে তীব্র মানবিক অনুভূতি (চিত্র ৬)। তা সত্ত্বেও ছবিতে সেই গুণ ও লক্ষণগুলিই ভাল খোলে যেগুলি চোখে দেখা যায়, যেগুলি প্রকৃতপক্ষে চিত্রের নিজস্ব এলাকায় পড়ে। রঙ, রেখা, আলো, বস্তুর ঘনত্ব বা ম্যাস আমরা সোজাসুজি দেখতে পাই, তাই এই লক্ষণগুলিকেই চিত্রশিল্পী নতুন গুণে নতুন দীপ্তিতে ভূষিত করেন। এইসব লক্ষণ বা উপাদানের উপর শিল্পী তাঁর নিজের এবং পূর্বসূরীদের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা নিয়োগ

করেন। সে অভিজ্ঞতা সাধারণ লোকের অভিজ্ঞতার চেয়ে অনেক বেশী ঐশ্বর্যময় ; তার সাহায্যে তিনি কোন বিশেষ পরিবেশের মধ্যে যা কিছু তাৎপর্যপূর্ণ, যা কিছু মানুষকে নাড়া দেয়, তা খুঁজে বার করেন ; তাদের মধ্যে এমন এক বিশিষ্ট সম্বন্ধ আনেন যার ফলে তাদেব আসল সত্যরূপটি বেরিয়ে আসে। শিল্পী তাঁর কাজে যে ভাব ফুটিয়ে তোলেন, যে ব্যঞ্জনা আনেন, তার মূলে থাকে এই ধরনের আবিষ্কার বা উদ্ঘাটন। এই ধরনের প্রকাশ বা উদ্ঘাটনের ব্যঞ্জনা এক কথা, আর ভ্রমাত্মক ছলনাময় নকল আরেক কথা। ছবি যদি মরীচিকার মত করে আঁকা হয়, অর্থাৎ তা দেখে প্রমাদ বা বিভ্রান্তি ঘটে, তবে তাকে বাস্তবের সত্যরূপ বলা যায় না। সার্থক প্রকাশের রূপে, ইংরেজিতে যাকে এক্সপ্রেসিভ ফর্ম বলে, তাতে সর্বদাই সত্যের অনুভূতি থাকবে।

সুতরাং রসোত্তীর্ণ চিত্র কখনই ফোটোগ্রাফ বা নথি হতে পারে না। অন্যপক্ষে তার সত্যরূপ চিনতে হলে উপযুক্ত শিক্ষা ও চর্চারও প্রয়োজন। বিজ্ঞান কখনও দৃশ্যমান জগতের নিছক বর্ণনায় সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। দৃশ্যমান জগতের তলায় বিজ্ঞান এমন এক জগতের সন্ধান দেয় যা সাধারণ চোখে দেখা যায় না অথচ যার সন্ধান পেলে দৃশ্যমান জগৎকে আয়ত্তে আনতে সুবিধা হয়। যাঁর বৈজ্ঞানিকসুলভ শিক্ষা দীক্ষা আছে, তিনি নানারকম বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করতে পারেন, অনেক কিছু বৈজ্ঞানিক তথ্যের যাচাই করতে পারেন। কিন্তু বিজ্ঞান যেমন কারোর একচেটিয়া অধিকার নয়, তেমনি তা নিয়ে যে কোন লোকের যখন তখন কথা বলারও অধিকার নেই। সেইজন্যে বিজ্ঞানের কোন জটিল সমস্যা নিয়ে কোন বুদ্ধিমান লোক না জেনে শুনে চট করে নিজের মত জাহির করেন না। এমন লোক বহু আছেন যাঁরা ক্যান্সার রোগ বা অ্যাটমের গড়ন সম্পর্কে কিছু না জানা থাকলে মুখ খোলেন না, অথচ তাঁরাই আবার স্ট্রাভিন্স্কির সঙ্গীত, অথবা জয়েসের উপন্যাস, কিম্বা সেজান, মাতিসের ছবির বিষয়ে কিছুমাত্র না জেনে তাঁদের এককথায় নস্যাৎ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন না। কাজে কাজেই এ বিষয়ে আরেকটু আলোচনা দরকার।

ললিতকলায় বাস্তবের সত্যরূপ বা রিয়ালিটি কিভাবে প্রতিফলিত হয় সে আলোচনার আগে, সর্বপ্রথমে শিল্পীর উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায় সম্বন্ধে একটু ধারণা হওয়া প্রয়োজন। উদ্দেশ্যকে ইংরেজিতে বলে পার্পাস্, অভিপ্রায়কে বলে ডিজাইন। সাধারণ ভাষায় উদ্দেশ্য বা পারপাস আর অভিপ্রায় বা ডিজাইনের মধ্যে যে সম্বন্ধ বর্তমান, শিল্পের ভাষাতেও এদুটি

কথার মধ্যে প্রায় একই ধরনের সম্পর্ক বর্তমান। ইংরেজিতে ডিজাইন শব্দটির সরল অর্থ হচ্ছে অভীপ্সা বা অভিপ্রায় ; কি উপায়ে সে অভিপ্রায় সিদ্ধ হবে কথাটিতে তারও একটু ইঙ্গিত থাকে। এমন কোন শিল্পসৃষ্টি সম্ভব নয় যাতে নাকি কোন বাস্তব ঘটনার আদ্যোপান্ত দেখাতে পারা যায় ; শিল্পী সবসময়ে এমন কতগুলি অংশ বাছাই করে দেখান যার মধ্যে তাঁর উদ্দেশ্য এবং অভিপ্রায় ফুটে ওঠে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় প্রধান চরিত্রের জীবনের সমস্ত কিছু বলা কোন উপন্যাসেই সম্ভব নয়, যদিই বা সম্ভব হত তবে তা নিতান্ত অর্থহীন হত। যে কোন উপন্যাসের উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রধান প্রধান লক্ষণগুলিকে ফুটিয়ে তোলা ; কিন্তু সেই লক্ষণগুলি বাছাইয়ের মধ্যে গ্রন্থকারের অভিপ্রায় বা বক্তব্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অভিপ্রায় অনুসারে বাছাই করার রীতিও বদলায়। যেমন ফীলডিং, জোলা, জেমস জয়েস প্রত্যেকেই নিজ নিজ ভাবে বাস্তবপন্থী বা রিয়ালিস্ট, কিন্তু তাঁদের প্রত্যেকের রীতি আলাদা। প্রত্যেকেই বাস্তবের রূপ নিজের মত করে উন্মোচন করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু একের মানদণ্ড আরেকজনের উপর খাটে না। ঠিক একই কথা রেমব্রান্ট, ভেলাস্কেথ বা সেজান সম্বন্ধে খাটে। উপায় উপকরণ বা টেকনিকের সঙ্গে ডিজাইনের কি সম্পর্ক সে আলোচনা পরে হবে। এখানে শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট যে বাস্তবের সত্যরূপ প্রকাশ বিচিত্রমুখী হতে বাধ্য ; কোন একটি বিশেষ ছকে বা ছাঁচে সবকিছুকে ফেলা, ঢালা, সম্ভব নয়।

বাস্তব জগতে অনেক সময়ে যে অখণ্ড সমগ্র অভিজ্ঞতার আস্বাদ আমরা পাই আর কোন শিল্পবস্তুর রসের যে অখণ্ড ঐক্যের উল্লেখ আমরা করি (ইংরেজিতে যাকে বলে ইউনিটি অভ আর্ট) এই দুই জগতের মধ্যে বেশ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। বাস্তব ক্ষেত্রে যখন আমরা কোন অখণ্ড সমগ্র অভিজ্ঞতার আস্বাদ পাই, তখন তার মধ্যে নানা ঘটনা মিলে মিশে একটি লক্ষ্যে বা পরিণামে পৌঁছয় বলেই তা সম্ভব হয়। এটি অবশ্য হল মানুষের মনের কথা, অর্থাৎ জাগতিক ঘটনার মধ্যে মানুষ যে ভাবে নিজের মনে ঐক্যসূত্র খুঁজে বার করে তার কথা ; কিন্তু শিল্পকলায় যেহেতু বাস্তব জীবনের সমস্ত কিছু ঘটনা শিল্পী উপস্থাপিত করতে পারেন না, সেহেতু তাঁকে বাছাই করে, যাতে তাঁর সৃষ্টির বিভিন্ন অঙ্গে অখণ্ডতা আসে, ঐক্যসূত্র থাকে, তার ব্যবস্থা করতে হয়। তখন সে ঐক্যসূত্র শুধু শিল্পীর মনে থাকলে চলবে না, তাঁর সৃষ্টিতে তার ভালরকম প্রকাশ হওয়া দরকার। অর্থাৎ তাঁর সৃষ্টিতে সে ঐক্যসূত্র প্রতিভাত হওয়া দরকার। যেমন, কোন

উপন্যাসে বা নাটকে কোন চরিত্র এলোমেলো অসংলগ্ন হলে চলে না, তার সমস্ত কাজে কর্মে, কথায়বার্তায় একটি চরিত্রের বৈশিষ্ট্য যদি ফুটে না ওঠে, তাকে যে উদ্দেশ্যে উপন্যাসে বা নাটকে ঢোকানো হয়েছে সে উদ্দেশ্য যদি তার দ্বারা সাধিত না হয়, তাহলে আমরা বলি যে, সে চরিত্রটি উতরায়নি। শুধু যে চরিত্রটির নিজের মধ্যে সঙ্গতি থাকলেই হবে তা নয়, উপন্যাসের বা নাটকের অন্য সব ঘটনা, চরিত্র ও পরিণামের সঙ্গে তার সঙ্গতি থাকা চাই, তা না হলে বইটির সমগ্রতা খর্ব হয়। ছবিতেও একই কথা প্রযোজ্য বাস্তবের যে সত্যরূপ সৃষ্টির অভিপ্রায় নিয়ে শিল্পী ছবি আঁকেন তার উপরে নির্ভর করে তাঁর ছবিতে কতখানি ঐক্য বা অখণ্ডতা আসবে, কতখানি প্রতীতি জন্মাবে, অর্থাৎ ছবির অভিপ্রায় বা ডিজাইনের তাগিদের উপর ছবির উৎকর্ষ নির্ভর করে ; তার চেয়ে কমও নয় বেশীও নয়। সুতরাং ডিজাইন অনুযায়ী যতখানি রঙ, ঘনত্ব বা রেখা প্রয়োজন তার কম বা বেশী হলে হয় ছবির রিয়ালিটি ক্ষুণ্ণ হয় ; নয় কোন একদিকে ঝোঁক বেশী হয়ে যায় ; ফলে ছবির ঐক্য নষ্ট হয়, তার অখণ্ড সমগ্র ভাবটি আর থাকে না ; তখন তা কতগুলি টুকরোর সমষ্টিমাত্র হয়।

ঐক্যের সম্পূরক হচ্ছে বৈচিত্র্য। ইউনিটি বা ঐক্য তখনই সার্থক হয় যখন বিচিত্র খুঁটিনাটির সুষ্ঠু সমন্বয় বা সংশ্লেষণ হয়। তা না হলে একঘেয়ে এবং ক্লান্তিকর হতে বাধ্য। বাস্তব জীবনের মত শিল্পেও এ কথাটি সমধিক সত্য। ইচ্ছা করলে নিজের জীবন থেকে অনেক কিছু ঝঞ্ঝাট, ঝামেলা, বাদবিসম্বাদ ছেঁটে বাদ দেয়া যায় ; নানারকম জটিল অভিজ্ঞতা, যা জীবনে পরিপূর্ণতা আনে, সেসব থেকে ইচ্ছা করলে দূরে থাকা অনেক সময়ে সম্ভব। কিন্তু তার ফলে জীবন নিতান্ত একঘেয়ে হয়, এবং আস্তে আস্তে বুদ্ধি এবং অন্যান্য বৃত্তিগুলি শুকিয়ে মরে। সঙ্গীতে একটি অক্টেভ, বা সা থেকে সা, হচ্ছে সবচেয়ে বেশী ছন্দোময় : কিন্তু তা সত্ত্বেও একটি অক্টেভে হার্মনি সম্ভব নয়,তার মধ্যে বৈচিত্র্যের অবকাশ এতই কম। সাহিত্যেও একই ব্যাপার : কোন চরিত্রে যদি শুধু একটিমাত্র গুণই ফুটে ওঠে, সতীত্ব, লোভ, শৌর্য, অথবা ভীরুতা তা হলে সে চরিত্র মোটেই বাস্তব হয় না; নিতান্তই ধোঁয়াটে, অবাস্তব হয়। অর্থাৎ নভেল নাটকে কোন চরিত্রের সঙ্গতি সম্বন্ধে আমরা যখন বলি তখনও তারমধ্যে একটিমাত্র লক্ষণের সঙ্গতি থাকলে আমাদের ভাল লাগে না। নানা বিপরীত পরস্পরবিরোধী লক্ষণে, দোষে, গুণে যে সঙ্গতি ফুটে উঠে চরিত্রটিকে সম্পূর্ণ করে, তাই আমাদের আকৃষ্ট করে। সঙ্গতি মানে একই লক্ষণের পুনরাবৃত্তি নয়, বরং

নানা বিচিত্র লক্ষণে ঐক্যের প্রকাশ ; লক্ষ লক্ষ বালুকণার সমৈক্য নয়, বরং শরীরের নানা বিভিন্ন যন্ত্রের সুষমাবদ্ধ একজোটে কাজ। তেমনি চিত্রকলাতেও শুধু যে নানা ধরনের জিনিস থাকলেই ছবিতে বিচিত্র ঐশ্বর্য আসে তা নয়, প্রতিটি বিষয়বস্তু চিত্রের যাবতীয় উপাদানের সার্থক প্রয়োগে গঠিত হলেই তবে ছবির গৌরববৃদ্ধি হয়। সুতরাং ছবিতে রিয়ালিটি আনতে হলে একঘেয়েমি যেমন বর্জনীয়, তাকে অহেতুক নানা বৈচিত্র্যের জঞ্জালে ভারাক্রান্ত করাও তেমনি অবাঞ্ছনীয় ; শিল্পী যে অবস্থা বা পরিবেশ আঁকছেন তার বিচিত্র জটিলতা নিয়ে তার সমগ্র রূপটি তাঁর জানা দরকার, যাতে তিনি ডিজাইনটি বিচিত্র গৌরবে সম্পূর্ণ করতে পারেন।

কিন্তু শিল্পসৃষ্টি শুধু কল্পনা বা অন্তর্দৃষ্টির ব্যাপার নয়। তার স্বতন্ত্র, জড় অস্তিত্বও আছে ; সেই হিসেবে তার নিজগুণে সুখপ্রদ হবার প্রশ্নও আসে। এই প্রসাদগুণ সমস্ত রকম শিল্পসৃষ্টিতেই কমবেশী থাকতে বাধ্য। এক কথায় এইগুণকে অলঙ্কার বলা যায়। উপন্যাসে অলঙ্কার গুণ সবচেয়ে কম থাকার কথা ; কাব্যে এর স্থান আরও স্পষ্ট, যদিও কাব্যে শব্দের ধ্বনি আর ছন্দ এতবেশী অর্থের উপর নির্ভরশীল যে তাদের আলাদা করা যায় না। কিন্তু চিত্রকলায় রঙ ও আকার ইন্দ্রিয়ের উপর সরাসরি ছাপ ফেলে ; চোখের কাছে রঙ ও আকারের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও মূল্য আছে ; ফলে এই দুটি উপাদানের নিজস্ব মূল্য খুব বেশী। যে সব উপাদান উপকরণ চোখের উপর সরাসরি কাজ করে, তাদের নিজস্ব গুণাগুণের উপর অলঙ্কারনির্ভর শিল্প, ইংরেজিতে যাকে বলে ডেকরেটিভ আর্টস্, বিশেষভাবে নির্ভরশীল। দেয়ালে পটি বা স্ক্রোলের কাজে, কাপড়ে বা কিংখাবে ছাপা বা ছুঁচের কাজে, গালচে, কাঁথা বা কার্পেটের কাজে, কাঠের কাজে, প্রাকৃত আকার থাকেই না ; যদিই বা থাকে তা এত অপ্রাকৃত, রীতিদুরস্ত ছকে ফেলা অবস্থায় রূপান্তরিত হয়, ইংরেজিতে যাকে বলে কন্‌ভেন্‌শানালাইজড্ হয়, যে জীব বা উদ্ভিদ্‌জগতের কোন কিছু আকারের সঙ্গে তার কোন মিলই থাকে না। প্রকৃতিকে আমরা যদি নিছক মানুষের ব্যবহারের বা থাকবার জায়গা বলে না দেখে তার নিজস্ব শোভা দেখি তবে প্রাকৃতিক শোভার মধ্যে নয়নাভিরাম অনেককিছু পাব। ফুল, ফল, পাতা, মাটি, পাথর, রামধনু, সূর্যাস্ত, পাহাড়, উপত্যকার ঢেউ-খেলানো উঁচুনীচুর মধ্যে অলঙ্কারগুণের শেষ নেই, তাতে আমাদের সব ইন্দ্রিয়ই তৃপ্ত হয়।

শিল্পকলাতে অলঙ্কারের নিজস্ব স্থান ও গুণ আছে, কিন্তু অলঙ্কারের বাহুল্য এলে শিল্পীর সৃষ্টি জ্যাবড়া হয়ে যায়, তার সত্যগুণ অলঙ্কারে

বিড়ম্বিত হয়। তখন সে-কাজ এক টুকরো কার্পেট বা নিছক গৃহসজ্জা হয়ে পড়ে। কথাটা অবশ্য একটু অতিরঞ্জন হল, এরকম অবস্থা বস্তুত হয় না, এমনকি সবচেয়ে অপ্রাকৃত বা অ্যাবস্ট্রাক্ট ছবিতেও নয়। যদিও মনে রাখতে হবে যে আধুনিক যুগে রঙীন রেখা, বিন্দু, ফোঁটা, জ্যামিতিক আকার নিয়ে যে-সব ছবি আঁকা হয়, তাদের অনেকেরই মুখ্য উদ্দেশ্য ও সার্থকতা হচ্ছে রঙের এবং আকারের সাজন, তাদের উদ্দেশ্য দেয়ালে শোভা পাওয়া, ঘরের আকার, দেয়াল, জানালা, দরজা আসবাবপত্রের রঙের আকারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে আসবাব হয়ে থাকা। তিনমাত্রা বা ঘনত্বের আভাস কিছুটা প্রতিচ্ছবির কাজ করে, তাতে ছবির প্রকাশশক্তি বা ব্যঞ্জনাগুণ বাড়ে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে চিত্রে এই ধরনের প্রকাশশক্তি বা ব্যঞ্জনাগুণ গৌণ আসন পায়; পোর্ট্রেটে বা ল্যাণ্ডস্কেপে, বা ফিগরের গ্রুপে, প্রতিচ্ছবি বা প্রকাশ, উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায় না হয়ে উপলক্ষ্যমাত্র হয়, যাকে আশ্রয় করে রঙের হার্মনি বা বৈষম্য, রেখা বা আলোর প্যাটার্নের সম্ভাবনা নিয়ে পরীক্ষা গবেষণা চলে। মাতিসের কাজে এইরকম অলঙ্কারের দিকে ঝোঁক দেখা যায় (চিত্র ৩৮)। একই ধরনের ঝোঁক কিছুটা দেখা যায় ফরাসী প্রিমিটিভ শিল্পীদের মধ্যে। কল্পনার চেয়েও চোখের কাছে তাঁদের কাজের আদর বেশী। কারণ তাঁদের কাজে বস্তুর ঘনত্ব, গভীরত্ব, স্পেসের গভীরত্ব, বাস্তবঘেঁষা গতি ভঙ্গী, এককথায় প্রাকৃতিক এবং মানবিক মূল্য কম; তাদের স্থলে রঙ, রেখা ও আকারের বৈশিষ্ট্যই প্রাধান্য পায়, যা নাকি মনের চেয়ে চোখের উপরেই বেশী নির্ভর করে।

অনেক বড় বড় শিল্পীর কাজেও অলঙ্কার বাহুল্য এসে যায়, তাঁরা সাজনের লোভ সামলাতে পারেন না। তাঁরা অবশ্য খুব নিপুণ কৌশলে অলঙ্কারের অবতারণা করেন, যার ফলে সাজনে বিশিষ্টরূপ আসে, তার গরিমা বাড়ে, ছবির গঠনমূলক অঙ্গপ্রত্যঙ্গে তারা সুষ্ঠুভাবে মিশে যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও, তাঁদের ছবি ভাল করে বিশ্লেষণ করলে, কাঠামোর গড়ন আর অলঙ্কার তফাৎ করে দেখলে, দেখা যায় যে অলঙ্কারের ভারে কাঠামো অল্পবিস্তর দুর্বল হয়ে পড়েছে। বতিচেল্লির অধিকাংশ কাজ এ দোষে দুষ্ট, অর্থাৎ তাদের গড়ন একটু দুর্বল, নীরক্ত। বিখ্যাত 'বসন্তোপাখ্যান' বা 'ভিনাসের জন্ম' ছবিতে রেখা অসামান্যরকম স্বচ্ছন্দ, তরলগতি, লীলায়িত; বস্তু বা ফিগরের চারপাশে রেখা অবলীলাক্রমে অতি অদ্ভুতভাবে ঘুরে ঘুরে নানারকম প্যাটার্ণের সৃষ্টি করে, তাতে রেখার লালিত্য খুবই বৃদ্ধি পায় (চিত্র ৩০)। কিন্তু সেই সঙ্গে যখন অন্যান্য

উপাদানের খোঁজ করি, যেমন রঙ, আলো, ডীপ স্পেস ইত্যাদি, যার সার্থক সংশ্লেষণেই শুধু চিত্রের পুরোপুরি প্ল্যাস্টিক উৎকর্ষ সম্ভব, তখন ছবির তনুতাদোষ বা ঠুনকোভাব ধরা পড়ে। অর্থাৎ তার অপূর্ব দক্ষ নিপুণ রেখার কালোয়াতিময় অলঙ্কারের সঙ্গে ছবির অন্যান্য প্ল্যাস্টিক উপাদান, যা সাধারণত কাঠামোয় শক্তি আনে, ভাল করে এক হয়ে মেশে না ; পরিণামে বতিচেল্লির ছবি মুখ্যত চূড়ান্ত অলঙ্কারে পর্যবসিত হয়, মহৎ লোকাতীত শিল্পসৃষ্টির পর্যায়ে পড়ে না। অলঙ্কার ও গঠনের মধ্যে অনেক বেশী সামঞ্জস্য ও সংশ্লেষণ এনেছেন রুবেন্স ; যদিচ রুবেন্সেও অনেকসময়ে অলঙ্কার প্রাধান্য পায়। তা সত্ত্বেও রুবেন্সের ছবির তলায় অন্যান্য উপাদানের সংযোগে সচরাচর একটা শক্ত কঠিন ভিত্তি বা কাঠামো থাকে যার সঙ্গে অলঙ্কার মিশে গিয়ে নিজের বাহুল্য হারিয়ে ছবির প্ল্যাস্টিক মূল্য বৃদ্ধি করে।

সমস্ত মহৎ ও শ্রেষ্ঠ ছবিতেই অলঙ্কার আর ব্যঞ্জনা ওতপ্রোতভাবে একাত্ম হয়ে যায় ; শুধু যে গুণদুটি পরস্পর পাশাপাশি থাকে তা নয় ; যে রঙ আর রেখা চোখকে এত আরাম দেয় সেই রঙ আর রেখাই ব্যঞ্জনাময় রূপ বা এক্সপ্রেসিভ ফর্মের সৃষ্টি করে ; যথা জর্জনে, এল্‌গ্রেকো (চিত্র ২) বা রেনোয়ারের এমন কোন ছবি নেই যার কোন অংশে আঙুল দিয়ে বলা যায় সেটুকুতে ব্যঞ্জনা আছে, অলঙ্কার নেই বা অলঙ্কার আছে ব্যঞ্জনা নেই ; প্রত্যেকটি অংশেই দুটি গুণ সমানভাবে বর্তমান (চিত্র ২২)। বাস্তব জীবনে যা কিছু নিছক অলঙ্কার, তার ক্রিয়া নিতান্তই প্রসাধনের ক্রিয়া, অর্থাৎ উপরের চাকচিক্য, কজমেটিক, অন্যপক্ষে যা ইন্দ্রিয়কে তৃপ্ত করে না তা নিতান্তই ঊষর, আবেগহীন,কুৎসিত, নিছক কালোয়াতি, সার্থক শিল্প নয়। যে ঐক্য এবং অখণ্ডতা রসোত্তীর্ণ হয় তাতে প্রকাশের ব্যঞ্জনা আর অলঙ্কার দুইই থাকে ; দুটি গুণের যে কোন একটির উপর বেশী ঝোঁক বা পক্ষপাতের সম্ভাবনা থাকলেও অন্যটি থাকাও একান্ত দরকার, তা না হলে তাতে বাস্তবের সত্যরূপ প্রতিফলিত হয় না। যথা জর্জনে বা রেনোয়ারে (চিত্র ১৯) মোটামুটি অলঙ্কারই বেশী, অন্যদিকে রেমব্রান্ট বা সেজানে প্রকাশ ব্যঞ্জনাই প্রধান। ফলে প্রথম দুজনের ছবিতে লালিত্য বেশী, শেষের দুজনের চিত্রে শক্তি বেশী। কিন্তু উভয়ক্ষেত্রেই দুই গুণের মধ্যে সমতা বজায় থাকে, কোনটাই খুব গৌণ মনে হয় না। একদিকে অন্তর্দৃষ্টি, বাহ্যরূপের অন্তরে প্রবেশ করার ক্ষমতা ও শক্তি এবং অন্যদিকে অলঙ্কারের লালিত্য—এই দুটি গুণ শিল্পে অপরিহার্য। ক্লাসিক এবং

বারোক দুই শ্রেণীর ভাস্কর্যের প্রথমটিতে গঠন ও দ্বিতীয়টিতে অলঙ্কারের প্রাধান্য দেখা যায়। এই হিসেবে মিকেলাঞ্জেলোর (চিত্র ৭) সৃষ্টি বারোক এবং খ্রীষ্টপূর্ব ২৫০০ বছরের শ্রেষ্ঠ ঈজিপশান ভাস্কর্য ক্লাসিক (চিত্র ৪)। যথা রোমে মিকেলাঞ্জেলোকৃত মোজেসের বিখ্যাত মূর্তিতে এত বেশী অলঙ্কারের প্রতি পক্ষপাত দেখা যায় যে মূর্তিটির প্রকৃত ভাস্কর্যগত গুণ থেকে দৃষ্টি ও মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হয়। অথচ লুভরে দ মর্গান সংগ্রহে যেসব প্রাচীন ঈজিপশান মূর্তি আছে, তাতে ভাস্কর্যের তিনমাত্রিক প্রয়োগে অসম্ভব ঘন ওজন, ভাস্কর্যনিহিত গুণ প্রকাশ পায়, সেক্ষেত্রে অলঙ্কার মোটেই ভাস্কর্যকে বিড়ম্বিত ভারগ্রস্ত করে না। ফলে ঈজিপশান মূর্তিগুলি দেখলে মনে শুদ্ধ, নির্মল আনন্দ আসে, পরিপূর্ণ প্রশান্তি বিরাজ করে; কিন্তু মিকেলাঞ্জেলোর ভাস্কর্যে প্রশান্তি ব্যাহত হয়, তৃপ্তি ক্ষুণ্ণ হয়, অলঙ্কার বাহুল্যে বাহাদুরি প্রকাশের আমেজ আসে। ঠিক তেমনি আমাদের দেশে কর্ণাটক সঙ্গীত যে পরিমাণে শুদ্ধ ক্লাসিক মনে হয় উত্তরভারতীয় সঙ্গীত সেই পরিমাণে বারোক মনে হয়। তালের বাঁধনে কর্ণাটিক সঙ্গীত অত্যন্ত সংহত, শক্তিমান ; তান ও মীড়ের অলঙ্কারবাহুল্যে উত্তরভারতীয় সঙ্গীত অনেক ক্ষেত্রেই কালোয়াতিতে ভারাক্রান্ত, যদিও দুই সঙ্গীতের ধারাই সুন্দর।

প্রকাশব্যঞ্জনা ও অলঙ্কারের মধ্যস্থলে থাকে শিল্পের ভাষায় যাকে বলে আরোপিত বা স্থানান্তরিত মূল্য, ইংরেজিতে ট্রান্স্ফার্ড ভ্যাল্যুজ। এই বদলিমূল্যগুলি বস্তুর অন্তর্নিহিত সত্তার গুণ নয়, সেগুলি শিল্পী বস্তুর উপর আরোপ করে তার গরিমা ও বৈচিত্র্য বাড়ান। ভেরমেয়ার, শার্দা, বা রেনোয়ারের ছবির উপরের জমির অত্যাশ্চর্য স্পর্শগ্রাহ্য গুণে যেন এনামেল বা মিনে বা ভেলভেটের প্রসাদ আসে, তার সঙ্গে যে বস্তু বা শরীর আঁকা হয়েছে তার হয়ত মিল নেই। মাতিস তাঁর ছবির মানুষ এমনভাবে আঁকেন যেন তাদের শরীর টালি বা চীনেমাটি দিয়ে তৈরি, ফলে শরীরে বাস্তবের আভাসের বদলে তিনি ভিন্ন কতগুলি মূল্য আরোপ করেন (চিত্র ৪২)। কাব্যে এর তুল্যমূল্য রূপ হচ্ছে পরোক্ষ উপমা বা উৎপ্রেক্ষা, যাতে বিষয় সম্বন্ধে যত না অন্তর্দৃষ্টি আসে তার চেয়ে বেশী থাকে শালের কাজের মত নানা প্রতিমার জড়োয়া অলঙ্কার, যাদের নিজস্ব স্বতন্ত্র আবেদন থাকে, এবং তার জোরে পাঠককে আকৃষ্ট করে।

আমরা এতক্ষণ শিল্পসৃষ্টিকে বিচার করেছি এক বিশেষ ধরনের দর্শন হিসেবে ; শিল্পী নিজের মত করে বিশ্বজগৎকে আবিষ্কার করেন, তারপর

অন্যসকলকে দেখান ; সেইসঙ্গে অনুশীলনের দ্বারা দর্শকের অনুভব শক্তি কি করে বাড়ে, কি কি গুণ দর্শককে তৃপ্তি দেয়, সেই সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। কিন্তু শিল্পবিচারে শিল্পীর মৌলিকতা, স্বকীয়তাও বড় কথা। অনেকেই মৌলিকতার অর্থ করেন যেন শিল্পীর কাজে অন্য কারোর কিছু প্রভাব থাকা মহাপাপ। এর চেয়ে বড় ভুল হতে পারে না। কারণ, যা কিছু আমরা করি, বুঝি, উপভোগ করি, তার পিছনে থাকে সঞ্চিত অভিজ্ঞতা, এবং কেউ কখনও একা একা এতখানি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারেন না। অতীত থেকে যদি কেউ সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে শিল্পসৃষ্টি করতে যান, তাহলে তাঁর প্রচেষ্টা ততখানিই ব্যর্থ হবে যতখানি হবে যিনি কারোর সাহায্য না নিয়ে নিজের মত করে অঙ্ক বা রসায়ন শাস্ত্র আদ্যোপান্ত সৃষ্টি করতে যাবেন। অন্য লোকে যা দেখে তাদের দেখার অভিজ্ঞতার সাহায্য নিয়েই আমরা দেখতে শিখি, আর এই দৃষ্টি সমৃদ্ধ হয় শিল্পের বিরাট পূর্বাপর ঐতিহ্যে। প্রত্যেকটি ঐতিহ্যেরই একটি গোটা দর্শনের উপর ভিত্তি থাকে। পুরুষানুক্রমে, সবচেয়ে মেধাবী, সবচেয়ে প্রতিভাশালী শিল্পীদের দৃষ্টির উপরে সে ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, অবিচ্ছিন্নভাবে, তিলভাণ্ডেশ্বরের মত তা বেড়ে চলে ; সেই ঐতিহ্যই হয় মানব সভ্যতার সবচেয়ে বড় উত্তরাধিকার। ঐতিহ্যকে কেউ ব্যবহার করেন কোষাগার হিসেবে, কেউ করেন পঙ্গুর লাঠি হিসেবে। যে মুহূর্তে কোন ঐতিহ্যধারার গতিবৃদ্ধি থেমে যায়, তার প্রস্তাবশক্তি চলে গিয়ে আইনজারি করার উৎসাহ হয়, সেই মুহূর্তে তাকে জরায় ধরে ; ঐতিহ্য অ্যাকাডেমিক বাঁধাবুলি আর কসরতে নেমে যায়। চিত্রশিল্পী তখনই সার্থক হন যখন তাঁর পূর্বজ বা পূর্বপুরুষদের কাজ থেকে তিনি নিজের তাগিদ, উদ্দেশ্য, অভিপ্রায়, বা ডিজাইনমত ফর্ম বাছাই করে নিজের কাজে লাগান, নিজের প্রয়োজনমত বদলান, নতুন নতুন সমন্বয়ে, নতুন রূপে, ফর্মে, নিজের বক্তব্য, একান্ত নিজস্ব অন্তর্দৃষ্টি উন্মোচিত করেন। অনুরূপ উপায়ে তাঁর দর্শক বা সমালোচক কোন চিত্রের মৌলিকত্ব, তার বিশেষ মূল্য তখনই প্রকৃতপক্ষে আবিষ্কার করতে পারেন যখন তিনি সেই শিল্প-ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্যকভাবে পরিচিত হন, সে ঐতিহ্যের প্রতিটি অঙ্গ সম্বন্ধে অবহিত হন এবং বুঝতে পারেন শিল্পী তাতে নতুন কি যোগ করে তার মর্যাদাবৃদ্ধি করেছেন। অর্থাৎ আগে অতীতের শিল্প ভাল করে দেখতে শিখলে তবে আমরা বর্তমান যুগের শিল্প ভালভাবে দেখতে শিখি। ১৯৩৪ সালে টি এস এলিয়ট তাঁর 'দি ইউস অভ পোয়েট্রি অ্যাণ্ড দি ইউস অভ ক্রিটিসিজ্‌ম' বইয়ে এ বিষয়ে

খুব সুন্দর কয়েকটি কথা লেখেন। তিনি বলেন :

"পাতা যখন গাছ থেকে ঝরে পড়ে, তখন যদি কেউ একেকটি করে গঁদ দিয়ে সেগুলি ডালে আবার লাগিয়ে দিতে যায় তা হলে কত শক্তিই না নষ্ট হয়। ভাল, জ্যান্ত গাছে আবার পাতা বেরোবে, শুকনো মরা গাছ কেটে ফেলা উচিত। কোন পুরনো ঐতিহ্য আঁকড়ে থাকার সময়ে, অথবা তাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে, আমরা প্রায়ই বিপদে পড়ি : যা কিছু প্রয়োজনীয় এবং প্রাণবন্ত তার সঙ্গে অপ্রয়োজনীয় ও প্রাণহীন লক্ষণের গোলমাল হয়ে যায় ; যা কিছু সত্য এবং শাশ্বত আর যা কিছু আপতিক, এবং নিছক মমতার ব্যাপার সে সম্বন্ধে ভেদজ্ঞান হারাই। দ্বিতীয় বিপদ হয় যখন ঐতিহ্যকে আমরা অজর, অনড় বলে ভাবি ; ভাবি ঐতিহ্য সবকিছুর পরিবর্তনবিরোধী ; যখন পুরনো জিনিস পুরনো ভাবেই চিরকাল জীইয়ে রাখার চেষ্টা করি, এবং তা সম্ভব ভাবি ; নতুন কালে, নতুন পরিবেশে, পুরনো জিনিস কিভাবে পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত করে নতুন ভাবে বাঁচাতে হয়, তা ভাবি না। বর্তমান সাহিত্যকে আমরা দুভাগে ভাগ করতে পারি। প্রথমভাগে পড়ে সেই সব রচনা যা অতীতে যে-সব কাজ চূড়ান্তভাবে হয়ে গেছে সেগুলি ফিরেফিরতি করতে চায় ; এই ধরনের রচনা সম্বন্ধেই 'ঐতিহ্য' কথাটি বিশেষভাবে প্রয়োগ হয়—অপপ্রয়োগই হয় বলা যায়,—কারণ 'ঐতিহ্য' মানেই হচ্ছে বহতা ধারা। ঐতিহ্য কখনও নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে থাকা বোঝায় না। বর্তমান সাহিত্যে দ্বিতীয় ধারায় পাই নতুনত্বের বাড়াবাড়ি, যে নতুনত্ব আসলে নিতান্তই অকিঞ্চিৎ, যা অসতর্ক পাঠকের কাছে তার অন্তর্নিহিত মামুলিপনা ঢেকে রাখে।...ভরাডুবি হয় যখন লেখক তাঁর নতুনত্বকে একেবারে লাগাম ছেড়ে উদ্দামগতিতে চালান, অন্যের থেকে তিনি তাঁর পার্থক্য নিয়ে লাফালাফি করেন ; আর যখন পাঠকবর্গও প্রতিভা খুঁজে পান সেই লেখকের মধ্যে যিনি তাঁর দেশের ও জাতির সঞ্চিত প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতা কতখানি পায়ে ঠেলেছেন তারই জারিজুরি দেখে, সেই প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতা কতখানি নিজের সৃষ্টিতে কাজে লাগিয়েছেন, তা দেখে নয়।...কোন সৃষ্টিকে আনকোরা মৌলিক বলা মানে তাকে অল্পপ্রশংসা করা হয় ; তাতে বড় জোর এইটুকু বোঝায় যে সে কাজটি একেবারে তুচ্ছ নয়, সরাসরি অগ্রাহ্য করার নয়।"

চিত্রে রসবিচার

শিল্পে বিষয়বস্তু

শিল্পে বিষয়বস্তু কথাটির বহু মানে হয়। কখনো ছবির নাম বোঝায়, তাতে ছবিটি চিনতে সুবিধে হয়, কিন্তু ইসথেটিক তাৎপর্য থাকে না। অনেক সময়ে যে দৃশ্য বা বস্তু আঁকা হয়েছে সেটিকে বোঝায়; শিল্পী সে দৃশ্য বা বস্তুটি কিভাবে ব্যবহার করেছেন তা বোঝায় না। বিষয়বস্তু কথাটির এই ধরনের প্রয়োগ যদিও অবান্তর, তবুও অধিকাংশ লোকের কাছে দৃশ্য বা বস্তুর গুণেই ছবির মূল্য বাড়ে, কমে। সাধারণ লোকের কাছে 'সুন্দর' ছবি মানেই 'সুন্দর' দৃশ্য বা বস্তু, দৃশ্য বা বস্তু যত সুন্দর হবে, চিত্রটি ততই মহার্ঘ হবে। এই ধরনের কুসংস্কাব নিয়ে বেশী আলোচনা নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু এর প্রতিবাদে আবার ঠিক উল্টো ভুলটিও করা সম্ভব; এবং আর্টম্মন্য অনেক সমালোচক হামেসাই এ ভুলটি করেন। তাঁদের মতে বিষয়বস্তু নিতান্তই অবান্তর, এমন কি তা যত 'অসুন্দর' হবে ততই চিত্রের মর্যাদা বাড়বে। বিষয়বস্তু নিয়ে এরকম ভুল বোঝাবুঝি খুবই হয়, সুতরাং শিল্পে বিষয়বস্তু পদার্থটি কি তাব সংজ্ঞা মনে মনে ঠিক করা দরকার।

যে কোন শিল্পবস্তুতে দুই ধরনেব গুণ থাকে। এক ধরনের গুণকে আমরা বলব মানবিক গুণ, অর্থাৎ বাস্তব জগতে কোন ঘটনা, দৃশ্য বা বস্তু দেখলে আমাদের মনে যেসব ভাবের উদয় হয় মূল্যবোধ হয়, কোন ছবি দেখলেও তার কিছুটা হয়। দ্বিতীয় ধরনের গুণকে বলব প্ল্যাস্টিক গুণ: এই গুণ থেকে যে সব মূল্যবোধ আসে তাও সাধারণ জগতে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার, অর্থাৎ রঙ, আলোছায়া, সীমারেখা বা কণ্টুর, বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে জমি বা শূন্যের ব্যবধান, এই সবই আমরা চারপাশের জগতে অনুভব করি। প্রথমে যে গুণগুলির উল্লেখ করলুম, বাস্তব জগতে তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে, শুধু যে শিল্পীর কাজেই তারা জন্ম নেয় তা নয়। ফলে বাস্তব জগৎ আর শিল্পীর সৃষ্ট জগতের মধ্যে গোল লেগে যেতে পারে। যথা খ্রীষ্টের ক্রস হতে অবরোহণ ঘটনাটি বহু শতাব্দী আগে ঘটেছিল, তা নিয়ে কোন ছবি আঁকা হলে সেটি হয় তার বিষয়, কিন্তু বিষয়বস্তু নয়। ভান আইক, ফ্রা আঞ্জেলিকো, গ্রিউনেভাল্ড্ তিন্তোরেত্তো, আরও বহু বহু শিল্পী সকলেই ক্রসের অবরোহণ বিষয় নিয়ে ছবি এঁকেছেন,

কিন্তু তাঁদের প্রত্যেকের ছবিতে বিষয়বস্তু সব পৃথক। ছবিতে প্রত্যেক শিল্পীই একান্ত নিজের মত করে ক্যালভারিতে কি ঘটেছিল তাই ভেবেছেন, ভেবে নিজের মত করে এঁকেছেন, সুতরাং কেউ কারোর দেখে আসলে কি ঘটেছিল, তখন কে কি অবস্থায় ছিলেন, সেটুকু জেনে নকল করার কোন প্রশ্ন আসে না। অবশ্য প্রতিটি ছবিতেই কতকটা এক ধরনের অনুভূতি, জাতিগত মিল থাকতে বাধ্য, কিন্তু তার মধ্যেও তফাৎ আছে। গ্রিউনেভাল্ড্ বা ভান আইকের ছবিতে এমন তীব্রতা আর মানসিক অবস্থার যাথাযথ্য ফুটে ওঠে যা ফ্রা আঞ্জেলিকোয় নেই। অথচ প্রত্যেক ক্ষেত্রেই দর্শকের মনে যে সব অনুভূতি হয় তা জড় বস্তুর ছবি দেখে হওয়া সম্ভব নয়, যত ভাল করেই সে স্টিল লাইফ রচিত বা আঁকা বা রঙ দেয়া হোক না কেন : যে সব অনুভূতির উদ্রেক হয় তা একান্ত মানুষের দুঃখ কষ্ট করুণা মমতা থেকেই সম্ভব। সুতরাং যে সব ছবিতে মানুষী ভাব, মানুষী দুঃখ, কষ্ট, করুণা, বিস্ময়, ভক্তি, শ্লেষ, ঘৃণা থাকে সেসব ছবিকে বর্ণনামূলক বলা যায় ; কিন্তু সে আখ্যার মধ্যে হেয় কিছু নেই, সে আখ্যার জন্যে ছবির রসমূল্য কিছু কমে না। কিন্তু গণ্ডগোল তখনই হয় যখন দর্শক ছবির আখ্যান ও ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে গুলিয়ে ফেলেন, ছবিটি ঐতিহাসিক ঘটনার নথি বলে ধরে নেন, যদিও শিল্পীর সে উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায় কখনই থাকতে পারে না। কারণ ছবিতে যেটুকু ঐতিহাসিক ভাব থাকে তা নিতান্ত বাহ্য, এমন কি শিল্পী যদি ছবিতে ঐতিহাসিক যাথাযথ্য আনার জন্যে বিশেষ চেষ্টিত হন, তাহলে তার ফল ভাল হয় না। শাজাহান বাদশার দরবারের যেসব চিত্র আছে তাতে বাদশা এবং ওমরাদের যথাযথ পোর্ট্রেট থাকলেও এবং তাঁরা যেভাবে পরের পর বসেছেন, সেভাবেই আসলে বসতেন ধরে নিলেও, বিচিত্র বা অন্যান্য শিল্পীরা তাঁদের চিত্র রচনার সময়ে স্পেস কম্পোজিশন অর্থাৎ কোথায় কতখানি জমি ছাড়বেন, রাখবেন এবং কোথায় কি রঙ দেবেন না দেবেন, সেসব সমস্যা নিশ্চয় নিজের মত করে প্রত্যেক ছবিতে সমাধান করতেন (চিত্র ৯)।

আখ্যান বা বর্ণনা ছবিতে নিশ্চয় থাকতে পারে ; চিত্রে তার ব্যবহার ন্যায্যও বটে, সঙ্গতও বটে কিন্তু তা চিত্রের অঙ্গ হওয়া চাই, চিত্রের প্ল্যাস্টিক ফর্মের সমস্ত উপাদানের সঙ্গে তার ওতপ্রোত যোগ থাকা চাই মানুষের মনের মুকুরে তার নিজস্ব অভিজ্ঞতায় প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্বের ফলে, কোন দৃশ্য বা বস্তুর ফর্ম কিভাবে প্রতিভাত হয় তারই উপর রূপ বা ফর্মের সাধারণ সংজ্ঞা নির্ভর করে। কিন্তু ফর্ম এমন একটি গুণ যার নিজস্ব স্বতন্ত্র

সত্তাও আছে, শুধু মানুষের মনেই তার অস্তিত্ব নির্ভর করে না। এই বস্তুনির্ভর রূপটি কি তাই দেখা যাক।

রূপ বা ফর্মের প্রকৃতি

'বিষয়বস্তু'র মতই 'ফর্ম' কথাটি এতরকম অর্থে ব্যবহার হয়, যে ফর্ম বলতে নানা লোকে নানা রকম বোঝে। তা সত্ত্বেও সাধারণ ব্যবহারে এবং শিল্পক্ষেত্রেও কথাটির একটি সুস্পষ্ট সংজ্ঞা খুবই সম্ভব।

সাধারণ ভাষায় কোন জিনিসের রূপ বা ফর্ম বলতে তাই বোঝায় যা তার নিজস্ব, বিশিষ্ট চরিত্র ফুটিয়ে তোলে—যেমন টেবিল, চেয়ার, রেল-এঞ্জিন, এরোপ্লেন বা কোন ছবি বা সঙ্গীতের রাগ। বিশ্বজগতে যাবতীয় জিনিসেরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকে ; বস্তুর বেলায় আমরা তাদের বলি গুণ ; অভিজ্ঞতার বেলায় বলি অনুভূতি। যথা টেবিলের রঙ ব্রাউন, তার গা মসৃণ, শক্ত, ঠাণ্ডা, আকারে লম্বা, তিন ফিট উঁচু, আলোছায়া পড়ে তার রঙ বদলায়। কিন্তু টেবিল কথাটি উচ্চারণ করলে শুধু এই গুণগুলির সমষ্টি বোঝায় না, কারণ এ গুণগুলি অন্য অনেক বস্তুর আছে। আমরা টেবিল বুঝি তখনই যখন এই গুণগুলিকে পরস্পর এক বিশেষ সম্বন্ধে আবদ্ধ থাকতে দেখি, যা অনুভব করি, তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সংস্থান সম্বন্ধে এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে আবার গোটা জিনিসটির সম্পর্ক সম্বন্ধে যে ধারণা আমাদের আছে তার সঙ্গে সঙ্গতি দেখি। অর্থাৎ সেই সব সম্বন্ধের মধ্যেই জিনিসটির বৈশিষ্ট্য, তার একান্ত সত্তা, ধরা পড়ে ; তারাই টেবিলকে তার নিজস্ব রূপ দেয়। সুতরাং যাবতীয় বস্তুরই, অর্থাৎ যাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে তাদেরই, ফর্ম বা বিশিষ্ট রূপ আছে, তাদের ফর্ম আমাদের চেতনায় বিশিষ্ট রেখাপাত করে, এবং যতক্ষণ না পর্যন্ত তাদের রূপ বা ফর্ম আমরা ভাল করে বুঝতে পারি ততক্ষণ বস্তুটি সম্বন্ধে আমাদের বোধ আসে না। যেমন টেবিলের ফর্ম নিহিত থাকে তার রঙে, শক্ত কাঠে, বা ধাতুতে, বা কাঁচে, তার আলোয় ইত্যাদিতে ; অর্থাৎ তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পারস্পরিক বিশেষ সম্বন্ধে ও শৃঙ্খলায়, শূন্যে মাটির উপর সেটি যেভাবে দাঁড়িয়ে থাকে তার মধ্যে। শিল্প এবং সাধারণ ব্যবহারিক চেতনা, দুই ক্ষেত্রেই, ফর্মবিচ্ছিন্ন অনুভূতির, অর্থাৎ বিশিষ্ট আকারময় রূপ ছাড়া, নিছক ধারণার কোন অর্থ নেই, অস্তিত্বও আছে কিনা সন্দেহ।

ফর্ম কথাটির মানে নিয়ে যে অনর্থের সৃষ্টি হয় তার প্রধান কারণই হচ্ছে যে কোন বস্তু বা ঘটনার কখনও মাত্র একটি ফর্ম হতে পারে না। যেমন মানুষ বলতে ভারতীয় অথবা ইংরেজ, হিন্দু বা মুসলমান বা ইহুদী, এঞ্জিনিয়ার বা ডাক্তার, বা বিবাহিত-অবিবাহিত বোঝাতে পারে। কলকাতা নগরও বটে, বন্দরও বটে, মহাজনদের ঘাঁটিও বটে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই যে যেমনভাবে মানুষটিকে বা কলকাতাকে দেখতে চায় তার উপর সেই মানুষটির বা কলকাতার ফর্ম নির্ভর করবে ; কোন একটি মাত্র ফর্মে তাদের সবটুকু ধরা পড়বে না। আমরা মানুষটির বা কলকাতার কোন্ রূপটি ধরে বর্ণনা করব তা আমাদের উপর নির্ভর করবে। আমরা যত বিচিত্রভাবে তাদের দেখব তাদের ফর্ম সম্বন্ধে আমাদের তত বহুমুখী বোধ হবে। আমাদের মন যত গভীর যত শক্তিমান হবে ততই আমরা সব জিনিসের বৈচিত্র্য এবং সূক্ষ্মতা বেশী করে, আরও সমগ্রভাবে দেখতে পাব, প্রতিটি জিনিসের মধ্যে নানাবিধ বিচিত্র ফর্ম আবিষ্কার করতে পারব।

যখনই ফর্মের কথা ভাবি তখন কোন জিনিসের বস্তুটি কিভাবে সংগঠিত হয়ে তাকে বিশিষ্ট চরিত্র বা রূপ দিয়েছে, তাই ভাবি। কিন্তু তার উপাদান বস্তুটি আবার নিজেই ফর্ম হতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ভারতবর্ষ অনেকগুলি প্রদেশ নিয়ে গঠিত এমন একটি দেশ যার সমগ্র রূপ বা ফর্ম হচ্ছে ভারতবর্ষ, আর প্রদেশগুলি হচ্ছে তার বস্তু বা শাঁস। আবার যে কোন প্রদেশ নিয়ে যখন তার বিভিন্ন জেলাগুলির কথা ভাবি, তখন প্রদেশটিই হয় ফর্ম, আর জেলাগুলি হয় তার বস্তু। চিত্রকলাতেও এইভাবে ধাপে ধাপে, ভেঙ্গে ভেঙ্গে, ভাগ করা চলে, ছোট থেকে আরও ছোট ফর্মের আলোচনায় যাওয়া যায়। যেমন, ক্যানভাসের সমস্ত জায়গা জুড়ে প্রতিভাত হয় সমগ্র ছবিটির প্ল্যাস্টিক ফর্ম, তার মধ্যে ছোট ছোট ফর্মের সৃষ্টি হয় রঙে, রেখায়, স্পেসে, আলোয়। এগুলি আবার নিজেদের মধ্যে নানা জটিল ফর্মের সৃষ্টি করে। তাদের সবগুলি মিলিয়ে তাদের সঙ্গে অলঙ্কারের প্যাটার্নগুলি মিশে তৈরি হয় সমগ্র ছবির প্ল্যাস্টিক ফর্ম। ঠিক যেমন জীবন্ত শরীরে কোষ থেকে আস্তে আস্তে সমস্ত শরীরের রূপটি তৈরি হয়।

যে কোন সৃষ্টিতে ফর্ম তাকেই বোঝায় যার কৃপায় বিভিন্ন 'অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এক অখণ্ড সংগঠনে গ্রথিত হয়, সবগুলি মিলে একটিমাত্র রসোত্তীর্ণ কীর্তি হয়। কথাটি যে কোন চারুকলা সম্বন্ধেই খাটে : সে ছবি, সিম্ফনি, ভাস্কর্য, কাব্য, নাটক, নভেল বা ফিল্ম যাই হোক। অর্থাৎ বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সত্ত্বেও

যে-কোন সার্থক সৃষ্টির একটি সর্বময় অখণ্ড, ঐক্যমণ্ডিত ফর্ম থাকবে। এবং এই ঐক্য যে সৃষ্টিতে যত বেশী থাকবে ততই তা মহার্ঘ হবে।

সুতরাং ফর্মের অসীম বৈচিত্র্য, সম্ভাবনা থাকে ; সে বিচিত্র সম্ভাবনার একমাত্র সীমা হচ্ছে শিল্পীর নিজের সংভাবনা, কল্পনা, নৈপুণ্যের সীমা। অনেক বিখ্যাত সমালোচকও এই সামান্য সহজ কথাটি ভুলে যান, ফলে নিজের যেটুকু ভাল লাগে তারই সঙ্গে মিলিয়ে নানা আগড়ুম-বাগড়ুম মত জাহির করেন। তাতে তাঁদের লেখার অক্ষমতা আর অতীতপূজা বা অ্যাকাডেমিক মনোভাব ধরা পড়ে। কোন বিশেষ গড়ন, সংগঠন-ব্যবস্থা ফর্ম, শিল্পীর ব্যক্তিগত চরিত্র, দৃষ্টি, অনুশীলন, শিক্ষাদীক্ষা, পারিপার্শ্বিকের উপর নির্ভর করে। তাঁর অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁর কাজে সেসব জিনিস অমোঘভাবে ফুটে উঠবে। তিনি কত সার্থকভাবে সেগুলি ফুটিয়ে তুলতে পারেন তার উপরে নির্ভর করে তিনি কতবড় স্রষ্টা তার বিচার। যে শিল্পীর তুলিতে তাঁর একান্ত নিজস্ব ব্যক্তিগত মৌলিক বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে, তার প্রতি যখনই কোন সমালোচক হেয়োক্তি করেন তখনই বুঝতে হবে তিনি অর্থাৎ সেই সমালোচক নিতান্ত গতানুগতিক, নিষ্প্রাণ, যন্ত্রবৎ, বাঁধা ছকের পক্ষপাতী, তাঁর মানদণ্ড সব রকম বিকাশের পরিপন্থী। অ্যাকাডেমিক শিল্পের মূলকথাই হচ্ছে অনুকরণের সঙ্গে নিতান্ত কারিকরি কৌশল, হাতের নৈপুণ্য ; তাতে শুধু সস্তায় কিস্তিমাৎই চলে ; প্রাণ থাকে না। জন সিঙার সারজেন্ট, রবেয়ার আঁরির মত অ্যাকাডেমিক শিল্পী, মানে'র টেকনিক অনুকরণ করেন মাত্র, কিন্তু মানে'র ছবির প্রাণপাখী তাঁদের মুঠি থেকে উড়ে পালায়। ঠিক তেমনি মানে'র অনুকরণ করেছেন চাইল্ড হ্যাসাম, রেডফীল্ড, গার্বার প্রভৃতিরা। ভেলাস্‌কেথ, কুর্বে, জাপানী শিল্পীদের প্রাণহীন অ্যাকাডেমিক সমন্বয় করেছেন হুইস্‌লার। তেমনি সেজান, (চিত্র ১২), ভান গখ, মাতিস, পিকাসো, ব্রন্‌থসিনো, কুর্বে, কোরো, রেণোয়ারের ছবির বাহ্যগুণের পরের পর অনুকরণ করে গেছেন দেরায়াঁ (চিত্র ১৩)।

ফর্ম ও টেকনিক

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায় কোন বস্তুর ফর্মই তার আসল সত্তা বা নির্যাস, তাতেই তার বিশিষ্ট স্বকীয়তা ফুটে ওঠে, সেটি যা, তাই হয়। চিত্রকলাতেও শিল্পী যে সব ফর্ম সৃষ্টি করেন তার মধ্যেই অভ্রান্তভাবে

তাঁর চরিত্র আর মনের গড়ন বেরিয়ে পড়ে। বিশ্বজগতে যেমন নানা ফর্মের বৈচিত্র্যের সীমা-পরিসীমা নেই, স্থান্-কাল পাত্রভেদে তাদের রূপও যেমন বদলায়, তেমনি শিল্পীর সৃষ্টিতেও ফর্ম অসীম বিচিত্র হতে পারে। বাস্তব জগতে যেসব বস্তু বা পরিবেশকে শিল্পী বিশিষ্ট বা উল্লেখযোগ্য মনে করেন সে সব ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে তাঁর কাজে নিজের ব্যক্তিস্বরূপ ফুটে ওঠে, এবং যেহেতু ফর্মই ব্যক্তিস্বরূপ ফুটিয়ে তোলে, সেহেতু সে ফর্মও বিশিষ্ট হওয়া দরকার ; অর্থাৎ ছবিতে বিশিষ্ট কোন ফর্মের অনুভূতি প্রকাশ পাবে। কিন্তু বিভিন্ন ফর্ম ফুটিয়ে তুলতে হলে বিভিন্ন উপায় উপকরণ রীতি-পদ্ধতি বা টেকনিকও দরকার, বিভিন্ন রীতি বা স্টাইল দরকার। তার থেকেই বলে স্টাইলই শিল্পী, অর্থাৎ স্টাইলই সব। কতগুলি উদাহরণ দিলে কথাটি স্পষ্ট হবে। ক্লোদ ল লোরেনের কথা. দিয়েই শুরু করা যাক। তিনি ছিলেন ল্যাণ্ডস্কেপ পেন্টিং-এর জনক (চিত্র ১৪)। যদি আমরা ল্যাণ্ডস্কেপ চিত্রণকে নিতান্ত ব্যক্তিবিচ্ছিন্ন, বাইরের ব্যাপার বলে ধরি, মাঠ, ঘাট, নদী, বন. পাহাড়ের প্রতিচ্ছবি যথাযথভাবে ফুটিয়ে তোলার সমস্যা হিসেবে দেখি, তাহলে দেখব তাঁর উত্তরগামীদের চেয়ে ক্লোদের কীর্তি কম, তিনি এক হিসেবে কন্‌স্টেবল, কোরো, মনে,' বা সেজানের কীর্তির পথে ইতিহাসের ধাপ মাত্র। আলোছায়ার খেলায় রঙ কি রকম বদলায় তা দেখানোর কাজে ক্লোদের চেয়ে মনে' অনেক বেশী নিপুণ। কুর্বে যেভাবে একেকটি বস্তুর স্বাভাবিক প্রাকৃত সত্তাটি ধরতেন. ল্যাণ্ডস্কেপে পাহাড়, পাথর, গাছপালা, মানুষের দেহে যেভাবে শক্তি ও প্রাণ দিতেন, ক্লোদ ততখানি প্রাণ দিতে, জীবন্ত করতে পারতেন না। আসল লক্ষণগুলি ঠিকভাবে ধরে তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে. অবান্তর, অপ্রাসঙ্গিক উপচার বাদ দিতে. সমস্ত বস্তুতে তিনমাত্রিক ঘনত্ব, গভীরত্ব, ওজন ও অস্থিমজ্জা আনতে সেজান কুর্বের চেয়ে অনেক ভাল পারতেন।

তবুও ক্লোদের বিরুদ্ধে এ সব নালিশ আনা মানে ইসথেটিক উদ্দেশ্য ও ফর্মের আসল অর্থ নিয়ে ভুল করা। শিল্পীর উদ্দেশ্য কি ছিল, তারই উপরে তাঁর কাজের বিচার হওয়া উচিত। কোন বিশেষ ফর্ম কোন শিল্পীর চেয়ে আরেকজন শিল্পী আরও ভাল করে ফুটিয়েছেন বলেই এ কথা বলা যায় না যে, তাঁর কাজের মূল্য নেই ; তার আগে দেখতে হবে তিনি যা দেখাতে চেয়েছেন সে বিষয়ে তিনি কতখানি সফল হয়েছেন। ওয়ার্ডসওয়ার্থের থেকে কোলরিজ গৌণ কবি ছিলেন, কিন্তু তা বলে কোলরিজের এন্‌সেন্ট ম্যারিনারের মত কবিতা ওয়ার্ডসওয়ার্থ লেখেননি ; তার কারণ কবিতাটি

যে উদ্দেশ্যে কোলরিজ লেখেন তাতে তাঁর অভিপ্রায় অতি আশ্চর্যভাবে উজ্জ্বল ও নিখুঁত হয়েছে। তেমনি ক্লোদের ছিল প্রকৃতি সম্বন্ধে তীব্র আগ্রহ এবং উৎসাহ, প্রকৃতিকে তিনি দেখতেন মানুষী আবেগ ও অনুভূতির আধারভাবে, প্রকৃতিকে খণ্ড খণ্ড করে তার একেকটি টুকরোর প্রাণ সম্বন্ধে তাঁর ঔৎসুক্য ছিল কম। কোন দৃশ্যের সমস্তটি একসঙ্গে, অর্থাৎ সমগ্র ল্যাণ্ডস্কেপের অদেহী আত্মাটি, তাঁকে অভিভূত করত, নাড়া দিত, অর্থাৎ ল্যাণ্ডস্কেপের সব অঙ্গগুলি অবিচ্ছিন্নভাবে তাঁর চিত্রের একটি অখণ্ড ডিজাইন নির্ণয় করত। এবং ঠিক এই ডিজাইনটি তাঁর রচনার বিভিন্ন অঙ্গকে সূক্ষ্ম, অদৃশ্য, নানা সম্বন্ধে বাঁধত, তাঁর ছবিতে এমন রোমান্স, জমক, রহস্য, বৈভব, বিষাদ, রাজকীয় প্রসাদের সৃষ্টি করত যা শুধু প্রকৃতির অনেকখানি একসঙ্গে দেখতে পেলেই সম্ভব হয়। এই ধরনের সাধারণ সব কিছুতে পরিব্যাপ্ত ভাব আনতে হলে, রচনার প্রতিটি অংশের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলার দিকে মন দিলে চলে না। তাতে বৃহত্তর ডিজাইনটির ক্ষতি হয়। ক্লোদের ছবিতে খুঁটিনাটি গাছ বা পাহাড় হয়তো খুব প্রাণবন্ত মনে হয় না, বিশিষ্টভাবের অপ্রচুরতার দরুন ভিন্ন ভিন্ন ফিগরে বা বস্তুতে হয়তো দৃষ্টি নিস্পলক হয়ে আটকে যায় না ; কিন্তু ক্লোদের ছবিতে সেগুলি দোষ না হয়ে, তাঁর অক্ষমতা না হয়ে, বরং তাঁর ছবির মর্যাদা বৃদ্ধি করে, তাঁর উদ্দেশ্যকে আরও ভালভাবে ফুটিয়ে তোলে। ক্লোদ অনেক সময়ে তাঁর ছবিতে সাকরেদদের বলতেন ফিগর এঁকে দিতে ; তার মানে এ নয় যে, তিনি অমনোযোগী ছিলেন বা কাজে অবহেলা করতেন, তাতে শুধু এই বোঝায় যে, কোনটি তাঁর উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় সার্থকভাবে ফুটিয়ে তোলে, তার দিকেই ক্লোদের মনোযোগ ছিল বেশী। তদ্ব্যতীত আর যা কিছু গৌণ তা তিনি, রাফায়েল বা রুবেন্সের মত অনেক সময়ে সাকরেদদের উপর ছেড়ে দিতেন।

সুতরাং, বড় বড় দৃশ্য নিয়ে তাদের বৃহত্তর রূপের ডিজাইন ফুটিয়ে তোলাই ছিল ক্লোদের ফর্ম এবং তার পক্ষে তাঁর স্টাইল ছিল খুবই উপযোগী। মানে'র উদ্দেশ্য ছিল ক্লোদের ঠিক উল্টো। অনন্ত প্রকৃতির বিশাল রূপ, তার এপিক গুণ দেখানোর দিকে তাঁর মন ছিল না। প্রতিটি জিনিসের বিশিষ্ট স্বাভাবিক গুণ ফোটানোর দিকে তাঁর ছিল বেশী নজর। বিশাল ল্যাণ্ডস্কেপে ক্লোদের খুঁটিনাটি ডুবে যায়, তাদের মূল্য গৌণ হয়। এখানে বলা দরকার যে, খুঁটিনাটি জিনিসও ক্লোদ খুব মনোযোগ দিয়ে বিশদভাবে আঁকতেন। তবুও স্পষ্টই বোঝা যায় যে, খুঁটিনাটির দিকে তাঁর

মন ছিল না। ক্লোদের চেয়ে মানে'র বস্তু বা ফিগর অনেক বেশী সরলভাবে, সাদামাটাভাবে আঁকা, কিন্তু ওরই মধ্যে যে কয়টিকে তিনি বিশিষ্ট রূপ দেবার জন্যে বাছেন, তাদের স্বকীয়তা খুব ভালভাবে ফুটে ওঠে ; সে তুলনায় ক্লোদের তুলি যথাযথ হওয়া সত্ত্বেও যত না সংহত হয়, তত বেশী ছড়িয়ে যায়। মানে'র তুলির কাজে তাঁর তৃতীয়মাত্রা এবং ছায়াতপের বর্জনে, ফুটে ওঠে দৈনন্দিন জীবনের অতি সাধারণ জিনিসের অন্তর্নিহিত গুণ, তার অসাধারণত্ব, অনুপমত্ব। চলমান জগতের ছবি দেখানোর দিকে মানে'র ঝোঁক ছিল না, বরং বিভিন্ন বস্তুর স্বরূপ সম্বন্ধে ছিল তার বেশী উৎসাহ, তাঁদের বিশিষ্ট ক্রিয়া দেখানোর উদ্দেশ্যে তিনি তাদের অন্য পাঁচটা জিনিসের মধ্যে ন্যস্ত করতেন (চিত্র ৪৩)। ফলে তাঁর ডিজাইন হত চ্যাপটা, ফ্ল্যাট : অন্যপক্ষে ক্লোদের ডিজাইন ডিপ স্পেসের মধ্যে গাঁথা হত।

সাহিত্যের সঙ্গে তুলনা টানলে ক্লোদ আর মানে'র তফাতটি আরও ভালভাবে ফুটে উঠতে পারে, স্টাইল আর বিষয়বস্তুর সম্বন্ধটি পরিষ্কার হতে পারে। ক্লোদ ছিলেন মিলটনের যুগের লোক। মানে' ছিলেন মোপাসাঁর। রেনেসাঁস যুগের মত সতেরো শতকে লোকে তাঁদের কাজে অতিকায়, এপিক গুণ আনার চেষ্টা করত, যুগটি ছিল প্যারাডাইস লস্টের যুগ। উনিশ শতকে, বিশেষত শেষ ভাগে, মানুষের দৃষ্টি হল আরও সংকীর্ণ, কিন্তু সেই সংকীর্ণ দৃষ্টিপথে যা পড়ত তা অনেক বেশী পরিষ্কার ও তীক্ষ্ণভাবে দেখত। তাই মানে'র ফর্ম হল তাঁর নিজস্ব, তিনি যে যুগের তার উপযুক্ত, সেই বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। সুতরাং, মানে' কেন ক্লোদ হলেন না বলে খেদ করাও যা, আর মোপাসাঁ কেন মিলটন হলেন না বলে আক্ষেপ করা একই কথা।

ক্লোদ বা মানে' থেকে সেজানের উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন। সেই জন্যে তাঁর টেকনিকও হল ভিন্ন। মানে'র মতই সেজানের ছিল বাস্তব জিনিসের প্রতি উৎসাহ ; কিন্তু বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে নিগূঢ়, গতিময় বা ডাইনামিক সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠার দিকে সেজানের ছিল আরও বেশী আগ্রহ। দুজনের কেউই চোখের চেনা যাথাযথ্যের দিকে মন দেননি, দুজনেই বস্তুর প্রকৃত সত্তা আঁকার দিকে মন দেন। মানে'র সাধারণ ফর্মের পক্ষে চ্যাপটা, ফ্ল্যাট ছবিই হত অনেক বেশী ব্যঞ্জনাময় ; কিন্তু সেজানের ফর্ম সার্থক হত ডিজাইনের ঘনত্বে, ওজনবিশিষ্ট বস্তুর তিনমাত্রিক সম্পর্ক সাধনে। এই ধরনের প্রয়োজন ও তাগিদের সঙ্গে ইম্প্রেসনিস্টসুলভ রঙের ব্যবহার মেশার দরুন

সেজানের নতুন এক ফর্ম সৃষ্টির প্রয়োজন হয়। তিনি জাগতিক বস্তুর মধ্যে এমন এক সংগঠন আবিষ্কার করেন যা রঙের মাধ্যমে কতগুলি বাঁকানো চোরানো স্তর বা প্লেনের প্রয়োগে দেখতে হয়। এই বিশিষ্ট ধরনের সংগঠনটি ফুটিয়ে বার করার জন্যে তিনি তাঁর একান্ত নিজস্ব রীতি বা স্টাইল এবং টেকনিক সৃষ্টি করেন ; সে সৃষ্টি যে কত সার্থক হয়েছিল তা তাঁর কাজেই প্রমাণ হয় (চিত্র ১২)।

অ্যাকাডেমিক সমালোচনার বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি হচ্ছে এই যে, তা এমন কতগুলি বাঁধাধরা গৎ-এর প্রবর্তন করে যা পরিবর্তনশীল জগতকে স্বীকার করে না। ফলে সেই ছকের মধ্যে যা কিছু পড়ে না তার সম্বন্ধেই অ্যাকাডেমিক সমালোচনার ঘোরতর আপত্তি থাকে। কিন্তু যে কোন টেকনিকাল পদ্ধতিরই বিশিষ্ট ইসথেটিক উদ্দেশ্য থাকে ; বিশেষ একভাবে প্রকাশের মধ্যেই সে পদ্ধতির সার্থকতা ফোটে। সুতরাং, শিল্পীর উদ্দেশ্যটি স্পষ্ট না হলে, তাঁর পদ্ধতিটি কতখানি সার্থক বা অসার্থক তার বিচার চলে না। তাই যখন কোন শিল্পী আরেকজন শিল্পীর টেকনিক ধার করেন অথচ তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী নেন না, তখন তিনি তাঁর অদেহী আত্মাটি ফেলে দিয়ে তাঁর নশ্বর দেহটি বরণ করেন ; ফলে তাঁর কাজ হয় নিতান্ত অ্যাকাডেমিক, নয় শুধু অদ্ভুত, হয়, তাতে প্রাণশক্তি বা স্বকীয়তা থাকে না। কিন্তু যে শিল্পী তাঁর ঐতিহ্যকে স্বীকার করেন, তিনি তাকে নিজের প্রয়োজনমত কাজে লাগান, তার টেকনিকাল সম্পদকে কলের মত ব্যবহার না করে, নিপুণ বুদ্ধিতে ব্যবহার করেন। যেমন বেলিনি, জর্জনে, তিশান, তিন্তোরেত্তো সকলেই ভিনিশান ঐতিহ্যে কাজ করেন, কিন্তু প্রত্যেকেই নিজের নিজের ফর্ম সৃষ্টি করে সেই সাধারণ ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করেন।

মিকেলাঞ্জেলো, এল্ গ্রেকো, পিসারোর কাছ থেকে সেজান শিখেছিলেন বলেই যে সেজানের ব্যক্তিত্বের হানি হয়েছিল তা নয় (চিত্র ১৬)। মিকেলাঞ্জেলোর কাছ থেকে সেজান শেখেন কি করে শরীরের পেশীগুলি স্পষ্ট করে ফলাও করে দেখিয়ে, ছবিতে ভারী, ঘনভাবে আনতে হয়। স্বাভাবিক আকার এবং গড়ন বিকৃত করে ছবির ডিজাইন কি করে সমৃদ্ধ করতে হয় তা তিনি এল্ গ্রেকোর কাছে শেখেন। পিসারোর কাছে তিনি শেখেন কি করে রঙের সঙ্গে আলো মিশিয়ে ছবির কাঠামো তৈরি করতে হয়, নির্মাণের কাজে রঙ আর আলোকে সেইভাবে ব্যবহার করলে ছবি কত গভীরভাবে মনকে নাড়া দেয়। কিন্তু এ সমস্ত টেকনিকাল পদ্ধতিই তিনি একান্ত নিজস্ব এক ফর্মের নিয়োগে সৃজন করেন। কিন্তু

সেজান যেভাবে শিখেছিলেন, অর্থাৎ পূর্বজদের কীর্তি পরিপাক করেন, দেরায়াঁ সেভাবে সেজান এবং অন্যান্য শিল্পীদের কাজ আত্মস্থ করেছিলেন বলা যায় না। দেরায়াঁ অন্যান্য শিল্পীদের রীতিপদ্ধতি আত্মসাৎ করেন, কিন্তু তাঁর গুরুদের দৃষ্টি তিনি পাননি, ফলে তিনি ধার নিয়ে ভালমত ধার শোধ করলেন না। তাঁর কাজ টেকনিকের কৌশলমাত্র থেকে গেল। তাই দেরায়াঁ ঐতিহ্যের প্রধান ধারায় স্থান পাবেন না, তাঁর স্থান সে ধারার বাইরে, নিপুণ শিল্পী হিসেবে। রেনেসাঁসের শেষ যুগের বোলোনিজ শিল্পীদের মত, দেরায়াঁ অন্য শিল্পীদের রীতিকৌশল আত্মসাৎ করেন, কিন্তু নিজে নতুন কিছু সৃষ্টি করেননি।

ছবিতে প্ল্যাস্টিক এবং অন্যান্য মূল্য

আগেই বলেছি শিল্পী আমাদের সমুখে এমন কিছু ফর্ম সাজান যা তাঁর কাছে মূল্যবান ও তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয় এবং তাঁর নিজের আবেগগুলি ফুটিয়ে তোলে। এবং যেহেতু যে কোন বস্তু বা ঘটনার অসংখ্য ফর্ম থাকতে পারে, সেহেতু তিনি নানাভাবে কাজ করতে পারেন। তবে সবকিছুই যে চিত্রশিল্পী দেখাতে পারবেন তা নয়। সঙ্গীত, সাহিত্য, চিত্রকলা প্রত্যেকেরই নিজস্ব গণ্ডী আছে, সেই গণ্ডীকে স্বীকার করেই তবে শিল্পী বাস্তব জগৎ থেকে ফর্ম বাছাই করেন। কিন্তু যখন একটি শিল্প আরেকটি শিল্পের গণ্ডীর মধ্যে ঢুকে যায় অর্থাৎ সঙ্গীত বা ছবি যখন সাহিত্য বা কাব্যের রাজ্যে প্রবেশ করে, তখনই রসশাস্ত্রের যত জটিল সমস্যা দেখা দেয়। প্রকৃত প্ল্যাস্টিক ফর্ম আর আখ্যান বা বর্ণনার মধ্যে কি তফাৎ তার আলোচনা আগে হয়েছে। এখানে আমরা দেখব প্ল্যাস্টিক ফর্ম আর আখ্যান বা বর্ণনা কতখানি সঙ্গতভাবে একই শিল্পসৃষ্টিতে মিশে যেতে পারে।

সঙ্গীতেও এই ধরনের সমস্যা দেখা যায়। পাশ্চাত্য সঙ্গীতে কণ্ঠসঙ্গীতের চেয়ে "শুদ্ধ" বা যন্ত্রসঙ্গীতের স্থান উঁচুতে দেয়া হয়। তার কারণ কথার সঙ্গে ভাব জড়িত থাকে, এবং বিশুদ্ধ সঙ্গীতের অনুরাগীরা মনে করেন যে কথা বা কাব্যিক আবেগের উপর ভর দিয়ে সঙ্গীতের চলা উচিত নয়। সেজন্য সোনাটা, সিম্ফনি ইত্যাদিব পাশে অপেরাগান ইত্যাদিকে নিকৃষ্ট শ্রেণীর বলে ধরা হয়। অন্যদিকে আবার যখন "বিশুদ্ধ"

সঙ্গীতের মধ্যে হাইডনের সিম্ফনির সঙ্গে বেটোফেনের 'এরোইকা' বা 'পাস্টোরাল' সিম্ফনির তুলনা করি তখন বেটোফেনের কীর্তির সাহিত্যঘেঁষা গুণ তাঁর সঙ্গীতের মর্যাদা যেন বাড়ায় বই কমায় না। বেটোফেন তাঁর তৃতীয় সিম্ফনির অপর নাম দেন 'একজন মহৎ পুরুষের উদ্দেশে' এবং সিম্ফনিটিতে সত্যই বীরোচিত গুণ আছে। হাইড্‌নের কোন সিম্ফনিতে এ ধরনের সাহিত্য-রস নেই। কিন্তু আমাদের এরোইকা ভাল লাগে মুখ্যত তার অন্তর্নিহিত গুণের জন্যে ; তাতে নামের গুণও অবশ্য সংযুক্ত হয় তাতে আমাদের ভাল বই খারাপ লাগে না।

এরোইকার সঙ্গে বিপরীত তুলনা চলে চাইকোভস্কির "১৮১২" নামে ওভারটুরের। এর বিষয় হচ্ছে নেপোলিয়নের রাশিয়া আক্রমণ ও পরাজয়। প্রথমে আসে গুরুগম্ভীর কয়েকটি কলি, তার আশ্লেষ হচ্ছে একটি সমগ্র জাতি নিজের দেশ রক্ষার্থে কি করে প্রাণপ্রতিজ্ঞা করে। তারপরে আসে ফরাসী জাতীয় সঙ্গীত মার্সেয়াইজ ; তার পিছনে রুশ জাতীয় সঙ্গীত ; যুদ্ধের উত্তাল কলরোলের মধ্যে দুই জাতীয় সঙ্গীতের কলহ শোনা যায়। প্রথমে রুশ জাতীয় সঙ্গীতটি ছেঁড়া ছেঁড়া ভাবে বাজানো হয়, হঠাৎ হঠাৎ হারিয়ে যায় ; তারপর আস্তে আস্তে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়, শেষের দিকে খুব দৃপ্তভাবে বাজানো হয় ; অন্যদিকে মার্সেয়াইজটি আস্তে আস্তে কেঁপে কেঁপে স্তিমিত হয়ে মিলিয়ে যায়। শেষের দিকে বিজয়ের করতাল, ঘণ্টা ও শিঙার মুহুর্মুহু নিনাদে সঙ্গীতটি শেষ হয়। সমস্ত রচনাটি নিতান্ত নাটুকে লাগে। জাতীয় সঙ্গীতের কলহ এবং যুদ্ধের কলরোল সঙ্গীতের ধ্বনিতে অনুকরণ করা নিতান্তই ছেলেমানুষি মনে হয়, তাতে রসোত্তীর্ণ সঙ্গীতের চেয়ে নেহাৎ বিরক্তিকর নাটুকেপনার ভাব বেশী আসে।

এই দুটি উদাহরণ থেকে আমরা কোন্ বিষয়বস্তুটি ন্যায্য এবং প্রাসঙ্গিক আর কোনটিই বা অন্যায্য এবং অপ্রাসঙ্গিক তার সম্বন্ধে দুয়েকটি সাধারণ সূত্রের অবতারণা করতে পারি। যেখানে কোন গল্প বা ঘটনা জানা থাকলে তবেই সঙ্গীতের সবটুকু বোঝা যায়, সেখানে সেই বিষয়বস্তুটি সঙ্গীতের দিক দিয়ে অন্যায্য ও অপ্রাসঙ্গিক, কারণ সেখানে সঙ্গীতটি সঙ্গীতবহির্ভূত কতগুলি খুঁটি বা আশ্রয়ের উপর একান্তভাবে নির্ভর। কিন্তু যেখানে সঙ্গীতের মধ্যেই সঙ্গীতেরই ন্যায্য উপাদানের সাহায্যে কোন কাব্যিক বা সাহিত্যিক রস ফুটে ওঠে, সেখানে সে বিষয়বস্তু নিতান্ত ন্যায্য বা প্রাসঙ্গিক। এরোইকা সিম্ফনির দ্বিতীয় মুভমেন্ট বা পরিচ্ছেদের সঙ্গীতে যে

ট্র্যাজেডি ফুটে ওঠে, নেপোলিয়নের আখ্যান না জানলেও তার রস অনুভব করতে অসুবিধা হয় না। ভারতীয় রাগরাগিণী বিষয়বস্তুর ন্যায্য ব্যবহারের সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ। ছয় ঋতু এবং পাঁচ প্রহরের প্রতিটি ঋতু এবং প্রহরের মানসিক আবেগের একান্ত উপযোগী এমন সঙ্গীতের গৎ আর হয় না ; বিষয়বস্তু উপলক্ষ ও সঙ্গীত সেখানে একেবারে অভিন্ন হয়ে যায়।

চিত্রকলার ক্ষেত্রেও তাই। যেখানে আখ্যান বা বর্ণনাই হয় প্রধান সেখানে চিত্ররস গৌণ হতে বাধ্য। ঠিক যেমন কবিগানে গান গৌণ, গল্পই প্রধান। অনেক বড় বড় শিল্পীরাও এ ভুল করেন, চিত্রকলার বদলে গল্প বলেন। আমাদের দেশে অবনীন্দ্রনাথ বা নন্দলাল বসু এই লোভ সংবরণ করতে পারেননি। দেলাক্রোয়ার রঙের ব্যবহার সত্যই অসাধারণ, যেমন শক্তিমান তেমনি অসমসাহসী. রঙের ব্যবহারে তিনি সত্যই মহৎ। কিন্তু তিনি মনেপ্রাণে ছিলেন রোমান্টিক, উত্তাল আবেগের মধ্যে থাকতেন ; ফলে তাঁর ছবির ফর্মও হত আশ্চর্য, মৌলিক, অপূর্ব। কিন্তু তাঁর কাছে যা ছিল রোমান্স, শৌর্য, বীর্য, বীরত্ব, যা তিনি দেখতেন কাব্যময়, কাল্পনিক দৃশ্যে অথবা শরীরের অতিরঞ্জিত ভঙ্গীতে, তা আমাদের এখন আর স্বর্গীয়ভাবময় মনে হয় না, বরং মনে হয় বড় বেশী নাটুকে, ফাঁপা। তাঁর এই যাত্রাদলসুলভ সাজসজ্জাতে এই সন্দেহই হয় তিনি দৃশ্যমান জগৎকে ভাল করে দেখতেন না (চিত্র ১৭)। তাঁর নাটকীয় বোধ যদি সত্যই তাঁর দৃষ্টিকে তীক্ষ্ণ করত, যদি তিনি যেসব জিনিস মনে মনে ভালবাসতেন তার প্রতিচ্ছবি বাস্তব জগতে একাগ্রমনে খুঁজতেন তাহলে ফর্ম ও নাটক সম্বন্ধে বোধ ও ধারণা ঢের ভাল হত, তাঁর ছবি আরও সার্থক হত। যথা, তিন্তোরেত্তো অত্যন্ত নাটকীয় বিষয়ের উপর ছবি আঁকতেন, কিন্তু তিনি ছবিতে নাটুকে ভাব না এনে সাহিত্যিক রসের তুল্যমূল্য, প্ল্যাস্টিক গুণ সৃষ্টি করতেন, ছবির রঙে, রেখায়, আলোছায়ায়, স্পেসে বৈধ চিত্রসৃষ্টি করতেন (চিত্র ৮)। ফলে যেখানে দেলাক্রোয়ায় আমরা পাই নাটুকেপনা, অতিরঞ্জন, মেলোড্রামা, সেখানে তিন্তোরেত্তোয় আমরা পাই প্রশান্তির আস্বাদ, যে প্রশান্তি চিত্রে ষড়ঙ্গের সার্থক প্রয়োগেই সম্ভব।

মান্তেনিয়া, গোইয়া, দ্যমিয়ে, গ্লাকেন্স, পাস্যাঁ আখ্যান বা গল্পবলাকে এত উঁচু স্তরে নিয়ে যান যে তা মহৎ শিল্প হয়ে দাঁড়ায় (চিত্র ২৯)। এঁদের প্রত্যেকেই ঘটনা বলায় ব্যস্ত, কিন্তু যে উপায়ে তাঁরা বলেন তা নিতান্ত প্ল্যাস্টিকমূল্যসম্মত, প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত প্রকাশভঙ্গী নিতান্ত মৌলিক, যে কোন ঘটনার আসল তাৎপর্যটুকু তাঁরা আশ্চর্যরকম নিশ্চিত হাতে ধরেন।

তাঁদের ছবি দেখে আমরা যে আনন্দ পাই তা নিতান্তই চিত্রধর্মী, সাহিত্যধর্মী নয় ; তার কারণ তাঁদের ছবিতে গল্প হয় গৌণ, যে ছবিতে আখ্যানটি রচিত তার চিত্রগত ফর্মের কাছে গল্পটি গৌণ (চিত্র ১৮)। রঙ রেখা স্পেস সবই এমন বিশিষ্ট ফর্মে আবদ্ধ যে তার স্বকীয়তায় হাস্যকৌতুক, ব্যঙ্গ, শ্লেষ, আপনিই ফুটে ওঠে। তাঁদের কল্পনার প্রসার ও দৃষ্টি, মৌলিকতা এবং শক্তির জোরেই তাঁদের ছবির ফর্ম অত বিশিষ্ট হয়।

বিষয়বস্তুকে আরও উচ্চতর প্ল্যাস্টিক মূল্যে মণ্ডিত করার ক্ষমতা এঁদের চেয়ে ভেলাস্কেথ বা রেনোয়ারের বেশী ছিল। এঁদের দুজনেরই ব্যক্তিস্বরূপ ও দৃষ্টি যেমন প্রখর ছিল, তেমনি ছিল তাঁদের চিত্রকলার সবকটি উপাদান। যথা, রঙ, ড্রয়িং, কম্পোজিশন এবং ডিজাইনের উপর দখল। তার জোরে তাঁরা বস্তুর স্বরূপ উন্মোচন করতে পারতেন। দুজনের মধ্যে রেনোয়ারের প্রকৃতি ছিল বেশী কবিত্বময়। যৌবনের, বসন্তের, প্রাণের উচ্ছলভাব তাঁর ছবিতে খুব ভাল ধরা পড়ে, পৃথিবীর যা কিছু আনন্দময়, জ্বলজ্বলে তা তিনি যেন টেনে বার করে ছবিতে দেখান। সেই হিসেবে ভেলাস্কেথ বাস্তবপন্থী, কিন্তু তাঁর বাস্তববাদ এত বেশী বস্তুর গভীরে প্রবেশ করে যে, তাঁর ছবি শুধু চোখের চেনা, চোখের দেখা আর থাকে না, তিনি তাঁর বিষয়কে উদ্ভাসিত করেন কোন সস্তার অলঙ্কারে নয় বরং এমন এক সরলতায়, বিনয়ে এবং তিতিক্ষায়, যার ফলে তাঁর নিজের অস্তিত্ব ও অহঙ্কার যেন লোপ পায়, বস্তুর অন্তরের প্রকৃতি যেন চিত্রের উপাদানে আপনিই বেরিয়ে আসে। অর্থাৎ তিনি ছবিতে যেন নিজের ব্যক্তিস্বরূপকেও বিলোপ করতে বদ্ধপরিকর। দুজনেই অতি আশ্চর্য সন্ধানী চোখে বিশ্বের কোন্ কোন্ রূপ চিত্রের ভাষায় পুনর্ব্যক্ত করা যায় তাই খুঁজতেন, দুজনেই জানতেন বাহ্যরূপের নিশ্চিন্ত প্রকাশের মধ্য দিয়ে অন্তরের রূপ কি করে প্রকাশ করতে হয় (চিত্র ১০)।

অনেকে মনে করেন কুর্বে এবং মানে'র আবির্ভাবের পর চিত্রকলা থেকে বিষয়বস্তুর মূল্য চলে গেল। কুর্বে, মানে' এবং তাঁর পরবর্তীগণ যা কিছু পেলেন তাই আঁকলেন (চিত্র ৪৪)। জত্তো থেকে দেলাক্রোয়া পর্যন্ত যে একটানা ধারাটি ইওরোপীয় চিত্রকলায় আমরা পাই নতুন ধারা তার থেকে যেন সম্পূর্ণ বিপরীত। কিন্তু ছবিতে যদি বিশেষ এক ধরনের বিষয় না থাকে তার মানে এ নয় যে চিত্রে বিষয়বস্তুর বালাই লোপ পেল ; এরকম মনে করা নিতান্ত ভুল। দৈনন্দিন জীবনে আমরা কোন বিশেষ নম্বরের পাঁচ টাকার নোট হাতে পেলুম, কি আরেক নম্বরের নোটটি হাতে

পেলুম। গ্রাহ্য করি না, যতক্ষণ আমাদের হাতে পাঁচ টাকার নোটটিই থাকে। মানে' এবং তাঁর পরবর্তী শিল্পীরা যখন ঘোষণা করলেন যে বিষয়ের কোন মূল্য নেই, তাতে তাঁরা এইটুকুই বোঝাতে চাইলেন যে চিত্রের নিজস্ব যেসব গুণের আবিষ্কারে তাঁরা আগ্রহান্বিত সে-সব গুণ যে-কোন বিষয়েই পাওয়া যাবে। মানে' বিশ্বাস করলেন যে যে-কোন বস্তুই তার নিজ গুণেই নিতান্ত মূল্যবান, নিজ গুণেই সে চিত্রের বিষয় হবার যোগ্য, যোগ্যতা অর্জনের জন্যে তার নাটকীয় পরিবেশের পোশাক পরার দরকার নেই। সেই হিসেবে মানে' দাভিদের চেয়েও অনেক বেশী সত্যভাবে চিত্রের বিষয় সম্বন্ধে সচেতন, কারণ তিনি যে কোন জিনিসেই রূপ খুঁজতেন, দাভিদের মত শুধু মহান, অর্থাৎ সাজানো-গোছানো উপাখ্যানেই চিত্রের বিষয় খুঁজতেন না। অর্থাৎ মানে' ছিলেন জীবনে বিশ্বাসী, দাভিদ ছিলেন মৃতজগতে আগ্রহশীল (চিত্র ৪৫)।

আরেকটি নিতান্ত ভুল ধারণা সাধারণত চলিত আছে। অনেকে মনে করেন বিষয়বস্তু মানেই একটি অথবা কয়েকটি জিনিসের সমাবেশ। কিন্তু কিউবিস্ট ছবিতে বিভিন্ন বিষয় বা বস্তুর মধ্যে যোগসূত্রটি হয়ত খুবই ক্ষীণ থাকে ; তবুও ছবিটি যে মনকে নাড়া দেয় তার কারণ এ নয় যে প্রতিটি জিনিসের মানবিক মূল্য আমাদের মুগ্ধ করছে। যথা, হয়ত কোন ছবিতে একটি বেহালাকেই আমরা নানাস্তরে বা প্লেনে ছত্রভঙ্গ অবস্থায় দেখি ; খণ্ড খণ্ড নানা ভঙ্গীতে, কোণে, নানা বিকৃতিতে বেহালার অংশগুলি পড়ে থাকে, অথচ সব অংশগুলি পুনর্গ্রথিত হয়, চোখের চেনার নিশ্চিন্ত গৌণ প্রসাদে নয়, চিত্রের প্ল্যাস্টিক ফর্মে ; যার নিজস্ব বস্তুবিচ্ছিন্ন লাবণ্য ও আবেগ ছবির সমস্ত অংশে সঞ্চারিত হয়। তখন একদিকে ছবি আর অন্যদিকে আসল বস্তুর চোখের চেনা সাদৃশ্য চলে যায়, এমন কি তলায় ছবির নাম না থাকলে ধরা মুশকিল হয়। এমন কি তলায় নামের কৃপায় বিসয়বস্তুর হদিশ পেলেও তাতে রসাস্বাদ বাড়ে না। এতেই প্রমাণ হয় যে বাস্তব জগতে চোখের চেনা কোন জিনিসের সঙ্গে কোন মিল নেই, অথবা আপাতদৃষ্টিতে তাতে কোন আবেদন নেই, এমন ফর্মেও চিত্ররস থাকা সম্ভব। এটা খানিকটা ন্যায়শাস্ত্রের অসম্ভব বাচনের মত শোনায়, কিন্তু কিউবিজম ও ইমপ্রেশনিজমের অম্বিষ্টবিষয়ে সামান্য আলোচনায় কথাটি স্পষ্ট হবে। ইমপ্রেশনিস্টরা যে-কোন বিষয়কেই ছবির উপযুক্ত মনে করতেন কারণ তাঁরা স্বীকার করতেন যে যে-কোন বস্তুরই নিজস্ব বিশিষ্ট ফর্ম বা গুণ আছে যা চিত্রে প্রতিফলিত করা সম্ভব। কিন্তু কিউবিস্টরা

ইমপ্রেশনিস্টদের থেকে আরেক ধাপ এগিয়ে গেলেন। তাঁরা বললেন যে আপেলের আপেলত্ব, অথবা নারীর নারীত্ব, অর্থাৎ প্রতি জিনিসের বিশিষ্ট, স্বকীয় গুণ সম্বন্ধে তাঁদের যত না উৎসাহ বা আগ্রহ তার চেয়ে তাঁদের বেশী আগ্রহ এই দৃশ্যমান জগতে এই দুই ধরনের বস্তুর মধ্যে বা অন্য আরও অনেক জিনিসে একই গুণগুলি কি ভাবে বর্তমান সে সম্বন্ধে। বস্তুত ইমপ্রেশনিস্ট ও কিউবিস্টদের মধ্যপথে আরেকজন শিল্পীর আবির্ভাব হল যিনি দুই ধারার মধ্যে যোগসূত্রস্বরূপ দাঁড়ালেন, তিনি সেজান। সেজানের ছবি মানে'র মত স্বাভাবিক বা জীবন্ত হল না। একেক সময় তাদের আকার এত বিকৃত হল যে স্বাভাবিক বস্তুর সঙ্গে বিশেষ মিলই রইল না। কিন্তু তবুও তারা যেন মানে'র ছবির চেয়ে আরও তীব্র, গভীর কোন বাস্তবের সন্ধান বয়ে আনল। বলা বাহুল্য এ বাস্তব চোখের চেনাজানা বাস্তব হল না। এ বাস্তব গভীরত্ব, ঘনত্ব বা স্পর্শগ্রাহ্যতায় এল না ; তা হল আরও সাধারণ, সর্বাশ্রয়ী, কিন্তু তা বলে কিছু কম বস্তুনিষ্ঠ নয় (চিত্র ৪৩)।

এখানে বক্তব্য হচ্ছে এই যে, ছবি থেকে চোখের চেনাজানা জগৎ লোপ পেলেই যে ছবি বাস্তব জগতের সন্ধান দেবে না তা নয়, যে রূপে সাধারণ বস্তুকে আমরা দেখতে অভ্যস্ত সেই রূপটি চলে গিয়ে অন্য কোন রূপ এলেই যে সত্যকারের বিষয়বস্তু ছবি থেকে লোপ পাবে তা নয়। ঠিক যেমন রসায়ন বা কৃষিশাস্ত্রে বৈজ্ঞানিকরা হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, ফসফরাস, কার্বন ইত্যাদি নিয়ে কথা বলেন বলেই এটা বোঝায় না যে তাঁরা মাটি, হাওয়া, আগুন, জলের সঙ্গে সম্বন্ধ হারিয়েছেন।

কোন ফর্ম বা ফর্ম সমষ্টি নিতান্ত ফোটোগ্রাফের তুল্যমূল্য, আর কোনটিরই বা গভীর তাৎপর্য আছে, কোনটি বস্তুর সার্থক রূপ ফুটিয়ে তোলে এ সম্বন্ধে যত মত তত পথ বর্তমান, সমালোচকদের যেন কিছুতেই মতৈক্য হয় না। এর প্রধান কারণ হচ্ছে যে বিচার নির্ভর করে লোকের উপর ; এবং কোন দুটি ব্যক্তির একেবারে হুবহু একই ধরনের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার নেই, ফলে কোন শিল্পীর সৃষ্টি অনুধাবন করার ক্ষমতা যে-কোন দুটি লোকের ঠিক এক হতে পারে না। একটা স্তর অবধি চিত্র সমালোচকদের মধ্যে মিল থাকা নিতান্ত সম্ভব, কিন্তু সেই স্তরের উপরে যখন সমালোচক যান তখন তাঁর দৃষ্টি বা বীক্ষার ক্ষমতা, তাঁর নিজের বিরাট অভিজ্ঞতা ও ফর্ম সম্বন্ধে অতি সূক্ষ্ম বোধের উপর খুব বেশী নির্ভর করে। তখন সমালোচকের পক্ষেও ধরা মুশকিল হয় যে তিনি যা অনুভব

করছেন তার কতখানি আসলে তাঁর নিজের মনের দান আর কতখানি সত্যই শিল্পসৃষ্টিতে বর্তমান।

দৃষ্টান্তস্বরূপ গোগ্যাঁর টাহিটিবিষয়ক চিত্ররাজির কথা ধরা যাক। টাহিটি চিত্রাবলীই হচ্ছে গোগ্যাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কীর্তি ; কিন্তু তার আবেদন হয়ত তার বিষয়বস্তুতেই বেশী (চিত্র ৪৩)। কন্‌স্টেবল যেমন ইংলণ্ডের গ্রামের আকাশ-বাতাসকে মূর্ত করে তুলতে পারতেন তেমনি গোগ্যাঁর ছবি আমাদের চোখে টাহিটির কল্পনাকে মূর্ত করে। কারও কাছে সে ছবির স্বপ্নলোকের মত দূরদেশী, অচেনা, এমন কি কিছুটা ভয়াল—কিছুটা বাসনাসক্ত—কিছুটা পঙ্কিল গুণ হয়ত সত্যকারের ইসথেটিক মূল্যের শামিল হয়, কারও কাছে হয়ত মনে হয় নিতান্ত মেকি, যেন শিল্পী পুরনো জ্ঞানবৃদ্ধ সভ্যতার শান্ত সংযত দৃশ্যে শ্রান্ত হয়ে নতুন উত্তেজনা খুঁজছেন। গোগ্যাঁর ছবির প্রকৃত প্লাস্টিক মূল্যের বিচারের কথা এখানে যদি নাও তোলা যায়, তা হলেও তাঁর সম্বন্ধে ব্যক্তিগত রুচি এবং উৎসাহের প্রশ্ন থেকে যায়। এমন অনেকেই আছেন যাঁরা সদা সর্বদা নতুন অভিজ্ঞতার আশায় ছোটেন, পুরনো অভ্যাসে সহজেই ক্লান্ত হয়ে নতুন পরিবেশে যেতে চান, অর্থাৎ যাঁরা ক্রমাগত নতুন নতুন অনুভূতি সঞ্চয় করতে চান ; অস্থির হয়ে তাঁরা সারা পৃথিবী চষে বেড়ান। আবার অনেকে আছেন যাঁরা যেটুকু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয়েছে তারই পুনঃপুনঃ বিচার করেন, তারই মধ্যে নানা ভাগ নানা শৃঙ্খলা আনেন, জীবনের অপেক্ষাকৃত স্বল্প একটু অংশকে খুব গভীরভাবে তলিয়ে দেখতে চান। সাহিত্যে উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় আর্নেস্ট হেমিংওয়ে এবং টমাস মানের। দুই উৎসাহই ন্যায্য, বৈধও বটে ; নানা দেশব্যাপী অভিজ্ঞতারও যেমন মূল্য আছে, ছোট্ট একটু স্থানের গভীর অভিজ্ঞতারও তেমন মূল্য আছে। কিন্তু যাঁর এ দুইদিকের যে-কোন একদিকের প্রতি অত্যধিক পক্ষপাত বা অত্যধিক ঝোঁক থাকে তাঁর কাছে অপর দিকটি নিকৃষ্ট বলে মনে হবে। প্রথম দলের লোকের চোখে কনস্টেবল বড় মিনমিনে লাগবে, দ্বিতীয় দলের চোখে গোগ্যাঁ বড় গ্রাম্যতাদুষ্ট মনে হবে। যাঁদের চোখে কনস্টেবল খুব ব্যঞ্জনাময় মনে হবে তাঁদের চোখে গোগ্যাঁর ছবি আঘাত দেবে, তার অজানা অচেনা রূপ কল্পনাকে ব্যাহত করবে। সেই রকম গোগ্যাঁর ছবি যাঁকে তৃপ্ত করে, কনস্টেবলের ছবি হয়ত তাঁকে নাড়া দেয় না। যে ছবি আমাদের মনে কোন রকম সাড়া জাগায় না, ধ্বনি তোলে না, সে ছবি দেখে আমরা বিরক্ত হয়ে বলি চোখের-চেনা-আঁকা ফোটোগ্রাফ, নীরস,

চটকদার ; আমরা যার মধ্যে মানে খুঁজে পাই তাই আমাদের আঁকড়ে ধরে। যাঁরা সৃষ্টির রহস্য বুঝতে চান না তাঁদের কাছে যেমন বিজ্ঞানের কোন আকর্ষণ নেই। যাঁরা সৃষ্টিকে কল্পনার সাহায্যে হৃদয়ঙ্গম করতে চান না, তাঁদের কাছে কাব্য সাহিত্য নিতান্ত ক্লান্তিকর, অনর্থক, মূল্যহীন।

এসব কথা অবশ্য অধিকাংশ সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তির সম্বন্ধে প্রযোজ্য। কিন্তু যিনি অনুশীলন করে দৃষ্টি, বোধ, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ করেছেন তাঁর কাছে কনস্টেবলের পাশে গোগ্যাঁর কাজ স্বভাবতই তরল এবং দুর্বল বলে মনে হবে। যাঁরা গোগ্যাঁর কাজ দেখে চিত্রের পরিপূর্ণ রসাস্বাদ করেন, বলেন, বুঝতে হবে তাঁরা স্পষ্টতই বিশেষ এক ধরনের বিষয়বস্তুর পক্ষপাতী। তাঁদের কাছে চিত্রের প্ল্যাস্টিক গুণের চেয়েও বিষয়বস্তুর মূল্য বেশী। সেটা কোন দোষের কথা নয়, তবুও এটা ঠিক যে এক্ষেত্রে ছবির চেয়ে দর্শক প্রধান স্থান গ্রহণ করেন। গোগ্যাঁর চিত্রকে আশ্রয় করে দর্শক মনে মনে যে জগতের সৃষ্টি করেন তা তাঁর নিজের। অথচ কনস্টেবলের কাজে যে প্ল্যাস্টিক ফর্মের সিদ্ধি দেখি তাতেই আমাদের রসবোধ অনেক বেশী তৃপ্ত হয়, কনস্টেবলের ছবি দেখে দর্শক নিজের মনে আরেক জগৎ সৃষ্টি করতে প্রবৃত্ত হন না। অবশ্য তার মধ্যে কথা আছে এই যে কনস্টেবলের জগৎ আমাদের চেনা ও জানা, গোগ্যাঁর জগৎ নয় : প্রশ্ন হচ্ছে আমরা কনস্টেবলের ছবি দেখে যতখানি তৃপ্তি পাই গোগ্যাঁর ছবি দেখে বিদগ্ধ টাহিটিবাসী ততখানি তৃপ্তি পাবেন কিনা। তা বোধহয় পাবেন না, কারণ গোগ্যাঁ যখন টাহিটির ছবি আঁকলেন তখন তাঁর রীতি এবং টেকনিক হল ইওরোপীয়, তিনি ইওরোপীয় চোখে টাহিটিকে দেখলেন, ইওরোপীয় চিত্রভাষায় টাহিটিকে ব্যক্ত করলেন, ইওরোপীয় তুলিতে টাহিটি আঁকলেন ; অর্থাৎ বিষয়বস্তু যদিও টাহিটি, কথক হলেন ইওরোপীয় ; সুতরাং তাঁর ছবিতে টাহিটির নিজস্ব চিত্ররীতি, নিজস্ব চিত্র ঐতিহ্য, নিজস্ব জাতিগত অভিজ্ঞতা প্রকাশ পেল না। সেক্ষেত্রে নিরাসক্ত শিক্ষিত চোখে গোগ্যাঁর সমর্থকদের ভাববিলাসিতা ধরা পড়বেই।

ফর্ম এবং বস্তু

এতক্ষণ ফর্ম সংশ্লিষ্ট শিল্পমূল্যের কথাই শুধু আলোচনা করেছি ; যে-সব বস্তুর সংগঠনে ফর্মের সৃষ্টি হয় তার প্রসঙ্গত উল্লেখ করেছি মাত্র।

আমরা দেখেছি যে ফর্ম এবং বস্তুর যে তফাৎ আমরা করি তা নিতান্ত আপেক্ষিক। আমরা ফর্ম এবং বস্তুকে দুটি স্বয়ংসম্পূর্ণ, স্বতন্ত্র সত্তা বলে ভাবতে পারি না ; ফর্ম নিজের ইচ্ছেমত রূপ নেয় অথবা বস্তু তার স্বভাবমত বদলায় এ কখনও হয় না ; দুটি উপকরণ স্বতন্ত্র বা অন্যোন্য নিরপেক্ষ থেকে চিত্রকে রসোত্তীর্ণ করে তা নয়। বস্তু বাদ দিয়ে ফর্ম হয় না। এখন ফর্ম এবং বস্তু যে সত্যই এক অখণ্ড এবং অবিভাজ্য, সে সম্বন্ধে একটু আলোচনা দরকার ; দেখানো দরকার আপাতদৃষ্টিতে বস্তুর যে সব স্বতন্ত্র বিভিন্ন মূল্য থাকে তারা কিভাবে আসলে ফর্মের মূল্যেই নিহিত।

ফর্ম ও বস্তুর মধ্যে অঙ্গাঙ্গীসম্বন্ধের আলোচনা প্রসঙ্গে রঙের বিশিষ্ট ক্রিয়া নিয়ে আলোচনা শুরু করা সঙ্গত হবে। নকশার রেখায় যে রঙ যোগ করা হয় তা যে নকশার ফর্মটিকে শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে তা নয়। সে রঙ ফর্মের ভিতরে প্রবেশ করে ফর্মের অঙ্গ হয়ে একাত্ম হয়ে যায় ; যে ছবি যত উৎকৃষ্ট তার পক্ষে এ কথাটি তত বেশী খাটে। অবশ্য অনেক চিত্র আছে যেখানে ফর্মটি চিত্রিত হয় না, শুধু নকশা করা হয়, তার উপরে অলঙ্কার বসনের মত রঙ চড়ানো হয়। যথা দাভিদের ছবি ফোটোগ্রাফে দেখলে, অর্থাৎ রঙ বাদ দিলে, খুব ক্ষতি হয় না। অনেক ভারতীয় মিনিয়েচর সম্বন্ধে একই কথা প্রযোজ্য। কথাটি কিন্তু সে সব চিত্রের চিত্রগুণের মোটেই স্তুতিবাদ নয়। অপরপক্ষে ইয়াজদানি-কৃত অজন্তার চিত্রাবলীতে স্পষ্টই বোঝা যায় সাদাকালোর ছাপা ফোটোগ্রাফগুলি ইউনেসকোর রঙীন চিত্রের অ্যালবামের পাশে কত ফ্যাকফ্যাক করে, নিতান্ত কঙ্কালের রাশি বলে মনে হয়। রঙের বিশিষ্ট ক্রিয়া সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে রঙকে শুধু অলংকার মনে করলে চিত্রকলা সম্বন্ধে গোড়ায় গলদ করা হয়, চিত্রকলার ন্যায্য ও বৈধ উপাদানকে অস্বীকার করা হয়। তাতে ছবি হয় ভাস্কর্যেব নিকৃষ্ট রকমফের, নয় নিছক বর্ণনা, হয়।

কোন পেণ্টিং-এর ফোটোগ্রাফ তোলা আদৌ যে সম্ভব হয় তার কারণ বিভিন্ন রঙের বিভিন্ন আলোকমূল্য আছে, অর্থাৎ কেউ আলো বেশী শোষে, কেউ কম শোষে, যার ফলে ফোটোগ্রাফটি বিভিন্ন পর্দার ধূসর রঙে সজ্জিত হয়। কিন্তু যে কোন পেণ্টিং-এ আলো এবং ছায়ারও খেলা আছে। আলোর উদ্ভাসের নানা ধাপ আছে। কিয়ারসক্যুরো বা ছায়াতপের মত সেগুলিও সরাসরি ছবিতে চিত্রিত হয়। ফোটোগ্রাফে এগুলিও নানা পর্দার ধূসর হয়, ফলে দুটি বিভিন্ন রাজ্য, অর্থাৎ ছবির রঙ এবং ছবির আলো এ ওর উপর পড়ে পরস্পরকে অস্পষ্ট করে। যেমন ফোটোগ্রাফে

হাল্কা ধূসর রঙে হলদে বা লালও বোঝাতে পারে অথবা আলোয় উজ্জ্বল নীল বা সবুজও বোঝাতে পারে। সোজা কথায় বলতে গেলে দুটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন সম্পর্কাশ্রয়ী জগৎ একত্রে মিশে যায়, ফলে প্রত্যেকের বিশিষ্ট স্বতন্ত্র গুণটি নষ্ট হয়। অর্থাৎ ছবির ফর্মের কিছু অংশ লুপ্ত হয়, কারণ রঙ হচ্ছে ছবির ফর্মের অবিচ্ছেদ্য অংশ, সে ত শুধু উপরের প্রলেপমাত্র নয়। রঙ চলে গেলে ফর্মের কত যে হানি হয় তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ দ্যমিয়ের চিত্রের হাফটোনে ছাপা ছবি। উপস্থিত বক্তব্যের পক্ষে দ্যমিয়ের চিত্র সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ, তার কারণ দ্যমিয়ের আসল ছবিতে রঙ খুবই কম। দ্যমিয়ে সবসময়ে গম্ভীর কালচে রঙে আঁকতেন, তাতে আলোছায়ার খেলা অবশ্য থাকত ; তা সত্ত্বেও তাঁর রঙের টোনের উপর আলোর খেলাই ছিল খুব উল্লেখযোগ্য কীর্তি। এই ধরনের ড্রয়িংএ আসে গম্ভীর, ঘন ওজনবিশিষ্ট বস্তুর আভাস ; স্থাণুত্ব, এবং কর্মতৎপর গতি দুইই আসে ; এবং এই গুণগুলিই দ্যমিয়ের শক্তির আসল উৎস (চিত্র ?)। ফোটোগ্রাফে যখন একদিকে তাঁর আলোর বৈষম্যমূলক গুণমালা অন্যদিকে রঙের বৈষম্যমূলক গুণমালা, সবই ধূসরে পর্যবসিত হয়, তখন তার ছবির ফর্মের অত ওজন, গম্ভীর ঘনত্ব, ম্যাস কেমন যেন গলে যায়, বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। তিশান, রুবেন্স, দেলাক্রোয়া রেণোয়ার, সেজান, মাতিসের মত শিল্পী, যাদের প্রধান উৎকর্ষই হচ্ছে রঙের নব নব বিচিত্র উন্মেষ, তাঁদের ছবি হাফটোনে ছাপলে তাঁদের ফর্মের সমূহ ও অত্যধিক হানি হয়। সেই জন্যে স্কুল-কলেজে জগদ্‌বিখ্যাত চিত্ররাজির একরঙা এমন কি রঙীন ফোটোগ্রাফ দেখালেও আসল ছবির প্রায় কিছুই দেখানো হয় না।

রেণোয়ারের (চিত্র ১৯) চিত্রে ড্রয়িং মুখ্যত সম্পন্ন হত রঙের ব্যবহারে। অ্যাঙ্গর যেমন স্পষ্ট কাটা কাটা রেখা দিয়ে ড্রয়িং করতেন, মধ্যেকার জমিতে রঙ সমানভাবে লেপে দিতেন, রেণোয়ার তা করতেন না, তিনি আস্তে আস্তে বর্ণের ক্রমিক পর্যায়ে এক রঙ থেকে আরেক রঙে যেতেন, রঙের প্রতিটি বিভঙ্গে আসত বিচিত্র আলোক। এই ধরনের ফর্মের প্রকাশে বিশেষ বিশেষ বর্ণমূল্যগুলি হত সবচেয়ে দামী, কারণ সেগুলি বাদ দিলে ছবির ফর্মে বিশেষ কিছু অবশিষ্ট থাকে না, নিতান্ত তরল এবং ভঙ্গুর হয়ে যায়। সে জানে রঙের ক্রিয়া যদিও ভিন্ন তবুও তার মূল্য কিছুমাত্র কম নয়। তিনি ভল্যুম অর্থাৎ ভারী ঘন ওজনবিশিষ্ট বস্তু আঁকতেন, নানা পর্দার আলোর সাহায্যে নয়, চাপ চাপ রঙ আর মোটামোটা ভারী কড়া রেখার সাহায্যে ; এবং যেহেতু অনেক ক্ষেত্রে

বিভিন্ন রঙের আলোকমূল্যের ইতরবিশেষ থাকে না, সে হেতু সেজানের কোন ছবির ফোটোগ্রাফ আসল রঙীন ছবির বিশাল, ঘন, ভারী বিপুল আকারগুলির কোন ইঙ্গিতই যেন দেয় না। মাতিসে রঙই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উপাদান, কারণ রঙ নিয়ে এত বিচিত্র অসাধারণ মিশ্রণ খুব কম শিল্পীই করেছেন। তাঁর ফর্মে রঙের বৈষম্যমূলক ব্যবহার খুবই উল্লেখযোগ্য ; তিনি সীমারেখাকে যেভাবে বিকৃত বা ডিস্‌টর্ট করেন, তা তাঁর ছবির চরিত্রই বলা যায়। এই ধরনের ডিসটর্শন তিনি করতে বাধ্য হন সবচেয়ে সার্থক বর্ণবৈষম্য ও বর্ণসাযুজ্য বা রঙের হার্মনি সাধনের খাতিরে। ফলে মাতিসের অধিকাংশ সার্থক ছবি হাফটোন ফোটোগ্রাফ করে ছাপলে, অর্থাৎ রঙ না থাকলে, অবান্তর লাগে, ছবির ডিসটর্শন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অর্থহীন মনে হয়, যেন তাতে ফর্ম নেই (চিত্র ৪২)।

আগেই বলেছি ফর্ম ও বস্তু হচ্ছে একই রিয়ালিটির দুটি দিক। তারা দুটি বিভিন্ন রিয়ালিটি নয়। সুতরাং শিল্পী যখন কোন একটি বিশেষ ফর্ম নিয়েই ব্যাপৃত থাকেন, তাকেই সর্বস্ব করেন, তখন সে ফর্মটি একটি বাঁধা গৎ হয়ে দাঁড়ায়, এমনকি মুদ্রাদোষে পর্যবসিত হয়, তার কারণ যে-কোন মহৎ শিল্পীর ফর্মে থাকে তার নিজের বিশ্ববীক্ষা এবং মেজাজ ; এবং এ দুটি সামগ্রীর পুনরাবৃত্তি সম্ভব নয়। এ বিষয়ে উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় ফ্লোরেনটাইন শিল্পীদের, বিশেষ করে লেঅনার্দোর। তাঁরা চিত্রে ভাস্কর্যসুলভ ফর্ম নিয়ে বড় বেশী ব্যাপৃত থাকতেন, ছবিতে ভারী, ঘন, ওজনবিশিষ্ট দেহের প্রতীতি আনার চেষ্টা করতেন। লেঅনার্দোর ছবির সাধারণ ডিজাইনে প্রাধান্য পেত পরিণত, পূর্ণদেহ ফিগর, যা রক্তমাংসে সম্পূর্ণ এবং পুরো ওজন নিয়ে ছবিতে বিরাজ করে (চিত্র ২১)। তার ফলে তাঁর ছবিতে প্রকাশ পেত এক ধরনের সহজগ্রাহ্য 'ফর্ম', যা নাকি অনেক সমালোচকদের মতে, রসোত্তীর্ণ ফর্মের পরাকাষ্ঠা, কিন্তু যা খুব সহজেই নিতান্ত গতানুগতিক হতে পারে। লেঅনার্দোর ছবিতে অত বিশাল, ঘন ওজনের প্রতি যে মাত্রাধিক পক্ষপাত দেখা যায় তা সত্যকারের চিত্ররসমূল্য ব্যাহত করে ; তার কৃপায় অখণ্ড ঐক্য এবং বৈচিত্র্যের বদলে একঘেয়েপণা আসে। গৌণ ফ্লোরেণ্টাইন শিল্পীদের কাজে, যেমন লুইনীর কাজে তথাকথিত লেঅনার্দোর ফর্ম হয়ে দাঁড়ায় নিতান্ত কালোয়াতি বা ওস্তাদির প্যাঁচ, কসরৎমাত্র। তখন অ্যাকাডেমিক কৌশল বা কর্তাভজা ফাঁকি আসতে বিলম্ব হয় না। ঠিক যেমন সেজানের পরবর্তীকালের ছবিতে তাঁর মত করে ডিসটর্শন আনার ব্যাপারে অনেক শিল্পী রাতারাতি

সিদ্ধহস্ত হয়ে গেলেন।

যে কোন ধরনের ফর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করলে যে তা নিতান্ত যন্ত্রবৎ হয়ে যায়, তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায় রেমব্রাণ্টে এবং তাঁর অনুকারকদের মধ্যে। রেমব্রাণ্টে ছায়াতপ বা কিয়ারসক্যুরোই হয় ডিজাইন এবং মডলিং-এর উপাদান। তিনি ছায়াতপকে অসাধারণ নৈপুণ্যে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু তাঁর মত বিরাট শ্রেষ্ঠ শিল্পীও সময়ে সময়ে লোভ সংবরণ করতে পারেননি, যা নিতান্ত উপায় তাকেই তিনি করে ফেলতেন লক্ষ্য, ফলে যা হওয়া উচিত তাই হত অর্থাৎ পরিণাম হত নিতান্তই ভয়াবহ। "স্ত্রীলোক নখ কাটছে" বা "ক্রস থেকে অবতরণ" নামে তাঁর বিখ্যাত ছবিতে তিনি আলো নিয়ে এত বেশী কসরৎ করেন যে তার ফল হয় অতিরঞ্জন অর্থাৎ নাটুকে। ছবিটিতে আতসবাজী প্রচুর, প্রতিভার চেয়ে কৌশলই বেশী। ফর্ম অবশ্যই আছে কিন্তু সে ফর্ম কারিকরেও করতে পারে, এবং ঠিক এই ধরনের ফর্মই রেমব্রাণ্টের অজস্র প্রতিভাহীন অনুকারকরা হাতে চাঁদ পাবার মত করে লুফে নিয়ে নিজেদের ছবিতে আনেন।

চিত্রে রসগুণ

প্রতি শিল্পেরই নিজস্ব ক্ষেত্র এবং যন্ত্রপাতি, মাধ্যম আছে, যে মাধ্যমে কাজ করা যায় তার নিজস্ব কতগুলি বিধিনিষেধের সীমা আছে, সেই সীমাগুলি স্বীকার করেই তবে তাতে ফর্ম ও মানবিক মূল্য আসে। বাস্তব জগতের কিছু না কিছু মূল্য প্রত্যেক শিল্পক্ষেত্রেই নষ্ট হয়, কারণ পাথর, রং, ধ্বনি বা শব্দ যে-কোনটি আমাদের সমগ্র অভিজ্ঞতার একটি অঙ্গমাত্র। কিন্তু যে শিল্পী তাঁর শিল্প মাধ্যমের বৈধগণ্ডী ডিঙিয়ে অন্য এক শিল্পের গুণও তাঁর কাজে আমদানি করতে চান তিনি তাঁর শিল্পের নিয়মলঙ্ঘন করেন, তাতে তাঁর কাজে শিল্পরস ব্যাহত হয়। যেমন চিত্রশিল্পীকে চিত্রের ন্যায্য উপাদানের সাহায্যেই নিজের সৃষ্টিতে মানবিক মূল্য আনতে হবে; রেখা, রঙ, ছবির জমির সুচারু ভাগ ও পরস্পরের সম্বন্ধ নির্ণয়েই কোন বস্তু, ঘটনা বা পরিবেশকে ফুটিয়ে তুলতে হবে। সাহিত্য বা সঙ্গীত কিয়ৎকাল স্থায়ী হয়, ফলে তাতে ঘটনা পরম্পরার ক্রমিক উন্মোচন বৈধ এবং ন্যায়সঙ্গত। কিন্তু চিত্রে সবই একসঙ্গে উপস্থিত, তাতে ভূত ভবিষ্যৎ

নেই ; সবই বর্তমান ; ফলে চিত্রে আখ্যানের স্থান নেই ; আখ্যান সম্ভূত নীতির আবেদন সেখানে অবান্তর। কোন্‌খানে চিত্র তার গণ্ডী পেরিয়ে অনধিকার চর্চায় প্রবৃত্ত হয় বলা বড় শক্ত ; শেষপর্যন্ত শুধু ঠারেঠোরে, উদাহরণ দিয়েই এসব কথার ইঙ্গিত করা যায়। যেমন বলা যায় জত্তো বা তিশানে সাহিত্যিক আখ্যান বা নীতিকথার নামগন্ধ নেই, অথচ দেলাক্রোয়া বা মীলে'তে আছে।

তেমনি ঠিক কোনখানে শিল্পী নিপুণ দক্ষ কর্মীর সংজ্ঞা পিছনে ফেলে মহাশিল্পীর অতন্দ্রলোকে চলে যান বলা বড় শক্ত, প্রায় অসম্ভব। এখানেও উদাহরণই একমাত্র সম্বল। যেমন, নিপুণ কৌশলী দক্ষ শিল্পী হিসেবে মানে'র তুলনা নেই, তিনি সেরার সেরা ওস্তাদ ; কিন্তু কোনক্রমেই তিনি জত্তো বা জর্জনের সমকক্ষ নন। একথা আরও স্পষ্ট হয় আলোচনাকে আর একটু নীচু পর্দায় নামিয়ে আনলে : যদি মানে'র কাজের সঙ্গে তাঁর চেয়ে অনেক নিকৃষ্ট শিল্পী মাইজনিয়ে'র তুলনা করি। মাইজনিয়ে ছিলেন অতি সুনিপুণ কৌশলী কারিকর, কিন্তু শিল্পী ছিলেন না। কোন দৃশ্যের খুব যথাযথ, হুবহু প্রতিচ্ছবি মাইজনিয়ে দিতে পারতেন ; কিন্তু তাঁর কাজে ব্যক্তিগত আবেগ বা দৃষ্টি একেবারে নেই, তাঁর ছবি চিত্র হিসেবে যেমন বিশ্রস্ত তেমনি দুর্বল। তাঁর ছবি দেখে মনে হয় না ছবির নিজস্ব জগৎ সম্বন্ধে তাঁর কিছুমাত্র বোধ আছে। অন্যপক্ষে মানে' আরম্ভই করেন এই বোধ নিয়ে, তিনি ছবিতে শুধু সেই বিষয়ই ঢোকাতেন যা রঙ ও রেখার নিজস্ব জগতের অন্তর্গত। এবং এই বোধ এই স্বীকার থাকলেই তবে ছবি রসোত্তীর্ণ চিত্রজগতে প্রবেশের অধিকার পায় ; তারপরে আসে উত্তম মধ্যম বিচারের প্রশ্ন। অর্থাৎ একমাত্র এই প্রবেশিকা পরীক্ষা উত্তীর্ণ হলেই তবে চিত্রে রসগুণের বিচার আসে।

এই রসগুণটি যে কি তা অ্যারিস্টটল থেকে ক্রোচে পর্যন্ত সকলেই স্পষ্টভাবে বলার অনেক চেষ্টা করে গেছেন, পারেননি। কেন একটি সৃষ্টি একেবারে প্রথম শ্রেণীর, কেন দ্বিতীয় শ্রেণীর, সম্পূর্ণভাবে ব্যক্ত করা প্রায় অসম্ভব। আমরা শুধু বড়জোর কোনটি প্রথম শ্রেণীর, কোনটি দ্বিতীয় শ্রেণীর এইটুকু চিনতে পারার অধিকারই আয়ত্ত করতে পারি। কিন্তু জত্তো, জর্জনে, তিশান, রেণোয়ার বা সেজান ঠিক কি গুণের অধিকারে মহত্তম শ্রেষ্ঠতম শিল্পী, ঠিক কি গুণে আট থেকে বার শতকের অনেক চীনে ছবি চিত্রত্বের পরাকাষ্ঠায় পৌঁছয়, সে গুণ বিশ্লেষণ করে, যথাযথভাবে ব্যক্ত করার ক্ষমতা আজও কোনও লেখকের হয়নি। শুধু এইটুকু বলা যায় যে

রসগুণ অনুভব করা যায়, ব্যক্ত করা যায় না। এ কথাটি সাহিত্যের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। নিখুঁত শব্দচয়ন, ব্যাকরণজ্ঞান সত্ত্বেও যদি লেখক তাঁর রচনাকে সংহত, সারগর্ভ করতে না পারেন, যদি সামান্য শব্দে একটি পুরো জগতের আভাস দিতে অপারগ হন, যদি তাঁর বাক্যে অভিধান বহির্ভূত বহু অর্থ এবং অনুভূতির ইঙ্গিত দিতে না পারেন, যদি তিনি উপমা, উৎপ্রেক্ষা ও ধ্বনির অন্তঃস্থিত জগৎকে উন্মোচন না করেন, এক কথায় শব্দের পূর্ণশক্তি যদি তিনি প্রকাশ না করেন, তবে তিনি কথাশিল্পী ন'ন। সেইরকম সুনিপুণ আখ্যান চিত্রকর যখন রঙের পূর্ণশক্তি উন্মোচন করতে অপারগ হন, তখন তিনি নিতান্ত রঙীন-ছবি-তোলা ক্যামেরায় পর্যবসিত হন।

দ্বিতীয় ভাগ : চিত্রবিচার

ছবির রসদ বা কাঁচা মাল

আমরা যখন বিশ্বজগৎ দেখি, তখন ধারণা হয়, চোখ সত্যি যেটুকু দেখে তার চেয়ে বেশী আমাদের দেখায়। ব্যাপারটা একটু তলিয়ে ভাবলে বুঝতে দেরি হয় না যে আমাদের চোখের ইন্দ্রিয় শুধু একটা সমতল ফ্ল্যাট জমি ছাড়া আর কিছু দেখে না, যে জমিটি নানা রঙ-এর তালি দিয়ে নকশীকাঁথা করা। কিন্তু এই তালিগুলির প্রত্যেকটি আসলে ওজন ও দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-ঘনত্বওলা বস্তু। সেগুলি আমাদের চোখ থেকে কাছে, দূরে নানাভাবে ছড়িয়ে আছে। কিন্তু চোখ আমাদের এইসব তথ্যের সন্ধান দেয় না। কোন জিনিস ছুঁয়ে হাত বুলিয়ে বুঝতে পারি সেটি কতখানি ঘন তার ওজন কত। কি ধরনের, কতখানি গতিতে গেলে আমরা কোন বিশেষ স্থান বা স্পেসের মধ্যে দিয়ে যেতে পারি সেই অভিজ্ঞতা থেকে আসে আমাদের স্পেস বা দূরে কাছে সম্বন্ধে জ্ঞান। যা দেখি সেই জিনিস ধরে, স্পর্শ করে, শুনে, জিভ দিয়ে চেখে, দেখে, আস্তে আস্তে আমরা সেই সব জিনিস সম্বন্ধে শিখি। এইভাবে আমাদের ধারণা হয় কোন জিনিস কি রকম দেখতে হলে কতখানি মসৃণ বা খসখসে হবে, শক্ত বা নরম হবে, ইত্যাদি। চারদিকে চলে ফিরে বেড়িয়ে জানতে পারি যে জিনিস কাছে থাকলে বড় দেখায়, দূরে থাকলে ছোট দেখায়, যত দূরে যায় তার আকারটি তত অস্পষ্ট হয়, রঙও একটু মিইয়ে যায়। আলো কম বেশীর ফলে বস্তুর আকার বদলে যায়, এমন কি কোণ করে বা তেরছা ভাবে আলো পড়লেও বস্তুর আকার বদলায়। এই ধরনের নানা অভিজ্ঞতা একের পর এক সঞ্চিত হয়ে, আমাদের চোখের অনুভূতিগুলির অর্থ জমে ওঠে ; তার ফলে আমরা বলি আমরা দূরত্ব দেখছি, কোন জিনিসের স্পর্শ স্পর্শগুণ কিরকম তা দেখছি, আলো-ছায়া দেখছি। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু এগুলি সমস্তই আমাদের চোখের উপর আরোপ করা। আমরা যেটুকু সত্য সত্য দেখি তা হচ্ছে আমার চোখের দৃষ্টিরেখার সুমুখে আড়াআড়িভাবে রাখা একটি সমতল ; যে সমতলের উপর নানারঙ ঢালা রয়েছে বাকী আর সবই অনুমান। শৈশব কাটিয়ে আমরা যে বয়সে ভাবতে শিখি তার মধ্যে আমরা ধাপে ধাপে কিভাবে দেখতে শিখলুম তা প্রায় একেবারে বেমালুম ভুলে

যাই। তখন অনুমান বা বস্তুর প্রতীয়মান লক্ষণগুলি একেবারে অভ্যস্ত হয়ে যায়। মনের গভীর অচেতনে তারা কাজ করে। ফলে এক অসম্ভব অবস্থা হয়। একদিকে আমরা চোখের সম্মুখে যে সব চিহ্ন দেখছি অন্যদিকে তাদের মধ্যে যে সব অর্থ আমরা অভ্যাসের বশে বরাবর ধরে নিই, সে দুটিকে তখন আর আলাদা করার ক্ষমতা থাকে না। আলাদা করতে হলে আবার ফিরে ফিরতি নতুন করে বিশেষ শিক্ষার দরকার হয়।

এই ধরনের বিশেষ শিক্ষা বা অনুশীলন চিত্র শিল্পীর পক্ষে একান্ত দরকার। কারণ তিনি যে মাধ্যমে কাজ করেন তা দর্শককে শুধু চোখের মধ্যে দিয়ে টানে। সত্য বলতে চিত্রও শুধু একটুকরো সমতল জমি মাত্র, যার উপরে রঙ ছড়ানো থাকে। ছোট ছোট জায়গা আর রঙের টুকরো টুকরো আয়তনের সাহায্যে স্পেসের মধ্যে দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-গভীরত্বওলা জিনিসের অস্তিত্ব দেখাতে হলে, চিত্রশিল্পীর প্রথম কর্তব্য হচ্ছে আমরা যা সবাই ভুলে গেছি তাই আবার ফিরে ফিরতি শেখা, ধাপে ধাপে ফিরে গিয়ে যাকে বলা যায় 'দৃষ্টির নিষ্কলুষতা' তাই ফিরিয়ে আনা, চোখের নির্মল অনাবৃত সরল দৃষ্টির পুনরুদ্ধার করা। একমাত্র এইভাবেই তিনি ছবির ভাষার অ আ ক খ আবার শিখতে পারেন। তারপর আসে সেই অক্ষরগুলি নতুন করে সাজিয়ে কথা সৃষ্টির প্রশ্ন, যার সাহায্যে তিনি যা দেখছেন অন্য লোককে তাই দেখাবেন। রঙের সাহায্যে ফুটে ওঠে ড্রয়িং বা নকশা, মডলিং, পারস্পেকটিভ বা পরিপ্রেক্ষিত।

চিত্রশিল্পের রীতিপদ্ধতি বা টেকনিক সম্বন্ধে অনেক বই আছে, যাতে স্পষ্ট ধরে নেয়া হয় যে, শিল্পীর শিক্ষা তখনই সম্পূর্ণ হয়, যখন তিনি চোখের সমুখে যে জগৎ দেখছেন, তার রঙ, আকার, গুণাগুণ তুল্যমূল্যভাবে একটুকরো চটে বা কাগজে ফোটাতে সমর্থ হন। এর চেয়ে বড় ভুল আর হতে পারে না। সে শিক্ষা কারিগরের শিক্ষা। শিল্পীর শিক্ষা আর কারিগরের শিক্ষা এক মনে করাও যা আর আসল নকল অভিন্ন মনে করাও তা। চোখে যেমনটি দেখছি তুলির রঙে সেটুকু ফুটিয়ে তুলতে পারার ক্ষমতা আয়ত্ত হলে এইটুকুমাত্র বলা যায় যে চিত্রের রসদ উপকরণ মাত্র সবে আয়ত্তে এসেছে, তাতে বড জোর বলা যায় যে শিল্পী ক্যামেরার স্থান নিয়েছেন। তার বেশী কিছু নয়। ঠিক যেমন কোন ভাষার ব্যাকরণ বা অভিধান জানা থাকলে বড় জোর বাক্য রচনা করা যায়, কিন্তু সে বাক্য যে আবার মন দিয়ে শোনার যোগ্য হবে এমন কোন কথা নেই। এমন অনেক চিত্রকলার ইতিহাস আছে যার মূল বক্তব্য হচ্ছে যে চোখের

চেনা-জানা জগৎকে আয়নার মত দেয়ালে বা কাগজে বা চটে প্রতিফলিত করার অসার্থক চেষ্টাতেই চিত্রকলার উদ্ভব হয়। তাদের মতে ছবির ইতিহাসে দৃশ্যমান জগতের প্রতিচ্ছবি ক্রমশ যতই নিপুণভাবে, সম্পূর্ণভাবে, ফুটতে লাগল ততই চিত্রকলার প্রগতি হল। এটা খুবই ভুল কথা, কারণ ইতিহাসের আগের যুগের যেসব গুহাচিত্র ও ভাস্কর্য দেখা যায় বা এখনও আদিম জাতিদের যেসব শিল্প নিদর্শন দেখা যায় তাতে প্রকৃতিকে হুবহু নকল করার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। শিল্পকলার মূল কথাই হচ্ছে অনেক অসংলগ্ন গৌণ উপকরণ ফেলে দিয়ে মূল জিনিসটি বাছাই করতে পারা, তার ডিজাইনটি সুস্পষ্ট করা, যা কিছু মুখ্য এবং উল্লেখযোগ্য তাকে ফুটিয়ে তোলা। এ বিষয়ে কথা বাড়ানোর দরকার নেই। অনেক সময়ে চিত্রে প্রসাদ গুণ আনার তাগিদে ঘনত্ব, ওজন, গভীর সুদূর স্পেস, জমির খোলের বুননের বাহাদুরি বা এই ধরনের নৈপুণ্য নিতান্ত অদরকারী, অবান্তর, এমনকি বিরক্তিকরও হতে পারে। কারিগর তখনই শিল্পী হন যখন তিনি ছবির নানাবিধ উপকরণ বা রসদকে প্ল্যাস্টিক রূপসৃষ্টির কাজে লাগান। সেই জন্যে চিত্রশিল্প ভাস্কর্য প্রভৃতির রসাস্বাদ করতে গেলে সর্বপ্রথমে প্ল্যাস্টিক ফর্ম কি সে সম্বন্ধে ধারণা হওয়া দরকার।

রূপভেদ ও প্রমাণ বা প্ল্যাসটিক ফর্ম

চিত্রকলার আলোচনায় ইংরেজি কথা বাংলায় ব্যবহার করা কিছু খারাপ নয়। যদিও সংস্কৃত রসশাস্ত্রে এমন কথা নেই যা দিয়ে যে কোন ভাব বা বিষয় ব্যক্ত করা যায় না তবুও সে সব কথা আমাদের কানে এখন ইংরেজি কথার চেয়েও বেশী অচেনা ঠেকে। তাছাড়া আনুপূর্বিক চর্চার অভাবে সে সব কথার নানা লোকে নানা মানে করেন। অবশ্য ইংরেজি শব্দ সম্বন্ধেও একই কথা খাটে। তবুও এখন যদি প্ল্যাস্টিক ফর্ম কথাটা ছেড়ে ষড়ঙ্গের 'রূপভেদ প্রমাণ' বলি তাহলে কেমন যেন একটু খটমটে শোনাবে। সেইজন্য অনেক সময়েই ইংরেজি কথা ব্যবহার করব; তার সঙ্গে তুল্যমূল্য বাংলা শব্দ জুড়ে কানে সইয়ে নেব।

প্রথমেই মনে রাখা দরকার যে যে-কোন ছবি হচ্ছে একটি নতুন রসসৃষ্টি। দৃশ্যমান জগতে শিল্পী যা কিছু দেখে মুগ্ধ হন, বিচলিত হন, মূল্যবান মনে করেন, তাঁর ছবিতে তিনি সেগুলি প্রকাশ করতে চান। শিল্পীর যে-হেতু একটি সংহত ব্যক্তিত্ব আছে সে-হেতু তাঁর কাজেও ফুটে উঠবে শৃঙ্খলা, রূপ, আকার। আর যে-হেতু তাঁর ছবি তাঁর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় বয়ে বেড়ায়, যে অন্তর্দৃষ্টির কৃপায় তিনি যে-কোন বস্তুর মর্মে প্রবেশ করে সেটি উদঘাটন করেন, সে-হেতু তাঁর ছবি তাঁর বক্তব্যের তাগিদে দৃশ্যমান জগৎকে ঢেলে সাজায়, এবং বাস্তব জগৎকে এইভাবে ঢেলে সাজানোকে ষড়ঙ্গে বলে রূপভেদ প্রমাণ, ইংরেজিতে প্ল্যাস্টিক। অভিধানে প্ল্যাস্টিক মানে, এমন কিছু জিনিস যা বাঁকানো চোরানো যায়, যাকে ময়দার নেচির মত যে কোন রূপ বা আকার দেয়া যায় অর্থাৎ গোড়ায় তার যে আকার বা রূপ ছিল তা বদলে দেয়া যায়। একটু ভেবে দেখলে মানতে বাধবে না যে শিল্পীর চোখে যা কিছু জাগতিক আকার ভাসে তা সবই প্ল্যাস্টিক; তার মধ্যে যে কোনটা তিনি ইচ্ছেমত জোর দিয়ে দেখাতে, বিকৃত করতে, বাঁকাতে চোরাতে অথবা নিজের দৃষ্টির তাগিদ ও ডিজাইনের খাতিরে, তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ বদলিয়ে নতুন করে সাজাতে পারেন। যে সব যন্ত্রপাতির সাহায্যে তিনি এইভাবে অদলবদল করে নতুন করে সাজান সেগুলি হচ্ছে রঙ, রেখা, আলো, জমি বা স্পেস। যদিও চোখের

দেখা জগতের সঙ্গে ছবির মুখ্যত সম্বন্ধ তবুও তার মধ্যে এমন কতগুলি রসাত্মক মূল্য যাকে যা রূপভেদ প্রমাণের প্রয়োগ বা প্ল্যাস্টিক ফর্মের নিয়োগ ছাড়া সম্ভব নয়। সেই হিসেবে প্ল্যাস্টিক ফর্ম দৃশ্য ও অদৃশ্য দুই ধরনের গুণের উপরে নির্ভর করে। ফলে ছবিতে যেটুকু দেখা যাবে তার মধ্যে নিহিত থাকবে বস্তুর সত্তা, তার প্রাণ, তার যাবতীয় গুণের নির্যাস, যা শুদ্ধমাত্র রূপভেদ বা প্রমাণের উপযুক্ত প্রয়োগেই সম্ভব। এই গুণটুকু যদি ছবিতে থাকে তবেই শিল্পীর শ্রম সার্থক এবং তারই মধ্যে শিল্পীর নিজস্ব ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠে।

রূপভেদ—প্রমাণের কাজে প্ল্যাস্টিক উপকরণ হিসেবে রঙের কথাই সবচেয়ে আগে বলতে হয়। যে বস্তু দেখি তার রঙ বোঝাতে গেলে সেই রঙটি ছবিতে দিতে হয়, সেইটুকু হয় সেই রঙের কাজ। এ ছাড়াও রঙের নিজস্ব একটি রসাত্মক মূল্য, ইংরেজিতে যাকে বলে ইসথেটিক ভ্যাল্যু আছে। অবশ্য শিল্পবিচারে রঙের ইসথেটিক মূল্য তাৎপর্য নিয়েই হয় যত মতবিরোধ। এই মূল্য বা তাৎপর্য ঠিকমত বিচার করা খুবই শক্ত। যিনি সবে ছবি দেখতে আরম্ভ করেছেন এই ব্যাপারে তাঁর নানারকম প্রমাদ ঘটা সম্ভব। যেমন রঙের নানাস্তরের ঔজ্জ্বল্য যে ভাবে চোখকে আনন্দ দেয় কিংবা বিশেষ বিশেষ রঙের প্রতি কারোর ব্যক্তিগত পক্ষপাত থাকে, কোন নিতান্ত চেনাবস্তুর বিশিষ্ট রঙের সঙ্গে নিজের মনের অগোচরে যেভাবে অনেক স্মৃতি জমে ওঠে, তার কোনটির সঙ্গেই প্রকৃত চিত্ররসের সম্বন্ধ নেই। কিন্তু রঙের নিজস্ব মূল্য কি, নক্শা বা ড্রয়িং এবং চিত্ররচনা বা কম্পোজিশনের সঙ্গে তার কি সম্বন্ধ, সে বিষয়ে পরে আলোচনা করব।

ছবির আরেকটি মৌলিক প্ল্যাস্টিক অঙ্গ হচ্ছে ড্রয়িং বা নকশা। রঙের বিচার নিয়ে যেসব সমস্যা ওঠে ড্রয়িং বা নকশা নিয়েও একই ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। যিনি সবে ছবি দেখতে শুরু করেছেন অর্থাৎ যাঁর চোখ ও মন ঠিকমত তৈরি হয়নি তিনি সাধারণত এমন ড্রয়িং খোঁজেন যা ফোটোগ্রাফেই সম্ভব। অর্থাৎ বাস্তব জগতে সত্যিকারের জিনিসের গায়ের রঙীন জমিগুলি পরস্পরের সংস্পর্শে এসে যেভাবে রেখা আর কন্টুর বা শারীর সীমারেখা তৈরি করে তিনি তার হুবহু নকল প্রত্যাশা করেন। তিনি ভুলে যান যে বাস্তব জিনিসের রেখা ও কন্টুর নকল করা শিল্পীর কাজ নয়। শিল্পীর কাজ এমনভাবে বস্তুর গায়ের জমি বা সারফেস বাছাই করা, তার সারমর্ম গূঢ়সত্তা টেনে বার করা, তার বিশিষ্ট গুণগুলি জোর দিয়ে ফুটিয়ে তোলা যার ফলে নতুন একটি জিনিসের সৃষ্টি হয়। বাস্তব

জিনিসকে একেবারে নিজের মত করে ঢেলে সাজানোর ফলেই সে ধরনের সৃষ্টি সম্ভব হয়। এইভাবে যে সাফল্য আসে তাতে রসের বিচার সম্ভব হয়। বাস্তব জিনিসের সঙ্গে ছবির কতখানি মিল রইল সে আলোচনা তখন অবান্তর হয়।

ছবির সমান, ফ্ল্যাট জমিতে রঙ আর রেখা দিয়ে বস্তুকে প্রকাশ করা হয়। যদি ছবির জমির দৈর্ঘ্য-প্রস্থের মধ্যে বস্তুগুলির পরস্পরের সম্বন্ধের আয়তনগত গভীরত্ব ফুটিয়ে তোলার কোন চেষ্টা না হত, তাহলে সে ছবিতে রঙ আর রেখাই হত একমাত্র প্ল্যাস্টিক উপাদান। কিন্তু এই ধরনের চিত্রে রসাত্মক মূল্য আসে না যতক্ষণ না সেই সব আঁকা বা রঙকরা বস্তুগুলিকে একটি বিশেষ ধরনে সাজানো যায়, যার ফলে তাদের পরস্পরের মধ্যে এক বিশেষ সম্বন্ধের সৃষ্টি হয়। এই ধরনের সাজানোকে বলে চিত্র রচনা বা কম্পোজিশন। এইভাবে দেখলে কার্পেটের নকশায়, আসনে, খুঞ্চিপোশে বা কাঁথায়ও কম্পোজিশন নিশ্চয়ই থাকবে ; যে কোন নকশায় বা প্যাটার্নে, রেখা আর বস্তুর আকৃতি বা ম্যাসের মধ্যে যদি এমন বিশেষ এক সম্বন্ধ থাকে, যার সাজন, রচনা, শৃঙ্খলা ও প্রতিসাম্যের ফলে আমরা তৃপ্তি পাই তাহলে বুঝতে হবে সেই রচনা রসোত্তীর্ণ হয়েছে। কিন্তু নকশা বা প্যাটার্নে রসের অবতারণা হয় মাত্র, তাতে বড় জোর এইটুকুই প্রমাণ হয় যে অন্যান্য অনেকভাবে সাজানো সম্ভব হলেও যিনি প্যাটার্নটি করেছেন তিনি সেটিকেই তখনকার মত শ্রেষ্ঠ বলে ভেবেছেন। এ ব্যতীত এরও উঁচুস্তরের রসের কথা তখনও আসে না। অর্থাৎ রঙ আর রেখা রচিত হয়েছে, কম্পোজড্ হয়েছে, তার ফলে এসেছে ডিজাইন। রঙ আর রেখার যোটকে যে স্বয়ংসম্পূর্ণ ইস্থেটিক্ পরিণতি আসে বা রসসৃষ্টি হয় তাকে বলে ডিজাইন। ডিজাইন তখনই সৃষ্টি হয় যখন রঙ, রেখা, কম্পোজিশন নিজেদের ভিন্ন ভিন্ন অস্তিত্ব হারিয়ে পরস্পরকে ওতপ্রোতভাবে প্রভাবিত করে ; তিনে মিলে একটি অনবদ্য জিনিস গড়ে। ফলে যা সৃষ্টি হয় তা একক অখণ্ড। তার মধ্যে যে কোন একটি উপাদানকে একটু অদলবদল করে দিলেই পারস্পরিক সম্বন্ধগুলি আবার নষ্ট হয়ে যায়, জিনিসটির অখণ্ডতা নষ্ট হয়। কোন একটি ডিজাইন তখনই সর্বতোভাবে রসোত্তীর্ণ হয়, যখন যেভাবে রঙ রেখা, কম্পোজিশন রয়েছে তার সামান্য নড়চড় হলেই তার কেটে যায়, সমগ্র জিনিসটি পণ্ড হয়ে যায় ; অর্থাৎ যেমনভাবে সাজানো রয়েছে তার চেয়ে ভালভাবে সেটিকে রচনা করা আর সম্ভব নয়। এইভাবে ছবিতে যে এক অখণ্ড সমগ্রতা বা

এককত্ব আসে সেইটেই হচ্ছে আদর্শ বা ছবির বিচারের কষ্টিপাথর। ছবির ডিজাইন বলতে যেমন ছবির সাধারণ কোঠামোটি বোঝায় তেমনি বোঝায় সে-কাঠামোর মধ্যে ছবির খুঁটিনাটির সংস্থান। প্লাস্টিক ফর্মের দিক দিয়ে কোনটা অপরিহার্য আর কোনটা অপ্রাসঙ্গিক সে বিচারের সময়ে এই কথাগুলিই সর্বাগ্রে মনে রাখতে হবে। তুলনা দিয়ে বলতে গেলে বলতে হয় প্লাস্টিক শিল্পে ডিজাইনের যে স্থান, কোন দার্শনিক প্রবন্ধে তার প্রতিপাদ্য বিষয়ের সেই স্থান, ঠিক যেমন উপন্যাসের মূল কথাই হল তার আখ্যান বা প্লট ; সঙ্গীতে মূল রাগ বা রাগিণীটি ; কিংবা রসালো গল্পে তার রসিকতাটুকু। অর্থাৎ যার উপরে নির্ভর করে বাকি অন্যান্য অঙ্গগুলি মানিয়ে যায়।

চিত্র বা ভাস্কর্য ইত্যাদি যাবতীয় প্লাস্টিক ফর্মনির্ভর শিল্প সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে অনেকে প্যাটার্ন আর ডিজাইন কথা দুটি একটু আলগাভাবে এলোমেলোভাবে ব্যবহার করেন। অনেক সময়ে ডিজাইন বলতে বোঝেন ছবির প্যাটার্ন, প্যাটার্ন বলতে বলেন ডিজাইন। প্যাটার্ন শব্দটি ব্যবহার করতে গিয়ে ঠিক কি বোঝা উচিত তার সংজ্ঞা একটু আগে দিয়েছি। যে কোন ভাল ছবিতে প্যাটার্নটি সুস্পষ্ট থাকে। অর্থাৎ সেটি হচ্ছে ছবির কাঠামো বা কঙ্কাল যার উপরে মানুষের অভিজ্ঞতা, রঙ, এবং অন্যান্য প্লাস্টিক উপকরণ কাজ ক'রে রক্ত মাংস ও প্রাণের সঞ্চার করে। আজকাল অনেক নব্য পণ্ডিত সমালোচক এমন ভাব দেখান যেন প্যাটার্ন বা কঙ্কালই সব, যদিও সেই সঙ্গে তাঁরা প্লাস্টিক ডিজাইন, 'সিগনিফিক্যান্ট ফর্ম' বা মর্মাত্মিক রূপ ইত্যাদি গুরুগম্ভীর কথা ব্যবহার করতেও ছাড়েন না। কিন্তু প্রকৃতিতে যেমন শুধু কঙ্কাল থাকলে ব্যাপারটা ভয়াবহ হত, তেমনি শিল্পেও শুধু কঙ্কাল নিয়ে চলে না।

যে কোন ডিজাইনে দুটি মূল সূত্র থাকবেই, তাতে বিকৃতি বা স্বাভাবিক মাপের বাঁকানো চোরানো থাকুক আর নাই থাকুক। সে সূত্র দুটি হচ্ছে ছন্দ বা ইংরেজিতে রিদ্‌ম ; আর বৈষম্য বা ইংরেজিতে কনট্রাস্ট। প্রথমেই যা আমাদের টানে আর সবচেয়ে বেশী আনন্দ দেয় তা হচ্ছে ছন্দ। যে-কোন ছবিতে কোন একটিমাত্র প্ল্যাস্টিক উপকরণ নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে না, যতক্ষণ না সমতুল্য উপকরণের সাহায্যে, ছবির অন্যান্য অংশে তার পুনরাবৃত্তি, অথবা রকমফের বা প্রতিসাম্য না আসে। এই ধরনের পুনরাবৃত্তি বৈচিত্র্য, এবং প্রতিসাম্যই ছবিতে ছন্দ আনে। প্লাস্টিক অঙ্গগুলির প্রত্যেকটি নিজেদের মধ্যে ছন্দ তৈরি করতে পারে

যেমন—রেখার সঙ্গে রেখা, রঙের সঙ্গে রঙ, খণ্ড বা ঘনজমি বা ম্যাসের সঙ্গে ম্যাস। এইসব ছন্দের প্রত্যেকটি আবার অন্যান্য উপকরণগুলি যে স্ব স্ব ছন্দের সৃষ্টি করে, তাদের সঙ্গে সম্বন্ধ পাতাতে পারে। সবচেয়ে সরল ছন্দের নমুনা পাই সেখানে, যেখানে ছবির একজায়গা যেভাবে একটি রেখাকে বাঁকানো হয়েছে অন্য আরেক জায়গায় আরেকটি রেখাকে ঠিক সেইভাবে বাঁকানো হয়। এধরনের কাজ সরল পুনরাবৃত্তি থেকে শুরু করে, দুই বা ততোধিক রেখার সংযোগ, কাটাকাটি, বা পরস্পরের প্রতিসাম্যেও সাধিত হতে পারে, যার ফলে পুনরাবৃত্তি কমে যায়, যেমন অজন্তার ১নং গুহার দেয়ালচিত্রে। সেইরকম রঙও বার বার একই ধরনে, কিংবা রকমফের করে, অথবা প্রতিসাম্য ঘটিয়ে এমনভাবে ব্যবহার করা হয় যার ফলে আসে জমকালো শক্তিশালী ছন্দ যা হয়ে দাঁড়ায় সমস্ত ছবিটির বিশেষত্ব, যেমন প্রাচীন ওড়িয়া কৃষ্ণবলরামসুভদ্রা পটে অথবা বাঘের হস্তীসিক চিত্রে। রেখা, আলো এবং ম্যাসের ছন্দগুলি এইসব ছন্দকে সুদৃঢ় ক'রে সারা ছবি জুড়ে চিত্রের কম্পোজিশন বা রচনাটিকে সাহায্য করে। সজ্জার এমন পারিপাট্য আসে যার ফলে সর্বোৎকৃষ্ট দরের ডিজাইনের সৃষ্টি হয়। নানা ছন্দ মিলেমিশে আমাদের মনের উপর এমন প্রভাব বিস্তার করে যা শুধু ইওরোপীয় সঙ্গীতে নানাধরনের সুর তান মান লয় মিলনের ফলস্বরূপ সিম্ফনিতেই সম্ভব।

ছন্দের মতই বৈষম্য বা কনট্রাস্টও নানাধরনের হতে পারে। মাতিসের ছবি বা পারসীক মিনিয়েচর সার্থক রঙের বৈষম্যের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। বহু মুঘল মিনিয়েচরে অথবা রেমব্রান্টে কিয়ারসকুরো বা ছায়াতপ সৃষ্টির যে চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত আমরা পাই তার পুরো নাটকীয়প্রসাদ নিংড়ে বার করা হয় আলো অন্ধকারের বিপরীত ধর্ম থেকে। যামিনী রায়ের বেশ কয়েকটি প্রাকৃতিক দৃশ্য বা ল্যাণ্ডস্কেপ আছে, যেখানে ছবির শান্ত থিতিয়ে থাকা বর্ণনার সঙ্গে বৈষম্য সাধন করেছে নাটকীয় গাছের সারি বা আকাশ। সমুখের জমি বা ফোরগ্রাউণ্ড আর পিছনের জমি বা পশ্চাৎপটের মধ্যেও প্রায়ই বৈষম্য আনা হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় আঠারো শতকের শেষভাগের জয়পুরী পোর্ট্রেট, যেখানে সমুখের রাজা এবং তাঁর ঘোড়া বা কোন পারিষদ পিছনের লোকজন ঘরবাড়ীর চেয়ে প্রায় অপরিমিতভাবে বড় করে আঁকা, আর রঙেও পশ্চাৎপটের চেয়ে হালকা। এইসব ছবিতে পশ্চাৎপটটি প্রায় পর্দা হিসেবে ব্যবহার করার দরুন, ছবির সাধারণ কনট্রাস্ট বা বৈষম্য সংঘাতটি বেড়ে যায়। জত্তোর 'আসিসি'

কম্পোজিশনগুলির প্রায় প্রত্যেকটিতে দুটি ভাগ আছে, দুটি ভাগের মধ্যে বিপরীত বৈষম্য খুব চোখে পড়ে এবং মূলত ভিন্ন চরিত্রের মনে হয়। জত্তো এইরকম দুটি ভাগকে প্রত্যেক ছবিতে এক অখণ্ড ঐক্যে গেঁথেছেন বলেই তাঁর এত কৃতিত্ব (চিত্র ২৫)। জত্তোর মত অত মহান বিরাট কাজ না হলেও এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় শান্তিনিকেতনের হিন্দী ভবনের তিন দেয়ালে বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের বুয়োনো ফ্রেস্কোর (চিত্র ৩৭) ছবিগুলি। প্রতিটি দেয়ালেই স্পষ্ট কয়েকটি বড় বড় অংশ আছে, এবং সে অংশগুলি পরস্পর বিপরীতধর্মী ; তবুও তিনি সবকটি একসঙ্গে খুব ভাল করে মিলিয়েছেন, যার ফলে প্রত্যেকটি দেয়ালে সমগ্রতা এসেছে, আবার তিন দেয়াল মিলে বৃহত্তর কীর্তি হয়েছে।

এই কনট্রাস্ট, বৈষম্য বা সংঘাত নানাধরনের রীতি বা টেকনিকের যুগপৎ ব্যবহারেও সম্ভব : ছবির এক অংশে হয়ত বড় বড় বিস্তৃত জমি একেকটি রঙ জুড়ে রইল, অন্য অংশ হয়ত টুকরো টুকরো অনেকগুলি রঙে ভাগ হয়ে গেল। এটি বিশেষ করে দেখা যায় রাজপুত পোর্ট্রেট বা অজন্তার শিবিরাজার উপাখ্যান চিত্রে বা ভানগখে। ভানগখ আবার একই ছবিতে বুরুশের পোঁচড় নানা বিপরীতমুখে চালিয়ে গতিমুখের বৈষম্য এনে বা তুলির টানে সরুমোটার কনট্রাস্ট ফুটিয়ে ছবিতে বিচিত্র পরিণতি আনতেন। শিল্পজগতে কনট্রাস্টের মূল মন্ত্রই হচ্ছে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য আনা। কিন্তু তার উপরেও কথা আছে। সে কথাটি এই যে বৈচিত্র্য সেই অনুপাতেই সার্থক হয় যে অনুপাতে ছবির ভিন্ন ভিন্ন অংশগুলির মধ্যে বিভেদগুলি সুস্পষ্ট এবং বাঙ্ময় ভাস্বর বা নাটকীয় হয়ে ওঠে।

ছবি দেখে দেখে যাঁরা চোখ তৈরি করেছেন, তাদের কাছে ছবি সমুখে এলে তার ডিজাইনটি প্রথম দর্শনেই প্রতিভাত হবে। তারপর তাঁরা ঠিক করেন ছবিটি খুঁটিয়ে দেখার দরকার আছে কিনা। আসলে চিত্রে বিচার শব্দটির মানে কি ? ছবির ক্ষেত্রে বিচার কথাটি তখনই প্রযোজ্য যখন প্রশ্ন ওঠে যে শিল্পী তাঁর হাতে যে সব মালমশলা, উপকরণ আছে তার সাহায্যে এমন কোন রূপ সৃষ্টি করেছেন কিনা যা একাধারে শক্তি ও তাঁর ব্যক্তিত্বের পরিচয় দেয়। রেখার অসার্থক ব্যবহারে, খারাপ সামঞ্জস্যহীন রঙের প্রয়োগে, স্পেস বা ছবির ব্যাপ্তি ও বিচার সম্বন্ধে বোধের অভাবে, চিত্রের যে সব উপকরণ যন্ত্রপাতি আছে তার যেমনতেমন, কিংবা গতানুগতিক অথবা বাঁধাধরা নিয়োগে, কিংবা যে কোন একটি, দুটি বা কয়েকটি মাত্র প্ল্যাস্টিক উপকরণের অপরিমিত যোজনে, ছবির প্ল্যাস্টিক ফর্ম ব্যাহত হয়।

এক কথায় এসব ত্রুটি ছবিতে এলে ছবির ঐক্য বা অখণ্ডতা নষ্ট হয়। আর ছবিতে ঐক্য বা অখণ্ডতা না থাকলে সে ছবি সার্থক হয় না। তখন বাধ্য হয়ে ধরে নিতে হয় যে শিল্পীর হয় কিছু বক্তব্য নেই, নয় ছবিতে বক্তব্য পরিষ্কার করে বলার ক্ষমতা তাঁর নেই।

যে চিত্রে দৈর্ঘ-প্রস্থ ছাড়া গভীরত্ব অর্থাৎ দূরে-কাছে দেখানোর প্রয়াস নেই, অর্থাৎ যাতে তৃতীয় মাত্রা বা ডিমেন্‌শন নেই, সে ছবি প্ল্যাস্টিক ফর্মের দিক দিয়ে সবচেয়ে সরল। সে ধরনের ছবিতে হয় তরল, লীলায়িত, লাবণ্যময় রেখা থাকে, নয় সুসমঞ্জস রঙ, নয় চ্যাপ্‌টা, ফ্ল্যাট সমান ম্যাস্ এবং জমির স্পেস। এসবের গুণে খুব উঁচুদরের প্ল্যাস্টিক ফর্ম আসতে পারে, যদিও সে ফর্ম অত্যন্ত সরল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় অজন্তার কোরা অসম্পূর্ণ রঙীন প্যানেল অথবা ভারতীয় মিনিয়েচরের অসম্পূর্ণ কোরা পেন্সিলের নকশা কিংবা বাঙলার কিছু কিছু জড়ানো পট। প্রায়ই আমরা মনে রাখি না যে খুব কম ছবিই আছে যা একেবারে চ্যাপ্‌টা, ফ্ল্যাট বা দুইমাত্রিক, অর্থাৎ দৈর্ঘ্য প্রস্থে সম্পূর্ণ। এমনকি বাইজানটাইন বা পারসীকরাও এ ধরনের একেবারে ফ্ল্যাট ছবি আঁকেননি। যামিনী রায়ের সীতার অগ্নিপরীক্ষা বা মায়ামারীচ ছবিগুলিকেও একেবারে ফ্ল্যাট বলা যায় না। সাধারণত কথার কথায় আমরা যাকে ফ্ল্যাট বলি তাতেও কিছু কিছু ইঙ্গিত থাকে যার ফলে বোঝা যায় ছবির বিভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্ন প্লেনে বা স্তরে আছে। কথাটি খুব স্পষ্ট হয় একপক্ষে যে কোন একটি ছবির কথা ভাবলে, আর অন্যপক্ষে কাঁথার নকশার কথা ভাবলে। এমনকি পটুয়াদের জড়ানো পটেও যতখানি স্তরের আভাস থাকে খুলনা যশোরের সবচেয়ে জমকালো কাঁথাতেও সে রকম স্তরভেদের ইঙ্গিত থাকে না। কারণ যে কোন ছবিতে বস্তুগুলি দর্শকের চোখে বিভিন্ন দূরত্বে ভাসে। অবশ্য পার্স্পেক্‌টিভ বা পরিপ্রেক্ষিত অথবা গভীর দূরত্ব দেখানোর যন্ত্রপাতি না ব্যবহার করেও এই ধরনের অনুভূতি ঘটানো সম্ভব হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় পারসীক মিনিয়েচর বা ক্ষুদ্রকায় ছবির কথা, যেখানে অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন দৃশ্য একই স্তরে আঁকা। শুধু পারস্পেকটিভ ব্যবহারের বদলে একটি দৃশ্য আরেকটির উপর নীচে আঁকা হয়। ফ্ল্যাট দুইমাত্রিক চিত্রে কোন ডিজাইন যথেষ্ট আনন্দ দিলেও তিনমাত্রিক চিত্রের তুলনায় তাঁর প্ল্যাস্টিক ফর্মগুলি সত্যই অপ্রচুর হয়, ফলে তাতে বাস্তবের সত্যরূপও কম থাকে।

সাধারণভাবে বলা যায় যে যদি গভীরত্ব একেবারে না থাকত তাহলে

ছবিতে কঠিন ঘন পদার্থ থাকত না, আমরা আজ যেভাবে ছবিতে স্তরের পিছনে স্তরকে চিনি, জানি, তা আর আঁকা হত না। এটা নিতান্ত স্বতঃসিদ্ধ কথা যে বস্তু বা দ্রব্যের কঠিন ঘনরূপ ফুটিয়ে তুলতে হলে চিত্রোপকরণের সাহায্যে গভীর দূরত্ব বা ইংরেজিতে যাকে বলে ডীপ স্পেসের মায়া আনতেই হবে। চ্যাপটা, ফ্ল্যাট চিত্রে, যেখানে বস্তুর শুধু দৈর্ঘ্য প্রস্থই থাকে সেখানে কোন গভীরত্ব থাকতে পারে না, কোন ছায়া পড়তে পারে না, কোন বস্তুই ফুলে, এগিয়ে, অথবা ঢুকে গিয়ে, পিছিয়ে যেতে পারে না, তার ঘন শক্ত আকার অনুভূত হতে পারে না। তাই ফ্ল্যাট ছবিতে রঙ হয় উপরকার খোসা ; রেখার যোজনা হয় মুখ্যত প্যাটার্ন, রঙের উপর প'ড়ে তাদের বর্ণের রকমফের করা ছাড়া সে ছবিতে আলোর অন্য কোন কাজ থাকে না ; বা ছবির বস্তুগুলি উপর নীচে, ডাইনে বাঁয়ে ঠিকমত সংস্থান করার মধ্যেই কম্পোজিশন বা রচনার সমস্যা শেষ হয়। কিন্তু যখনই ছবিতে গভীরত্ব আসে তখনই রঙ, রেখা, রচনা ও প্যাটার্নের নতুন ও বিচিত্র সম্ভাবনা দেখা যায়। একাধারে স্পষ্ট, স্বাধীন ও পরস্পরনির্ভর ব্যঞ্জনা আসে ; যার ফলে নব নব, জটিল প্ল্যাস্টিক ফর্ম সৃষ্টির কাজে শিল্পীর ক্ষমতা যায় বেড়ে। একই চিত্রে এমন অসংখ্য সম্বন্ধের অবতারণা করা সম্ভব হয় যা শুধুমাত্র ফ্ল্যাট ছবিতে অসম্ভব

বাস্তবের সত্যরূপ বা ইংরেজিতে যাকে বলে রিয়ালিটি তার প্ল্যাস্টিক ফর্মের সঙ্গে আছে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। ঠিক যেমন বাস্তব জগৎ বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভাবাদর্শ নিয়ে থাকলে সৃষ্টির অনেককিছু রস থেকে আমরা বঞ্চিত হই, ঠিক তেমনি, চিত্রোপকরণের যথাযথ প্রয়োগের অভাবে অনেকসময়ে বস্তুর যে সত্যরূপ চিত্রে প্রকাশ হওয়ার কথা তা হয় না। ফলে আমরা বাস্তবের সত্যরূপের পূর্ণস্বাদ থেকে বঞ্চিত হই, এবং যতখানি অভিভূত হওয়া উচিত ছিল ততখানি হই না। ভাল শিল্পের গুণই হচ্ছে যে তা বাস্তবের চেয়েও বাস্তব হবে, অর্থাৎ বাস্তবের সত্যরূপ ফুটিয়ে তুলবে, তার মর্মে প্রবেশ করে আমাদের প্রতীতি দৃঢ় করবে। সাধারণত আসল বস্তুগুলি বা অবস্থাগুলি দেখে আমরা যত না আনন্দ পাই ছবিতে সেগুলি দেখে আরও বেশী আনন্দ পাওয়ার কথা। যে ক্ষেত্রে তা না হবে সে ক্ষেত্রে বুঝতে হবে শিল্পী তার উপকরণ ঠিকমত প্রয়োগ করতে পারেননি, তাঁর কাজে যথেষ্ট পূর্ণতা, ঐশ্বর্য আনতে পারেননি।

এ প্রসঙ্গে অবশ্য মনে রাখা দরকার যে যদিও দুইমাত্রার ফ্ল্যাট ছবির চেয়ে যে ছবিতে গভীরত্ব বা তিনমাত্রার পূর্ণ আভাস আছে তাতে প্ল্যাস্টিক

গুণের ঐশ্বর্য আসার সম্ভাবনা ঢের বেশী, তবুও এটা সত্যি নয় যে, ছবিতে গভীরত্ব বা তিনমাত্রিকতা এলেই তার মূল্য বেড়ে যাবে। তার কারণ ছবিতে পারস্পেক্‌টিভ বা মড়লিং এর গুণ কি করে আনতে হয় তার কায়দাকানুন জানা থাকলে ছবিতে গভীরত্ব আনা শক্ত নয়, কিন্তু এ ধরনের কাজে শুধু যদি নিছক পটুত্ব বা নৈপুণ্যই থাকে তা হলে সে ছবিতে রিয়ালিটি বা বাস্তবের সত্যরূপের চেয়ে ঝুটো অসত্যরূপই থাকবে বেশী ; ফলে সাদাসিধে দুইমাত্রিক ছবির প্যাটার্নের চেয়ে তা বেশী অসত্য হয়। ছবিতে গভীরত্ব ও বস্তুর ওজনবিশিষ্ট ঘনরূপ তখনই রসের সঞ্চার করে যখন নানা প্ল্যাস্টিক উপকরণ একসঙ্গে হাত মিলিয়ে এক অখণ্ড সমগ্র ডিজাইনের সৃষ্টি করে। সুতরাং ছবিতে কে কতটুকু গভীরত্ব বা বস্তুর ঘনত্বের ভ্রম আনতে সক্ষম হয়েছেন তা দিয়ে কে বড় কে ছোট তার বিচার চলে না। সেজানের যে কোন ফিগর যেমন বিশাল, ওজনে বিশিষ্ট, ভারী, রেনোয়ারের কোন ফিগর অবশ্যই তা নয়। সেজানের কোন ফিগর রেনোয়ারের কোন সুকুমার, পেলব, অপেক্ষাকৃত হাল্কা ডিজাইনে মোটেই খাপ খাবে না। অপরপক্ষে সেজানের ডিজাইন সাধারণত যেমন কঠোর তেমনি শক্তিশালী ; তাতে বিশাল, ওজন বিশিষ্ট বস্তু ছাড়া অন্য কোন জিনিস এলে তাল কেটে যাবে। এক কথায় বলতে গেলে ছবিতে গভীরত্ব বা তিনমাত্রিকতাই সর্বস্ব বা একমাত্র মাপকাঠি নয়। সমগ্র, সার্থক প্ল্যাস্টিক ফর্মসৃষ্টিতে তা কতখানি সাহায্য করছে তারই উপরে তার মূল্য নির্ভর করে।

যে সব তিনমাত্রিক ছবিতে ঘনত্ব গভীরত্ব আছে আর যে সব ছবি সেই অনুপাতে ফ্ল্যাট বা চ্যাপটা তাদের গুণাগুণ বিচার করতে হলে দেখা দরকার তারা কিভাবে রঙ আর আলো ব্যবহার করেছে। অনেক ছবি আছে যাতে রঙ শুধু প্রসাধন দ্রব্যের মত উপরের জমিতে মাখিয়ে দেয়া হয়, যেন মুখের ক্রীম বা পাউডার বা লিপস্টিক। ঠিক যেন সলমাচুমকির কাজ, প্রতিমানির্মাণ হবার পর যেন তার গায়ে কেউ লাগিয়ে দিয়েছে। ফলে রিয়ালিটি সুদৃঢ় হওয়া দূরের কথা, মিথ্যার আভাস বেশী করে ফুটে ওঠে, ছবি অবাস্তব হয়, তার সামগ্রিক ঐক্য নষ্ট হয়। বাস্তব জগতে যে কোন বস্তুর রঙ শুধুমাত্র তার উপরের আবরণ বা চামড়ার গুণ নয়। যেমন পাথরের ধূসর রঙ মনে হয় যেন তার অন্তঃস্থলের গভীর থেকে উঠেছে, উপরে উঠে তা আবার যেন ভিতরে চলে গেছে। তাই পাথরের গড়ন বা সত্তার সঙ্গে তার রঙ অভিন্ন, যার ফলে তার ধূসর রঙ আর শক্ত কঠিন

দেহ একটি অখণ্ড বাস্তব হিসেবে অনুভূত হয়। তেমনি চিত্রশিল্পে বস্তুর সত্তা আর তার রঙ যদি এইভাবে অভিন্ন না হয় তাহলে ছবিটি সম্বন্ধে সেই অনুপাতে আমাদের প্রতীতি কমে যাবে, ফলে ছবিটির মূল্য কমে গিয়ে শস্তা ঠুনকো অবাস্তব দেখাবে।

ছবিতে প্রকৃত তিনমাত্রিক চরিত্র আনতে রঙ যেমন সাহায্য করে ঠিক তেমন করে আলো আর ছায়া। দুইমাত্রিক ছবিতে একই রঙের গাঢ়ফিকের মধ্যে দিয়ে আলো কাজ করে, যার দরুন যে আলোটুকু পড়েছে তারই উপরে রঙের সে পর্দাটুকুর অস্তিত্ব নির্ভর করে। কিন্তু তিনমাত্রিক প্রতিচ্ছবিতে কোন বস্তু কেমন কতখানি ঘন তা দেখাতে হলে, সেটি যেখান থেকে উদ্ভাসিত হচ্ছে, তার যত কাছে থেকে সম্ভব সবচেয়ে উজ্জ্বল আলোটি ফেলতে হবে, যাতে সেখান থেকে ক্রমিক ধারায় তা গভীর ছায়ায় মিলিয়ে যায়। অন্যভাবে বলতে গেলে রঙ আর আলোর উপযুক্ত যোজনায় বস্তুর ঘনত্ব ফুটে ওঠে এবং এই যোজনার ফলেই ফর্মের মডলিং হয়। সেই সঙ্গে আরেকটি চিত্রগত গুণের সঞ্চার হয় ; রঙ ও আলোর এই ধরনের প্রয়োগে প্রতিটি উপাদান স্বকীয় বৈশিষ্ট্যময় স্বাধীন ছন্দের প্যাটার্ন আনতে পারে। সেগুলি আবার অন্যান্য প্ল্যাস্টিক উপাদানের সঙ্গে মিলিত হয়ে নতুন নতুন ছন্দের সৃষ্টি করে। উদাহরণ হিসেবে বেলিনির "অ্যালেগরি অভ পার্গেটরি" অথবা সেন্ট পরিবৃত সিংহাসনে আসীনা ম্যাডোনা (চিত্র ৩১) ছবিটির উল্লেখ করা যায়। ছবিটিতে ক্যানভাসের বিভিন্ন জায়গায় আলোছায়া যে চিত্রিত হয়ে প্যাটার্নের সৃষ্টি করে তা অবশ্যই ছবিটির প্ল্যাস্টিক ফর্মের একটি মুখ্য অঙ্গ ; কিন্তু সেই আলো আর ছায়া ছবির নানা বস্তু বা আকৃতির বিভিন্ন সংস্থান ও কন্টুরকে যে ভাবে চিনিয়ে দেয়, সেই চিনিয়ে-দেয়া কাজ, আর পূর্বোক্ত প্যাটার্নের কাজ, দুটির স্বভাব আলাদা, এমন কি তারা যে সম্পূর্ণভাবে অন্যোন্য নির্ভর একথাও বলা যায় না। ঠিক তেমনি, তিশানের 'দস্তানা হাতে লোক' ছবিটিতেও লোকটির মুখে, শার্টের সমুখদিকে, হাতে, দস্তানায় আলো পড়ে যে চমৎকার প্যাটার্নের সৃষ্টি হয় সেই আলোই আবার সমস্ত ছবির নানা অঙ্গে ঘনত্ব, ওজন আনে ; আবার সেই আলোই ছবিটি সংগঠন করতে খুব সাহায্য করে (চিত্র ৩৩)। সাধারণভাবে বলতে গেলে বলতে হয় যে শিল্পী এই বিশেষ প্ল্যাস্টিক উপাদানটিকে তাঁর বিষয়ের সত্যরূপ প্রতিফলিত করার কাজে ব্যবহার করেছেন, এবং সেইসঙ্গে ছবির ডিজাইনটিকে অখণ্ড, প্রাণময়, ঐশ্বর্যমণ্ডিত করেছেন। চিত্রে গভীরত্ব বা ডীপ স্পেস মূল্যবান

প্ল্যাস্টিক উপাদান হিসেবে তিনমাত্রিক পেন্টিং-এর চরিত্র নির্ণয় করে। পারস্পেকটিভের প্রয়োগে এই গভীরত্ব আসে। দৃশ্যমান জগতে যে পারস্পেকটিভ চোখে দেখছি তাই যে যথাযথভাবে ছবিতে আনতে হয় তা নয়। ছবিতে তাকে প্ল্যাস্টিকভাবে ব্যবহার করতে হয়, অর্থাৎ চিত্রের নিয়মকানুন, শিল্পীর নিজস্ব তাগিদ প্রয়োজন অনুযায়ী তাকে বদলে দিতে হয়। মড্‌লিং আর পারস্পেকটিভের যুগপৎ প্রয়োগে ইংরেজিতে যাকে বলে স্পেস-কম্পোজিশন তাই সম্ভব হয়। স্পেস-কম্পোজিশন কথাটা ইংরেজি ভেঙ্গে জমির রচনা বললে ভুল হবে! স্পেস বলতে এখানে বোঝায় ব্যাপ্ত-চরাচর, অর্থাৎ আমাদের চতুষ্পার্শ্বের শূন্য ও বায়ুমণ্ডিত জগৎ। রেখা, রঙ, আলো অর পারস্পেকটিভের প্রয়োগে চিত্রে কোন বস্তু ঘন, কঠিন দেখালে যে তৃতীয় মাত্রা অর্থাৎ দৈর্ঘ্য প্রস্থ ছাড়াও গভীরত্ব আসে, স্পেস-কম্পোজিশন হচ্ছে সেই তৃতীয় মাত্রা ছাপিয়ে আরও প্রশস্ত, ব্যাপক গুণ। স্পেস-কম্পোজিশন তখনই আসে যখন শূন্যের গভীরে বস্তুগুলি এক বিশেষভাবে সাজানোর ফলে তাদের ভিতরকার ব্যবধানগুলি, অর্থাৎ পিছনে, সমুখে, উপরে, নীচে, ডাইনে, বাঁয়ে চারপাশের ছাড়া জায়গাগুলির মধ্যে সুন্দর সম্বন্ধ আসে, এমনকি ছাড়া জায়গাগুলি নিজেরাও পরস্পরের মধ্যে সুন্দর সজ্জিত ভাবের সৃষ্টি করে। স্পেস-কম্পোজিশন তখনই শুদ্ধ শিল্পরসের সৃষ্টি করে যখন চিত্রের মধ্যে প্রতিটি বস্তু এমনভাবে ন্যস্ত হয় যার কৃপায় আমরা তার চারপাশের শূন্য জায়গাটি অনুভব করতে পারি, ছবির অন্যান্য বস্তুর চারপাশের শূন্য-জায়গাগুলি পরস্পরের সঙ্গে এক বিশেষ সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়ে একাত্মতার সৃষ্টি করে, অর্থাৎ রচিত বা কম্পোজড্ হয়। যদি শূন্যে কোন বস্তু না থাকত তাহলে স্পেস বা শূন্যকে আমরা অনুভব করতে পারতুম না কারণ শূন্য বা স্পেসকে আমরা তখনই অনুভব করি যখন তার মধ্যে কতগুলি বস্তু নিজেদের মধ্যে ছাড় রেখে রেখে এক শৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। ফলে স্পেস-কম্পোজিশনে শুধু যে বস্তু থাকবে তা নয়, উপরন্তু সেই বস্তুগুলির মাঝের শূন্য জায়গার ব্যবধানগুলিও থাকবে। বস্তু এবং তাদের মাঝের শূন্য জায়গা পরস্পর সাজিয়ে এমন এক শৃঙ্খলায় আনতে হবে যাতে প্যাটার্নের সৃষ্টি হয়, যে প্যাটার্নটিকে আবার আমরা একটি নতুন সৃষ্টবস্তু হিসেবে অনুভব করতে পারি। স্পেস-কম্পোজিশন তখনই সার্থক হয় যখন তা চিত্রের গোটা প্ল্যাস্টিক ফর্মের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়; অর্থাৎ শিল্পী যখন চিত্রের বিভিন্ন স্তর, সমতল বা প্লেনগুলিকে এমনভাবে

আগিয়ে, বাড়িয়ে, পিছিয়ে, পরস্পবের মধ্যে বিরোধ ঘটিয়ে দেন, যার ফলে বস্তুগুলি এবং তাদের মাঝের চারপাশের শূন্য ব্যবধানগুলি পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধের সৃষ্টি ক'রে আমাদের মোহিত করে। চিত্রের যে সমগ্র ভাব চোখে ভাসে তাতে স্পেস-কম্পোজিশনের স্থান খুব বেশী তার কারণ দৈনন্দিন জগতেও আমরা শুধু যে বস্তু দেখি তা ত নয় তাদের মধ্যে যে চলাফেরাও করি। আমরা ব্যাপ্ত-চরাচরের মধ্যে বাস করি, দূর জিনিসের সঙ্গে সম্বন্ধ মিলিয়ে যাবতীয় বস্তু দেখি ; যেমন গাছের পিছনে দেয়াল, পাহাড় বা বনের পশ্চাৎপটে বাড়ী। আমাদের মন এইসব রূপে ও আকারে ভরে থাকে। যখন কোন শিল্পী তাঁর গভীরতর আবেগ ও অনুভূতি দিয়ে তাদের ঐশ্বর্য বাড়ান, তাদের এমন ডিজাইনের ছাঁচে ঢেলে সাজেন যা সাধারণ লোকের অসাধ্য, তখন আমরা সেই শিল্পীর উদার, বিস্তৃত দৃষ্টির, তাঁর গভীর আবেগের অংশীদার হই।

মানুষের শরীরের যে কোন পেশী বা হাড় যেমন শরীরের অন্যসমস্ত পেশী বা হাড়ের সঙ্গে এক ছন্দে বাধা, তেমনি ছবিতে প্ল্যাস্টিক ফর্ম তখনই সার্থক হয় যখন তার সমুদয় উপকরণ ও লক্ষণ একসূত্রে গাঁথা হয়। যতই ছবি দেখা যায় ততই চোখের বিচার তীক্ষ্ণ হয়, কোন্ ছবিটি কিভাবে প্ল্যাস্টিক ঐক্যচ্যুত হয়েছে ধরা পড়ে। ধরা পড়ে কেমন করে কোন অসার্থক শিল্পী হয়ত একটি বিশেষ লক্ষণের উপর বেশী জোর দিয়েছেন, অন্যগুলিকে অযথা গৌণ বা অবহেলা করেছেন, ফলে ছবির অখণ্ডতা নষ্ট হয়েছে। যখন কোন শিল্পী চিত্র ডিজাইনের অখণ্ডতার উপরে, প্ল্যাস্টিক ফর্মের ঐক্যের উপরে সব কিছু ভিত্তি না করে এইভাবে লক্ষচ্যুত হ'ন, তখন তাঁর কাজকে আমরা বলি বাঁধাগৎ বা অ্যাকাডেমিক রীতিতে আঁকা। যদি কাজে যথেষ্ট নৈপুণ্য দক্ষতাও থাকে তবুও সে দক্ষতা হয় চালিয়াতি বা ওস্তাদির নামান্তর ; সেখানে শিল্পী নিপুণ ওস্তাদমাত্র, স্রষ্টা নন। রেখা, আলো, মডলিং, পারস্পেকটিভ বা বিবিধ বস্তু সাজিয়ে স্পেস-কম্পোজিশনের প্রয়াসের মধ্যে কোন একটির উপরে হঠাৎ পড়ে অত্যধিক ঝোঁক ফলে অন্যগুলির স্থান গৌণ হয়ে যায়। যখন এ রকম ব্যাপার ঘটে তখন যাবতীয় প্ল্যাস্টিক উপাদানের ভালমত সমন্বয় হয় না ; বাস্তবের সত্যরূপের বদলে ছবি হয় অবাস্তব।

যা কিছু অলীক তা শেষত বিরক্তি জাগায় ; যদি কোন বস্তু, পরিবেশ বা অবস্থা আমরা পূর্ণ, সমগ্রভাবে না দেখতে পাই তা হলে তাকে সত্য বলে মানতে বাধে। কথাটি বাস্তবজীবনে যেমন সত্য তেমনি সত্য সব

রকম শিল্পকলার ক্ষেত্রে। দৃষ্টান্তস্বরূপ কাব্যের কথা ধরা যাক। সুইনবার্ণের স্বতঃস্ফূর্তি, বৈচিত্র্য, সূক্ষ্ম ছন্দ সবই খুব বিস্ময়কর (ঠিক যেমন বুদ্ধদেব বসুর 'বন্দীর বন্দনা' অথবা বিষ্ণু দে'র 'জন্মাষ্টমী') কিন্তু একটু মন দিয়ে পড়লে শীঘ্রই তাঁর পদ্যের গতি ও উচ্ছ্বাসে ভিতরের শূন্যতা ধরা পড়ে; যে একান্ত শুদ্ধ ক্ষমতা থাকলে, ভাব ও ভাবের সার্থক প্রকাশে, যাবতীয় উপাদানের সমুচিত প্রয়োগে, কাব্যে সার্থক বৈচিত্র্য আসে, তার বদলে দেখা যায় নিছক ছন্দের চাতুরি। শুধুমাত্র ছন্দের নানাবিধ বৈচিত্র্য ও পুনরাবৃত্তি অন্যান্য নানা প্রকার অবলম্বনের অভাবে নেহাৎই নৈপুণ্যে শেষ হয়। গভীর অর্থের অভাবে কথার মায়াজাল শেষ পর্যন্ত অবাস্তব হয়। সঙ্গীতে যেমন বেলিয়িজ বা লিস্ট বাদ্যযন্ত্রের প্রয়োগে খুবই নিপুণ ছিলেন, কিন্তু তাঁদের সঙ্গীতে আলাপের বিষয় হত সাধারণ, গতানুগতিক, তাঁদের ভাব হত তরল, ফলে নানাবিধ যন্ত্রের সরঞ্জাম সত্ত্বেও তাঁদের সঙ্গীত আসলে হত নগণ্য। ঠিক যেমন শতেক সরঞ্জাম, আয়োজন সত্ত্বেও উদয়শঙ্করের নাচ ক্লাসিক্যাল ভারতীয় নৃত্যের পর্যায়েই পড়ে না, তা হয় অনেকাংশে তরল, সংকর, চোখ ধাঁধানো পরিবেশ। যতগুলি দৃষ্টান্ত দিলুম তার প্রতিটি সম্বন্ধেই আমার বক্তব্য এই যে আসল পদার্থের বদলে সেগুলিতে আছে কোন একটি দুটি লক্ষণের উপর অনাবশ্যক ঝোঁক, যার ফলে ব্যাপারটি হয়ে দাঁড়ায় নাটুকে, চক্‌মকে, সত্যরূপ বর্জিত।

ছবি আঁকার যতকিছু প্ল্যাস্টিক উপাদান বা যন্ত্রপাতি আছে তার যুগপৎ সার্থক প্রয়োগেই হয় প্ল্যাস্টিক ফর্মের উৎপত্তি। সব কিছু প্ল্যাস্টিক উপাদানের যুগপৎ সার্থক প্রয়োগ বলতে কি কি বোঝায়, তা দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝানই ভাল। দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরব রাফায়েলকে। রাফায়েল হচ্ছেন প্ল্যাস্টিক ফর্মের অসম্পূর্ণ প্রয়োগের অতি চমৎকার দৃষ্টান্ত। রাফায়েলকে সাধারণত শিল্পীশ্রেষ্ঠ বলে গণ্য করা হয়। চিত্রশিল্পে তাঁর যে অতুলনীয় দখল ছিল একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। যেমন ছিল রেখার উপর তাঁর অধিকার, তেমনি ছিল প্যাটার্ন সৃষ্টি ও আলোর সাহায্যে কণ্টুরের ইঙ্গিত করায় তাঁর অসামান্য শক্তি। উপরন্তু তাঁর মত স্পেস-কম্পোজিশনও বোধ হয় কেউ করতে পারেননি। কিন্তু এসবের অধিকাংশই তাঁর পরের কাছ থেকে ধার করা। লেওনার্দোর কাছ থেকে নেন রেখা ও আলো, পেরূজীনোর কাছ থেকে স্পেস-কম্পোজিশন। তাঁর রঙ অগভীর, মৌলিক গুণবর্জিত, ফিকে, ম্যাড়মেড়ে কখনও এত ডপ্‌ডপে যে চোখে লাগে, দেখে মনে হয় ছবির ডিজাইনটি তৈরি হবার পর তিনি

কোন্ কোন্ রঙ কোথায় লাগাবেন তাই ঠিক করেছেন। তাঁর কম্পোজিশন বা রচনা প্রায়ই গতানুগতিক হত, জত্তোর ছবিতে যে টাট্‌কা, সদ্য সার্থকসৃষ্টির অনিবার্যতার ভাব আছে তা নেই (চিত্র ২৩)। ফলে, তাঁর ছবিতে অত ব্যাপ্তি, উদাত্ত মরুৎমণ্ডলের আভাস সত্ত্বেও একান্ত মৌলিক, শক্তিশালী কল্পনার আস্বাদ নেই। তিনি নিজের তাগিদ মত ধার করেছেন কিন্তু তাঁর কাজের মধ্যে সেগুলি যথেষ্ট পূর্ণভাবে রূপান্তরিত হয়নি। ফলে তাঁর কাজে এক বিরাট ব্যক্তিস্বরূপ বা মৌলিক চেতনার ছাপ নেই। ছবির বিষয় নির্বাচনে মৌলিকতার পরিচয় নেই, বরং তাতে গতানুগতিক ভাবালুতাদুষ্ট মনের মিষ্টি কোমলতা বর্তমান। অর্থাৎ তাঁর মন ও ব্যক্তিত্ব এত শক্তিশালী ছিল না, যার তাপে সব কিছু শিক্ষা পুনর্জন্ম নিয়ে নতুন ফর্মের সৃষ্টি করে, ফলে তাঁর ছবির বিভিন্ন উপাদান সমগ্রতায় পূর্ণ হল না। রেখা, আলো, স্পেস-কম্পোজিশন, অসাধারণ রকমের দক্ষ ও নিপুণ কাজ হয়েও আলাদা আলাদা ভাবে রইল। তাঁর মত প্রতিভাবান শিল্পীর কাজে তাঁর একান্ত নিজস্ব একটি ফর্ম এল বটে, অসাধারণ নৈপুণ্যের অধিকার বলে তাঁর কাজ অসামান্য উৎকর্ষ লাভ করল এও ঠিক, তবুও অনেক সময়ে তাঁর কাজে প্রায়ই কোথায় যেন ফাঁকি থাকত, নিকৃষ্ট ভাব ঢুকে পড়ত।

অসার্থক প্রয়োগে চিত্রের উপাদানের কত চরিত্রহানি হতে পারে, সেগুলি কত ফাঁকির খেলা বা নিতান্ত কসরতের প্যাঁচ হতে পারে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে গিদো রেনির 'ডিয়ানাইরা ও নেমাস' অথবা 'নবীন ব্যাকাস' চিত্রটি। শিল্পীর নিজস্ব যে কিছু বক্তব্য থাকতে পারে ছবিটি দেখে তা আদৌ মনে হয় না, সেই অনুপাতে ছবিটি খুঁটিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে যে তাতে বিভিন্ন উপকরণগুলি মোটেই সমন্বয়লাভ করেনি। ছবিটির প্যাটার্ন এবং কম্পোজিশন দুই-ই অবশ্য যথেষ্ট ভাল কিন্তু রাফায়েল থেকে সরাসরি ধার করা, কাজ রাফায়েলের চেয়ে অনেক খারাপ। ছবিতে যথেষ্ট কৌশলে গতির ছন্দ আনা হয়েছে কিন্তু এত বাড়াবাড়ি হয়েছে যে নাটুকে ভাব এসে গেছে। রঙের ব্যবহারে না আছে মাধুর্য, না আছে মৌলিকতা, তা যেন শুধু চটের উপর বুলিয়ে দেয়া হয়েছে। ছবিটির সমগ্র ডিজাইন বা প্ল্যাস্টিক ফর্মের সঙ্গে রঙ মোটেই খাপ খায়নি, একাত্মতালাভ করেনি, ফলে মনে হয় যা রঙ আছে তার বদলে অন্য রঙের সমাবেশ করলে ছবিটির বিশেষ কোন হানি হত না। এক কথায়, ছবিটি হচ্ছে নানা কসরতের সমাবেশ, তাদের মধ্যে কোন আন্তরিক সঙ্গতি নেই। পরিণামে

ছবিটি হয়েছে মামুলি, কষ্টকল্পিত, নিতান্ত নিকৃষ্ট। ভারতীয় উদাহরণ খুঁজলে মনে পড়ে দিল্লী কলমের কাজের পর লক্ষ্ণৌ কলমের কথা অথবা কাংড়া কলমের কাজের পর শিখী কলমের কথা (চিত্র ৩২)।

অনেক রীতির অনেক অনেক ছবি দেখার পর প্ল্যাস্টিক ফর্মের বোধ আসে, অভিজ্ঞ চোখ তখন বুঝতে পারে চিত্রের নানা উপাদান সঙ্গত সমন্বয় লাভ করেছে কিনা। এর কোন সোজা পথ নেই। তিশান বা রেণোয়ারের মত বর্ণশিল্পীরা রঙকে সমুচ্চ করেছেন, আর সব উপাদান গৌণ করে রঙকে মুখ্য করেছেন বলা অন্যায় হবে, কারণ তাঁরা বিশ্বজগতের অন্যান্য দিকও বিভিন্ন উপায়ের মাধ্যমে সমান জোরে দেখিয়েছেন। সুতরাং এটা মোটেই বলা ঠিক হবে না যে তাঁরা শুধুমাত্র রঙের মধ্যে দিয়েই চিত্রকে উপলব্ধি করতেন। এই দুই শিল্পীর কাজে রেখা, গতি, কম্পোজিশন, দৈর্ঘ্য-প্রস্থে এবং গভীরে বিভিন্ন বস্তুর নিখুঁত সংস্থান সবই সার্থকভাবে বর্তমান। তাঁদের ছবিতে অথবা রবীন্দ্রনাথের ছবিতে রঙই একমাত্র সার্থক বস্তু নয়; রঙ শুধু অন্য সব উপাদানগুলিকে একসূত্রে গাঁথে মাত্র। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় রেণোয়ারের নকশা বা ড্রয়িংও হয় রঙের প্রকাশে, যার দরুন যদিও তাঁর রেখা রাফায়েল বা লেওনার্দোর রেখার মত কেটে কেটে বসে না, তবুও তা খুব ভালভাবেই তরল লীলায়িত গতি ও ছন্দ আনে। মিকেলাঞ্জেলো বা সেজানের ছবিতে যে ধরনের তিনমাত্রিক ওজন ও ঘনত্ব পাই তা রেণোয়ারের ফিগরে না থাকলেও, সেগুলি মোটেই ধোঁয়াটে বা অবাস্তব হয় না। তাদের যেমন থাকে বস্তুত্ব, তেমনি ওজন, ঘনত্ব, ম্যাস, বাস্তবরূপ, যদিও হয়ত মিকেলাঞ্জেলো বা সেজানের মত নয়, তার কারণ মিকেলাঞ্জেলো বা সেজানের মূল উদ্দেশ্য ছিল রেণোয়ারের থেকে আলাদা।

বিশেষ একটি উপাদানের উপর ঝোঁক সত্ত্বেও অন্যান্য উপাদানের যথার্থ স্বীকারে কি করে ছবি সমগ্রতা লাভ করে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছেন রেমব্রাণ্ট। তিনি কিয়ারসক্যুরো বা ছায়াতপ অর্থাৎ একটু উজ্জ্বল জায়গার চারপাশে অন্ধকার ব্যবহার করতে ভালবাসতেন। তাঁর অধিকাংশ ছবির বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে আলো আস্তে আস্তে অন্ধকারের অতলে তলিয়ে যাবে। এ ধরনের ছায়াতপের কুহকে পড়ে মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়া খুবই সহজ। কিন্তু কিয়ারসক্যুরোকে তিনি রঙের স্থানে বসালেন, তার ফলে মাত্রাধিক্য হল না, তাল বজায় রইল; লেওনার্দো বা রাফায়েলের যে-কোন রঙের চেয়ে তাঁর ছায়াতপ রঙের কাজ আরও ভালভাবে হাঁসিল করল।

'বৃদ্ধ লোক' বা 'হেনড্রিকে স্টোফেলস্' অথবা আত্মপ্রতিকৃতি (চিত্র ৬) ছবিতে সোনালি-ব্রাউন আলোর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিভঙ্গে যে দ্যুতি, জমক, বৈচিত্র্য এল তা গৌণ কোন শিল্পীর হাতে স্পেকট্রাম বা বর্ণচ্ছটার যত বৈভব আছে তার চেয়েও ঐশ্বর্যময় হল। আবার 'নির্দয় ভৃত্য' ছবিটিতে যখন তিনি উজ্জ্বল রঙ দিলেন তখন তাতে এল বিস্ময়কর গভীর অতল ভাব, ঐশ্বর্য, আগুন। এই ধরনের সংযম অথচ শক্তিমত্তা ছিল তাঁর লাইনে, ঘনবস্তুর ইতস্তত সংস্থানে। কিয়ারসক্যুরোর আশ্রয় নিলে শিল্পীর ক্যানভাসে ক্ষেত্র সংকুচিত হয়ে যায়, স্পেস-কম্পোজিশনের পক্ষে যতখানি বিস্তার প্রয়োজন হয় তার অভাব ঘটার আশঙ্কা থাকে, কিন্তু 'নির্দয় ভৃত্য' ছবিতে বিন্দুমাত্র জায়গার টানাটানি নেই, বরং এত বিস্তৃত ক্ষেত্র পেরুজীনো বা পুসঁ্যাতেও আছে কিনা সন্দেহ।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, অন্যান্য শিল্পের মত চিত্রকলাতেও যদি কোন গুণ বা উপাদানকে মুখ্য করে ছবি আঁকা হয়, তবে তার পরিপূরক অন্যান্য গুণ এনে তাকে ভরাট করতে হয়। তা না হলে সে ছবি মামুলি, শস্তা, নিকৃষ্ট, অবাস্তব, প্রতীতিহীন হয়।

ছবির বিষয়ের সত্যরূপ বা রিয়ালিটিই চিত্রকলায় রসসৃষ্টি করে। দাভিদ বা দেলাক্রোয়ার চিত্রের বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করলে এই কথাটির সত্যতা প্রমাণিত হয়। দাভিদের ছবিতে সর্বদাই রঙ্গমঞ্চের স্টেজ-সেটিং, নাটকীয় ভঙ্গী, ভাব, প্রাচীন রোমক ঐতিহ্যের স্মৃতি নিয়ে ব্যস্ততা দেখা যায়। তেমনি দেলাক্রোয়ার বাইরন-সুলভ দূর অচেনা বিষয় নিয়ে ব্যাপৃতিতে মনে হয় তিনি যেন দৈনন্দিন চেনা জগৎকে শিল্পীর নজরের অযোগ্য বলে মনে করেন। উভয়ক্ষেত্রেই আমরা একটু অস্বাভাবিক, নাটকীয় গুণ দেখি। এটা ঠিক যে দাভিদ বা দেলাক্রোয়া কেউ-ই ইচ্ছা করে, অসৎ মন নিয়ে নাটকীয়ভাব আনতে চাননি। তাঁদের নাটুকেপনার মধ্যে সজ্ঞানে অসৎবৃত্তি না থাকলেও এটা বিলক্ষণ মনে হয় যে তাঁরা যেন অভিনয় করছেন। তীব্র আবেগ, দুঃখ, ট্রাজেডির মর্মকথা তাঁদের ছবিতে যেভাবে ফুটে উঠেছে সে সব ভাব সুদূর, অতীত যুগের মত তাঁদের যুগেও অবশ্য ছিল। কিন্তু তাঁরা করলেন কি, সে সব ভাব হাতের কাছে না খুঁজে খুঁজলেন, পেলেন, দূর কল্পিত বীরোচিত অতীতে। ফলে আমাদের এইরকম ধারণা হওয়া অন্যায় নয় যে তাঁদের ছবি মূলত অতিরঞ্জন বা ক্যারিকেটিওর, অথবা দিবাস্বপ্নের সমষ্টিমাত্র। 'ক্লাসিসিজম্' বা 'রোমান্টিসিজম্'কে এইভাবে হেয় করার মধ্যে কোন সাহিত্যিক উদ্দেশ্য

এখানে নেই। এখানে আমাদের বিচারের মান শুধুমাত্র চিত্রলক্ষণ। প্রাচীন যুগের প্রতি মোহ অথবা ভাবালুতা এলে চিত্রের যাবতীয় উপাদানের প্রয়োগে আপনাআপনি গণ্ডি এসে যায়, তাদের ব্যবহার মৌলিক না হয়ে গতানুগতিক হতে চায়। তখন শিল্পী শুধু নিজের অভিজ্ঞতার তাগিদে আঁকতে বসেন না ; এ শিল্পী ও শিল্পী থেকে কিভাবে বিশেষ বিশেষ আমেজ আনা যায়, তাই ধারধোর করে আঁকতে বসেন। যেমন দাভিদের 'ক্ল্যাসিক', প্রশান্ত ভাব, অথবা আবেগহীন, হিমভাব এসেছে রাফায়েল এবং মান্তেনিয়া থেকে, তাঁরা আবার ঐ কৌশলটি ধার করেন গ্রীক, রোমক, ভাস্কর্য থেকে (চিত্র ২৯)। সুতরাং দাভিদের ব্যক্তিগত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে ঐ ভাব, ঐ রূপ আসেনি। বাস্তবের সত্যরূপকে তিনি ঐ রূপে ধরেননি, তাঁর কাছে এটা ছিল স্টুডিওর কৌশল, যার উপরে তিনি পরে রঙ, ম্যাস ও স্পেসের গুণাগুণ যোগ করেন। তিনি যে রীতিকে আশ্রয় করলেন তার সঙ্গে এসব উপাদান খাপ খেল না, মিশে গেল না, সত্যরূপের আভাস ফুটিয়ে তুলল না। সেগুলি হয়ে রইল বাইরের উটকো জিনিস ; ঠিক যেমন তাঁর চিত্রের 'মহামহিম' 'মহাবীর' ফিগরগুলি আমাদের দৈনন্দিন জীবন, দৈনন্দিন অবস্থার পাশে অচেনা, অপরিচিত, অশরীরী ছায়ামাত্র।

দেলাক্রোয়া সম্বন্ধে একই কথা খাটে ; তাঁর ছবির উত্তাল আবেগ, হাবভাবের অতিরঞ্জন, ভীষণ নাটকীয় পরিস্থিতি সবই দাভিদের "মহান" ভাবের মত অবাস্তব ভেল্কিবাজি। দাভিদের মতই তাতে প্রমাণ হয় যে তাঁর চারপাশের জগৎ দেখার ক্ষমতা দেলাক্রোয়ার ছিল না। অবশ্য, দাভিদের বিষয়বস্তু বা প্ল্যাস্টিক গুণ যতটা অস্বাভাবিক লাগে, দেলাক্রোয়ার ততটা লাগে না। এই প্রসঙ্গে দাভিদের সঙ্গে কিছুটা নন্দলাল বসুর ও দেলাক্রোয়ার সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তুলনা মনে আসতে পারে। তবে দাভিদের কাছে ক্ল্যাসিসিজম যতটা চালের ব্যাপার ছিল, দেলাক্রোয়ার পক্ষে রোমান্টিসিজম্ ততটা ছিল না ; তাছাড়া দেলাক্রোয়া অপরের কাছে যতটা ধার করেন তার অনেকখানিই বদলে, ঢেলে সেজে, পুনরায় গড়তে চেষ্টা করেন। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায় রুবেন্সের চেয়ে তাঁর রঙ আরও এগিয়ে গেল, আরও নতুন জিনিস সাধিত করল, রুবেন্সের কাছে তিনি যেটুকু ধার করলেন তার ব্যবহারে তিনি যথেষ্ট মৌলিকতা দেখালেন (ঠিক যেমন হাতের কাছের কথা বলতে গেলে, রথীন মিত্র রথীন মৈত্রের কাছে যা ধার করেন, তার চেয়ে তাঁর নিজের দান বেশী)। ফলে দেলাক্রোয়াকে

দাভিদের চেয়ে অনেক বেশী সত্য, বিচিত্র ও মহৎ শিল্পী বলে মনে হয়।

দাভিদ বা দেলাক্রোয়া কতখানি যে অবাস্তব ছিলেন বোঝা যায় যদি পরবর্তী শিল্পীদের সঙ্গে তাঁদের তুলনা করি। কুর্বে এবং তাঁর পরবর্তীরা চারপাশে বাস্তবিক ঘটেছে এমন ঘটনা, জীবিত লোক, তদানীন্তন অবস্থা সম্বন্ধে অত ভাবিত ছিলেন বলেই তাঁরা ভেলাস্কেথ বা গোইয়ার ন্যায্য উত্তরাধিকারী হন। কারণ তাঁরা আমাদের বস্তুনিষ্ঠতা শেখান; তাঁরা নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত না হয়ে, নিজের ভাবনায় পরকে ব্যতিব্যস্ত না করে, অর্থাৎ স্বরচিত রোমান্টিক জগৎ ত্যাগ করে, সৃষ্টির জগৎকে অনাবৃত চোখে দেখতে চান। কুর্বের পদাঙ্কে ১৮৭০ এর মহাশিল্পীরা একে একে আসেন, যেমন মানে', মনে, দেগা, সিসলি, পিসারো, রেণোয়ার, সেজান। তাঁরা বাস্তব জগতের জীবন কল্পনার অঞ্জনে আরও সত্যরূপে দেখতে চাইলেন। এঁদের মধ্যে আবার রেণোয়ার আর সেজান হলেন সবচেয়ে সার্থক। বিবিধ থিয়োরি, নানাবিধ চোখ ধাঁধানো রীতি, কসরৎ কৌশল, ব্যক্তিগত অহঙ্কার ত্যাগ করে, যা কিছু নগণ্য ফক্কিকারি ছেড়ে দিয়ে তাঁরা নিতান্ত বস্তুনিষ্ঠার সঙ্গে গ্রহণ করলেন সেই সমগ্র জগৎকে, যে জগৎ তাঁদের দেশের সমস্ত লোক নিজেদের অভিজ্ঞতায় পায়। টেকনিকের প্রভেদ উপেক্ষা করে কেউ যদি তাঁদের কাজ খুঁটিয়ে দেখে তাহলে দেখবে যাবতীয় সৃষ্টির সার্বিক মৌল রূপগুলি তাঁরা প্রায় একইভাবে ধরেছিলেন; দুজনে ছিলেন পরস্পরের একান্ত আত্মীয়। দুজনেই নিতান্ত ঘরোয়া, চারপাশের দৈনন্দিন ঘটনা নিয়ে ছবি এঁকেছেন। ফলে তাঁদের ছবির যে-কোন বস্তুর বিশিষ্ট নিজস্ব গুণ, চেহারা, স্পর্শ, অনুভূতি যেন আমরা দেখি, পাই। যে জগৎ আমরা প্রত্যহ দেখি, সে জগৎকে যেন তাঁরা দুজনে আরও ভালভাবে সত্যভাবে, সমগ্রভাবে পরিপূর্ণ ঐশ্বর্যে, সার্থক ব্যঞ্জনায় দেখতে সাহায্য করেন। যে জগতে বাস করি, যাকে জানি, সে জগৎকে তাঁরা এমন প্রাণবন্তভাবে নিজেদের ছবিতে প্রতিফলিত করেন যে, ছবি দেখে মনে হয় তাকে আবার আমরা প্রত্যক্ষভাবে জানলুম। দুজনেই মহৎ শিল্পী এই হিসেবে যে, তাঁরা যা দেখেছেন, অনুভব করেছেন, প্রকাশ করেছেন, তার বাস্তবতা, সত্যতা সম্বন্ধে আমাদের বিশ্বাস ও প্রতীতি জন্মাতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা হয় না। তাঁরা শিল্প ও জীবন এক করে দেন।

রূপভেদ-প্রমাণ ও চিত্রের বিষয়বস্তু

চিত্রের মূল্য যে তার বিষয়ে নয়, তার প্ল্যাস্টিক ফর্মে, অর্থাৎ রূপভেদ ও প্রমাণের সার্থক প্রয়োগে যে সাদৃশ্য, ভাব ও লাবণ্য আসে তার মধ্যে, সে কথা বোধহয় আর বেশী বলার দরকার নেই। কিন্তু তাতে এ প্রমাণ হয় না যে চিত্রে বিষয়বস্তুর কোন মাহাত্ম্যই নেই। বিশ্বরূপের যে সত্য সাদৃশ্য আমরা কোন চিত্রে পাই ছবির প্রকৃত মূল্য তার উপরে নির্ভর করে। সুতরাং বিষযবস্তু এবং প্ল্যাস্টিক ফর্ম, দুটি জিনিস কোনমতেই আলাদা করা যায় না। এটা অবশ্য ঠিক যে বিষয়বস্তুর মাহাত্ম্য বাদ দিয়ে, সেটা আলাদা রেখে, প্ল্যাস্টিক ফর্মের উৎকর্ষ হয়েছে কিনা, ছবির যত কিছু প্ল্যাস্টিক উপাদান আছে তার সম্যক ও যথাযথ ব্যবহার হয়েছে কিনা. শুধু এই প্রশ্নের উপর ছবির যে বিচার হয় সে-ই আসল বিচার। ঠিক যেমন রবীন্দ্রনাথের গানের কথাগুলি যত সুন্দর, যত কবিত্বপূর্ণই হোক না কেন, তাঁর যদি ভারতীয় সঙ্গীতের সমস্ত অঙ্গ ও উপাদানের উপর প্রচণ্ড দখল না থাকত, ভারতীয় সঙ্গীতের ঐতিহ্যকে পুরোপুরি ব্যবহার করে, তিনি তার বিস্তার ও মহত্ত্বকে আরও ঐশ্বর্যমণ্ডিত করতে না পারতেন, তাহলে তাঁর অপূর্ব, মধুর, সূক্ষ্ম রচনাগুলি গান হিসেবে অন্তত নিতান্তই ব্যর্থ হত। সেই হিসেবে বীভৎস হত্যাকাণ্ডের দৃশ্যই বা কি আর পবিত্র বিবাহের দৃশ্যই বা কি বিষয় হিসেবে সমান উপাদেয় হতে পারে। কারণ তার যে কোনটি থেকেই আমরা ছবির অঙ্গ উপাদানগুলি, অর্থাৎ রেখা, রঙ, স্পেস, আলো বার করে নিয়ে, সেগুলি কিভাবে রসসৃষ্টিতে সাহায্য করেছে, কিভাবে পরস্পরে মিলে মিশে ছবির সমগ্রতা সাধন করেছে, তার বিচার করতে পারি। অবশ্য এ অধিকার ও পারদর্শিতা আসে বহুদিনের অনুশীলনে এবং অভিজ্ঞতায় ; ক্রমে ক্রমে সে অধিকার ও পারদর্শিতা অভ্যাসে দাঁড়ায়। তা যতদিন না হয় ততদিন ছবির বিষয়বস্তুই থাকে প্রধান আকর্ষণ, যার কৃপায় দর্শক হয় আকৃষ্ট হয়, নয় বিরক্ত হয়। অধিকাংশ শিল্পীই চিত্রের ভাষা ভাল করে আয়ত্ত করতে পারেন না, তার বিভিন্ন উপাদান আত্মস্থ করতে অপারগ হন। অক্ষম হয়ে তাঁরা এমন সব বিষয় বস্তুর আশ্রয় নেন যাদের চিত্রবহির্ভূত নিজস্ব কিছু আকর্ষণী শক্তি আছে ; সেই শক্তিকে কেন্দ্র করে

তাঁরা দর্শকের মনে ভাব জাগাতে চেষ্টা করেন ; কিন্তু সেই ভাবের সঙ্গে একান্ত চিত্রজ ভাব বা ভাবপ্রকাশেব কোন সম্বন্ধ নেই। চিত্রে বিষয়বস্তুর এই ধরনের আকর্ষণ,—তা সে নাটকীয়, ভাবালুতাময়, ধর্মাশ্রয়ী, কামোদ্দীপক বা লাস্য যাই হোক,—সাধারণ দর্শকের পক্ষে ছবির প্রায় সর্বস্ব হলেও, চিত্ররসের দিক থেকে নিতান্ত অবান্তর। সাধারণ অ্যাকাডেমি প্রদর্শনীতে যেসব চিত্র প্রথম পুরস্কার পায় তাদের বিষয়বস্তু সাধারণত হয় মা ও ছেলে, নয় নগ্ন নারী, নয় সুন্দর ল্যাণ্ডস্কেপ। অর্থাৎ বিষয় মাহাত্ম্যেই ছবির মাহাত্ম্য স্থির হয়, তাতে চিত্রগুণ বিন্দুমাত্র থাকুক আর নাই থাকুক। এ পাপ যে আমাদের যুগে দেখা দিয়েছে তা নয়, যতদিন ধরে ছবি আঁকা হচ্ছে ততদিন থেকেই আছে। ইওরোপের বড় বড় চিত্রশালায় যেমন লুভরে, উফিৎসিতে, ড্রেসডেনে বা প্রাদোয় অনেক অর্থব্যয় হয় সেইসব ছবি ভাল অবস্থায় রাখতে যাদের বিষয় মাহাত্ম্য ছাড়া আর কোন গুণই বিশেষ নেই।

যিনি সবে ছবি দেখতে শুরু করেছেন তাঁর পক্ষে চিত্রের বিষয়বস্তু উপেক্ষা করে ছবির রঙ রেখা স্পেস আলো পরস্পরের মধ্যে কতটুকু সম্বন্ধ নির্ণয় করতে পেরেছে তার বিচার করা শক্ত। সে অধিকার পেতে হলে, বহুদিনের পুরনো সব অভ্যাস, যা নাকি সোক্ষমভাবে চেতনায় গেঁথে গেছে, তা সম্পূর্ণ ভেঙ্গে নতুনভাবে অভ্যাস শুরু করতে হব ; কিন্তু অন্যান্য কাজেও যেমন সৎকারের আকাঙ্ক্ষা, আগ্রহ মানুষকে তাড়িয়ে নিয়ে যায়, তেমনি এক্ষেত্রেও একবার নতুন করে দেখার অভ্যাস আয়ত্ত হলে, নতুনভাবে ছবি দেখা সহজ হয়ে যায়। তখন বিষয়বস্তুর অবান্তর প্রশ্ন ছবি দেখার ব্যাপারে আর প্রতিবন্ধক হয় না। তখন দর্শকেব চোখে ছবির চিত্রগুণই হয় একমাত্র অন্বিষ্ট, বিষয়বস্তু হয় গৌণ। ভাল উঁচুদরের সমঝদারের লক্ষণই হচ্ছে যে, তিনি একবার কোন সার্থক ছবি মন দিয়ে দেখলে তার রঙ, রেখা, আলো, স্পেস কোথায় কোনটা কিভাবে কতখানি আছে তা ছবি না দেখেও পরে বলে দিতে পারবেন, কিন্তু ছবির বিষয়বস্তুটি কি ছিল তা হয়ত মনে নাও থাকতে পারে। সাধারণ দর্শকের বেলায় ঠিক উল্টোটি হয়। তাঁরা বিষয়ের উল্লেখ করে ছবির উল্লেখ করেন ; রঙ, রেখা, আলো, স্পেস কোনটা কোথায় কিভাবে ছিল, তা ভুলে যান। অন্য পক্ষে কোন প্রবীণ সঙ্গীতজ্ঞ কোথায় কোন সুর কিভাবে ব্যবহার হয়েছে, সম্পূর্ণ মনে রাখেন, কিন্তু সে সঙ্গীতের উপলক্ষ্য বা অবলম্বনটি মনে রাখেন না। অতি বৃদ্ধ বয়সে, যখন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর চোখে ভাল দেখতে পেতেন

না, তখনও কেউ যদি তাঁর কাছে আসত যার মুখের ছবি তিনি কোন্‌কালে, হয়ত পঞ্চাশ বছর আগে, এঁকেছিলেন, মুখটি নিমেষে চিনতে পারতেন যদিও নাম ধাম পরিচয় কিছুই বলতে পারতেন না। ঠিক একই ব্যাপার চিত্রশিল্পীর ক্ষেত্রেও হয়। যেমন সেজান একই সাঁৎ ভিক্তোয়ার অথবা আপেল হাজার বার এঁকেছেন, সাঁৎ ভিক্তোয়ার পাহাড় বা আপেলের লোভে নয়; ডিজাইনের ক্লান্তিহীন অন্বেষায়; অথবা যামিনী রায় একই গোপিনী হাজার বার হাজাররকমে এঁকেছেন, গোপিনীর শরীরের বাঁকের লোভে নয়, ডিজাইনের খোঁজে। রবীন্দ্রনাথ মুখের মাস্ক অজস্র এঁকেছেন নানাভাবে নানা ছাঁদে, ছবি অনুভব করার একান্ত তাগিদে, প্রতিকৃতি আঁকার তাগিদে নয়; অথচ রবীন্দ্রনাথের মাস্ক দেখে তাঁকে তাক লাগানোর জন্যে অবনীন্দ্রনাথ যখন মাত্র কয়েকটি মাস্ক আঁকলেন তখন সেগুলি চিত্র হিসেবে মাস্ক হল না, হল পোর্ট্রেট, তাতে (যেমন নিজের মাস্কে) চিত্রত্ব যত না রইল থাকল বিষয় মাহাত্ম্য, অর্থাৎ লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তিদের মুখের ছাপ।

মুশকিল হয় সেইসব ক্ষেত্রে, যেখানে কোন চিত্রশিল্পী হামেশাই মানবিক গুণাত্মক, ধর্মবিষয়ক, কাব্যাশ্রিত, অথবা নাটকীয় ভাবনির্ভর ছবি আঁকেন; তাতে বিষয়নিহিত গুণগুলির উপর বেশী জোর দেন। এই বিষয়ে সবচেয়ে দোষী রাফায়েল; ফ্রা আঞ্জেলিকো, মান্তেনিয়া, লুইনী, টার্নার, দেলাক্রোয়া, মীলে-ও বাদ যান না। এবং ঠিক এই কারণেই তাঁরা সকলেই দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীতে আসন পেতে বাধ্য। এমনকি এঁদের চেয়ে অনেক সার্থক শিল্পীও, যেমন রুবেন্স, এ দোষে দুষ্ট। যে দোষ আসে তার অবশ্য শুধু সাহিত্যগত নয়, চিত্রগুণগত কৈফিয়ৎও যে আছে সে সম্বন্ধে আলোচনা আগেই করেছি। অর্থাৎ তাঁরা এমন এক আধটি চিত্র উপাদানের উপর অনাবশ্যক ঝোঁক দেন যার ফলে চিত্র বিষয়টি অনাবশ্যকভাবে প্রাধান্য পায়। তা সত্ত্বেও, কোন বিশেষ চিত্র উপাদানের উপর মাত্রাধিক ঝোঁক আর বিষয়বস্তু সম্বন্ধে অত্যধিক মায়া, দুটি এক জিনিস নয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, প্ল্যাস্টিক অর্থে অ্যাঙ্গরের ছবিতে যে রসের সৃষ্টি হয় তাতে থাকে নাটকের অতিরঞ্জন, ইংরেজিতে যাকে বলে মেলোড্রামার প্রসাদ—তারা নাটকীয়ভাবে রেখানির্ভর—কিন্তু প্রকাশভঙ্গীতে বা আবেগে নয়, যেমন নাকি বলা যায় দেলাক্রোয়া সম্বন্ধে। কোন্ ছবিটি প্ল্যাস্টিক অর্থে, কোন্‌টি বা ভাবপ্রকাশে, মেলোড্রামা হয়ে দাঁড়ায়, তার আলোচনা একটু পরে যখন চিত্রের উপাদান উপকরণ, যন্ত্রপাতির উপর দখল সম্বন্ধে কথা হবে তখন করব। যখন চিত্রের

উপাদান উপকরণের উপর শিল্পীর সম্পূর্ণ দখল আসে, যখন ভিন্ন ভিন্ন উপাদানের মধ্যে সামঞ্জস্য প্রতিসাম্য ঘটে, তখন ন্যায্যভাবে চিত্ররসের সৃষ্টি হয়। তখন বিষয়বস্তুর আকর্ষণ প্ল্যাস্টিক ফর্মের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এক হয়। তখন বিষয়বস্তু যাই হোক না কেন ভাবালুতা অথবা নাটকীয় অতিরঞ্জন অর্থাৎ মেলোড্রামার দোষ আসে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, ভান গখ যখন আদিগন্ত সোনালী ফসলের ক্ষেত আঁকেন, তখন অন্যের হাতে সেটি অনায়াসে ঠুনকো সুন্দর ছবি হতে পারত, নবান্নের নানারকম সাহিত্যিক রস আসতে পারত, কিন্তু তা আসেনি। এক কথায় বিষয়বস্তুর প্রসাদে চিত্রটির মূল্য চিত্রবহির্ভূত বা ভেজাল হয়ে যায় না, তাতে যে প্রশস্ত আবেগ আসে তা একান্ত চিত্ররসগত (চিত্র ৩৯)। ছবি যতদূর সম্ভব নাটকীয়, ধর্মভাবাপন্ন, অথবা প্রেমাত্মক, এমন কি যৌন-আবেগনির্ভর হতে পারে, তা সত্ত্বেও তার মধ্যে কিছুমাত্র ভেজাল অশ্লীল বা খেলো ভাব না থাকা সম্পূর্ণ সম্ভব। ঠিক যেমন কোণার্কের সার্থক বন্ধকাম ভাস্কর্যে অথবা নেপালের হে বজ্র তাম্রমূর্তির নরনারীর যৌন আলিঙ্গনে কিছুমাত্র কামগন্ধ নেই। অন্যান্য শিল্প সম্বন্ধে—যেমন সাহিত্যে—একথা যেমন খাটে, চিত্র সম্বন্ধেও তেমনি খাটে। যাঁরা নিতান্ত সংকীর্ণ নীতিবাদী তাঁরাই শুধু মাদাম বোভারি, আনা কারেনিনা, কৃষ্ণকান্তের উইল, বিষবৃক্ষ বা নষ্টনীড়ে অশোভন দুর্নীতি দেখেন ; যদিও এটা ঠিক যে এসবকটি বই-এর বিষয় হচ্ছে ভ্রষ্টা নারীর জীবন, যা নিয়ে দৈনন্দিন জীবনে চলে দুপুরের রসালো আলাপ, খবরের কাগজের হৈ চৈ, বিবাহবিচ্ছেদ আদালতের নিত্য নতুন উত্তেজনা। সবই নির্ভর করে ছবিতে চিত্রের যা কিছু ন্যায্য উপাদান উপকরণ আছে তার প্রয়োগের উপর। যে সব ছবি নিছক বর্ণনাত্মক, তা হয় ফোটোগ্রাফের নামান্তর নয় নিতান্ত মামুলি, গতানুগতিক হয়, তাতে কোন শুদ্ধ রস থাকে না। এখানেও বিচারের বস্তু হয় বাস্তবের সত্যরূপ বা রিয়ালিটি, ফলে নানাগুণে মিশ্রিত থাকার দরুন যে জিনিস নিজের স্বভাবে সত্য হয়, তার থেকে শুধু এক আধটি গুণ বেছে নিলে, শুধু সেই দুএকটি গুণের মাধ্যমে জিনিসটির পরিচয় দিতে গেলে, যেমন জিনিসটি অসত্য হয়ে যায়, তেমনি চিত্রেও এক আধটি বৈশিষ্ট্যের উপর জোর দিলে চিত্রও সত্যরূপ হারায়।

এসব কথা উদাহরণে স্পষ্ট হয়। তিশানের 'এনটুমমেন্ট' ছবিটি ধরা যাক। এই বিরাট বিষয়টি তিশান অন্তত দুইবার দুইটি বড় ক্যানভাসে আঁকেন। একবার ১৫২৫-৩০ সালে, দ্বিতীয়বার ১৫৫৯ সালে। এইখানে

দ্বিতীয় সংস্করণটির আলোচনা করবো। এর বিষয় অত্যন্ত গম্ভীর, ব্যথা ও বিষাদময় ; কিন্তু ছবিতে গাম্ভীর্য এবং দুঃখ দুইই সংযত, সম্ভ্রমপূর্ণ। এ ত গেল যা প্রথমেই নজরে পড়ে, চিত্রের বিষয়বস্তুর কথা। ছবির দিক দিয়ে দেখতে গেলে নজরে পড়ে কয়েকটি ফিগর মিলে একটি গ্রুপ যার মধ্যে সব ফিগরগুলি সুঠামভাবে গ্রথিত হয়ে সৃষ্টি করেছে একটি ডিমের আকারে (ইংরেজিতে ওভ্যাল) রচনা বা কম্পোজিশন ; ফিগরগুলি মিলে নিজেরাই সৃষ্টি করেছে নিজেদের চারপাশে একটি ফ্রেম। সমস্ত ছবিটি কম্পোজিশনের দিক দিয়ে জত্তোর 'খ্রীষ্টের মৃত্যুতে শোক' ছবিটির কথা মনে করিয়ে দেয়, কিন্তু জত্তোর চেয়ে তিশানের ছবিটি অনেক জটিল। ড্রয়িংএ খুব ভালভাবে গতি ও ভাবভঙ্গী ফুটে উঠেছে, কিন্তু কোথাও শোক বা হতাশার আধিক্য নেই। দ্বিতীয় তৃতীয় স্তরের শিল্পীরা এই বিষয়টি নিয়ে সহজেই অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করেন, তার থেকে যতখানি সম্ভব শোক, হতাশা নিংড়ে বার করার চেষ্টার ত্রুটি করেন না। কিন্তু তিশানের ছবিতে গভীর শোকে আচ্ছন্ন থাকা সত্ত্বেও শিষ্যরা যেন হাতের কাজটি সুষ্ঠুভাবে করার ভাবনায় তন্ময়, খ্রীষ্টের মৃতদেহ যত কোমলভাবে কফিনে নামানো যায় তার চিন্তায় মগ্ন (চিত্র ৩৪)। রঙ জহরতের মত জ্বলজ্বল করলেও চোখে লাগে না। পঞ্চাশ ষাট বছর আগেও আমাদের দেশের ধনী গৃহস্থের বধূরা হীরে-জহরতের গহনা পরলে সেগুলির উপর পাতলা মসলিন জুড়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যেতেন, যাতে হীরে-জহরতের দ্যুতি অভদ্রভাবে জ্বলজ্বল না করে, তার কারণ শুধু বাইজীদেরই নাকি অসঙ্কোচে জ্বলজ্বলে ঝকমকে জিনিস পরার রেওয়াজ ছিল। তিশানের ছবির রঙও মসলিনে মোড়া হীরে-জহরতের মত, তার নরম দ্যুতি সারা ক্যানভাসে ছড়িয়ে রচনায় অখণ্ডতা আনে। ডাইনে বাঁয়ে নতদেহ শিষ্যদের পোশাকগুলির রঙ পশ্চাৎপটের চেয়ে উজ্জ্বল, ফলে তাঁদের বসনগুলিও গোল হয়ে গ্রুপটির আরেকটি ছোট ফ্রেমের সৃষ্টি করে। এক কথায়, ছবিটিতে রঙ সমস্ত অংশগুলিকে সংগঠন ক'রে গ্রথিত করে। অবশেষে রঙের সাহায্যে উজোনো তীব্র আলো খ্রীষ্টের শবদেহটি উদ্ভাসিত ক'রে এমনভাবে ক্যানভাসে ছড়িয়ে যায় যার ফলে আলোই নিজস্ব একটি প্যাটার্নের সৃষ্টি করে, রঙের সবকটি মূল্যের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন ক'রে তাদের প্রত্যেকটিকে সমুচ্চ করে, কম্পোজিশনকে সংহত করে। তার ফলে ছবিতে রহস্য, সম্ভ্রম ও ভক্তির ভাব বেড়ে যায়। বিষয়বস্তুর নিজস্ব, মহিমায় ত বটেই, তার সঙ্গে রঙ, আলো, রেখা, স্পেস, সব নিখুঁতভাবে

মিলে, এমন একটি রসসৃষ্টি হয় যার ফলে ছবিটি চিত্রজগতে অন্যতম শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করে। ছবিটির যে নিগূঢ় মানবিক আবেদন আছে, যে গভীর মহত্ত্ব, সমবেদনা, শোক, গাম্ভীর্য, ট্র্যাজেডি আছে, তা সম্পূর্ণভাবে অনুভব করার জন্যে খ্রীষ্টীয়ান হবার দরকার হয় না, অথবা বাইব্‌লের যে অংশটুকুতে ঘটনাটি লিপিবদ্ধ আছে তা বিশেষ করে না পড়লেও চলে। কারণ এই মানবিক আবেদন ফুটে উঠেছে চিত্রের উপাদানগুলির সার্থক যোজনে, যার দরুন রঙ, আলো, রেখা, ঘনত্ব, স্পেস সবই এক অখণ্ড, ঐশ্বর্যময় ছন্দের প্যাটার্নে নিজের নিজের সার্থকতা পেয়েছে। তিশানের এই ছবিটিতে যেমন বিষয়বস্তুটি সংযমে সংহত, অন্যপক্ষে এমন অনেক ছবি আছে যাতে প্ল্যাস্টিক উপাদানের সার্থক যোজনায় তার বিপরীত গুণগুলি ফুটে ওঠে। যেমন, এল্ গ্রেকো বা তিন্তোরেত্তোর ছবির বিষয়বস্তু প্রায়ই হয় উদ্দাম, উত্তাল এমনকি ভয়ংকর, কিংবা সুতীব্র আবেগে তীক্ষ্ণ ; কিন্তু চিত্রে এমন ভাবে সেগুলি রূপায়িত হয় যার ফলে আমরা পাই শান্তি, আরাম, স্তব্ধতা। অপরপক্ষে দেলাক্রোয়ার অনেক ছবিতে বিষয়বস্তুর ঘূর্ণ্যাবর্ত ছবির উপাদানে সংক্রামিত হয়, সংহতি নষ্ট করে, যার ফলে ছবি হয়ে যায় নাটুকে। গিদো রেণি-তে বিষয়বস্তু আর চিত্র উপাদানের ভারসাম্য প্রায় সবটাই নষ্ট হয়ে যায়, ফলে তাঁর কাজে শিল্পগুণ প্রায় থাকেই না। এমন কি শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের সব ছবিতেই যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি নিখুঁতভাবে সঙ্গতি লাভ করে তা নয়। যেমন তিশানের "খ্রীষ্টের মাথায় কণ্টকমুকুট" ছবিটিতে আলোর উপর বেশী ঝোঁক দেখা যায়, রাফায়েলের মত তীক্ষ্ণ রেখা বেশী আসে, প্ল্যাস্টিক ফর্মের পরিবর্তে মেলোড্রামা বা অতিরঞ্জন উঁকিঝুঁকি মারে। পাওলো ভেরোনেজের 'সোডোমদাহনে' চিত্রগত ডিজাইনটি রেখার তরল ছন্দে, রঙে, ঘনত্বে, স্পেসে, অপূর্ব সার্থক হয়েছে, সবই যেন লাবণ্যময় ছন্দে এক মুখে চলেছে : তীব্র নাটকীয় বিষয়বস্তু আর প্ল্যাস্টিক ফর্ম একাত্ম হয়ে গেছে। অন্যপক্ষে তাঁর 'জুপিটারের রিপুনিধন' ছবির গতি ও নাটকে বিন্দুমাত্র চিত্রগুণ আছে কিনা সন্দেহ।

জত্তো আর এল্ গ্রেকোয় ধর্মবিষয়ক চিত্র সবচেয়ে সার্থক হয়েছে। জত্তোর ছবিতে আছে যেমন প্রশান্ত, উদাত্ত, সম্ভ্রম ও ভক্তি এল্ গ্রেকোর ছবিতে তেমনি আছে সুতীব্র আত্মাহুতি, গূঢ়, অধ্যাত্ম রস। তাঁদের চেয়ে নিকৃষ্ট শিল্পীর হাতে এই ধর্মভাব খাপছাড়া, অগভীর, খেলো হয়ে যায়। ফ্রা আঞ্জেলিকোর ছবিতে এই ভাব অনেকটা নীচুপর্দায় নেমেছে। যদিও তাঁর

ছবিতে যথেষ্ট লাবণ্য আছে, তবুও তাতে অলঙ্কারাত্মক প্রসাদ এসেছে ; সাধারণ দর্শক তাঁকে পছন্দ করে তাঁর ছবির ধর্মভাবাপ্লুত কাহিনীর জন্যে। ইটালীতে জত্তোর তুলনায় ফ্রা আঞ্জেলিকোর ছবিতে ধর্মঐতিহ্যের অবক্ষয় যতটুকু দেখা যায়, স্পেনে এল্ গ্রেকোর পর মূরীলোর সময়ে যে তা আরও অনেকদূর গড়িয়ে ছিল তার প্রমাণ মূরীলোয় পাই। এল্ গ্রেকোর গূঢ় অধ্যাত্মবাদ মূরীলোর ছবিতে নিতান্ত অসার ভাবালুতায় পর্যবসিত হয়। মূরীলো তাঁর ছবিতে আলো অনাবশ্যকভাবে উজিয়ে দেন। লেওনার্দোর কাজে যেগুলি নিতান্ত নিকৃষ্ট লক্ষণ সেগুলি নিজেদের ছবিতে এনে শস্তায় কিস্তিমাত করার যে প্রয়াস লূইনী বা আন্দ্রেয়া দেল সার্তো করেন, মূরীলোর কাজে তার যথেষ্ট আভাস দেখা যায়। মুখের কয়েকটি রেখা বিশেষ একদিকে বাঁকিয়ে দিয়ে মূরীলো বিষাদ ফুটিয়ে তুলতেন, কিন্তু সে কাজ হত নিতান্ত ফোটোগ্রাফ ; অন্তরের প্রকাশ বা ষড়ঙ্গে যাকে বলে ভাব তা মোটেই থাকত না। মীলের ছবিতে শুদ্ধ ধর্মভাবের বদলে পাই মানবিক ধর্মনীতি, প্ল্যাস্টিক উপাদানের অসার্থক প্রয়োগ ; ফলে অনিবার্যভাবে ভাবালুতা এসে যায়। করেজজোতে নিছক চিত্রগুণ এবং বিষয়বস্তুর মাহাত্ম্যের ভারসাম্য নষ্ট হয় ; লেওনার্দো আর রাফায়েলের পদাঙ্কে তাঁর চিত্রের নারীরা হয় বড় বেশী সুন্দর ও মিষ্টি ; তিনিও ছবিতে বড় বেশী আলো দিতেন। "জুপিটর এবং অ্যান্টিওপি" অথবা "ডানায়ে" ছবিটিতে রঙ যদিও অত্যন্ত মনোরম, দ্রব্যবস্তুগুলি যদিও পরিষ্কারভাবে ছড়িয়ে সাজানো, সাধারণ প্যাটার্নটি যদিও খুব উঁচুদরের তবুও রঙে গভীরতা কম, যেন উপর উপর লাগানো, বৈচিত্র্য বা ঐশ্বর্য নেই বললেই হয় : আলো বড় বেশী উজোনো : রেখার গতি যেন সবকিছু থেকে একটু বিচ্ছিন্ন ; ড্রয়িং মেদবহুল, বাঁধুনি কম ; কম্পোজিশনও কিছুটা খেলো বলে সন্দেহ হয়। প্ল্যাস্টিক ফর্মের নিখুঁত সুষমায় যতখানি আলো যতখানি মিষ্টত্ব থাকা উচিত তার চেয়েও করেজজোর ছবিতে বেশী আলো বেশী মিষ্টত্ব দেখা যায়।

সাধারণ দর্শকের অমনোযোগী চোখে রেণোয়ারের ছবি চটকদার, সুন্দরপানা ঠেকতে পারে, তার কারণ অনেক সময়ে তাঁর ছবিতে নারীরা তাদের নারীত্ব গুণে ও কাব্যগীতিময় পরিবেশে দর্শককে চট করে আকর্ষণ করে। কিন্তু এক্ষেত্রে রেণোয়ার করেজজোর বিপরীত ; যতই তাঁর ছবি মনোযোগ দিয়ে দেখা যায় ততই তাঁর ছবিতে চিত্রগুণের ঐশ্বর্য ধরা পড়ে, চিত্র নির্মাণে তাঁর অসামান্য দখল দেখা যায় ; তাঁর ছবির চিত্রগত মৌল লাবণ্য চোখে পড়ে। দর্শক স্বীকার করেন যে তাঁর ছবিতে কাব্যরস ও

চিত্ররস অভিন্ন। রেণোয়ারের কোন উৎকৃষ্ট ছবি দেখলে বুঝতে দেরি হয় না যে জগতে যা কিছু সোজাসুজি অথচ সত্যকারের আনন্দ দিতে পারে তার প্রতি ছিল রেণোয়ারের গভীর মমতা ; তা সত্ত্বেও তিনি নিরপেক্ষ, অনাবৃত দৃষ্টির সাহায্যে সৃষ্টির অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে সেগুলির সম্বন্ধ নিরূপণ করতে পারতেন, অন্যান্য বস্তুর মৌল গুণগুলিও টেনে বার করতে পারতেন। ফলে, তাঁর ছবিতে কাব্য থাকত, কিন্তু ভাবালুতাদোষ বা কাব্যপনা থাকত না। তাঁর ছবিতে প্ল্যাস্টিক ফর্ম ও বিষয়বস্তু অভিন্নাত্মা হত।

অনেক শ্রেষ্ঠ চিত্রে সূক্ষ্ম, সুকুমার, কোমল, লাবণ্য, এমনকি কিছুটা ভঙ্গুর ভাবও থাকা সম্ভব, যেমন ভেলাস্কেথের 'শিশু মার্গরীত' চিত্রে অথবা কাংড়ার বিখ্যাত 'শ্রীকৃষ্ণের কানামাছি খেলা' চিত্রে কিংবা তেহরি-গাড়ওয়ালে 'কালীয় দমন' চিত্রে। এসব চিত্রে চিত্র উপাদানের উপর শিল্পীর এত বেশী দখল দেখা যায় যে তার গৌরবে বিষয়বস্তুর মাহাত্ম্যও বেড়ে যায়।

গত তিন চারশ বছরে ইওরোপীয় চিত্রকলায় যে প্রগতি দেখা যায় তার উৎস হচ্ছে রণেসাঁস বা আবার-জন্মানো যুগে প্রাচীন গ্রীক রোমক সংস্কৃতি সম্বন্ধে উৎসাহ। এ সময়ে প্রাচীন গ্রীস ও রোমের ভাস্কর্যের উপর শিল্পীদের নজর পড়ে ; তার উপর ভিত্তি করে চিত্রের বিষয়বস্তু স্থির হয়। যতদিন এই ক্ল্যাসিক প্রভাব সম্পূর্ণ পরিপাক হয়ে, রণেসাঁস যুগের হাওয়ার সঙ্গে মিশে শিল্পীদের নিজস্ব ভঙ্গীর মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠল, ততক্ষণই সে প্রভাব মঙ্গলময় হল (চিত্র ৪৭)। কিন্তু এই পরিপাক সবক্ষেত্রে সমানভাবে হল না। যেমন, জর্জনে'র ছবিতে শিল্পীর নিজস্ব ব্যক্তিত্বের সঙ্গে গ্রীক ঐতিহ্য এবং উত্তরাধিকার খুব মানিয়ে গেল কিন্তু মিকেলাঞ্জেলো বা মান্তেনিয়ার ছবিতে সব সময়ে এরকমটি হল না ; ফলে মনে হয় যেন তাঁরা পরিশ্রম স্বীকার না করে সরাসরি ক্ল্যাসিকাল ভাস্কর্যকে ছবিতে এনে বসিয়েছেন, যার দরুন রেখা, রঙ ও স্পেসের পুনর্সৃষ্টির অভাবে তাঁদের ছবি সত্যকারের জীবন্ত হল না। অন্যপক্ষে ক্লোদের ছবিতে ভার্জিলের জমক ও রোমান্টিক রহস্য খুবই সার্থক হল, তাতে কোন ভেজালভাব রইল না ; দেখে মনে হয় না যে নিছক অনুকরণের পিছনে অলস কল্পনা আশ্রয় নিয়েছে, প্রাচীন যুগের আত্মাকে ক্লোদ ভিন্ন এক জগতে সত্যই বাঁচিয়ে তুললেন, ক্ল্যাসিক জগৎকে রোমান্টিক কল্পনায় জীবন্ত করে তাকে এমন যথোচিত চিত্ররূপ দিলেন যার ফলে তাঁর ব্যক্তিত্বও ফুটে উঠল। অথচ

ফরাসী শিল্পী দাভিদেই আবার ক্ল্যাসিসিজম বাঁধাগৎ হল মাত্র, তাঁর ছবি হল শুকনো হাড়ের খটখটানি। অ্যাঙ্গরে ক্ল্যাসিক ঐতিহ্যের স্পষ্ট উচ্চারণ আছে। রাফায়েলের মত অ্যাঙ্গরও ক্ল্যাসিক ভাস্কর্যের সুস্পষ্ট কাটাকাটা বিস্তারিত রেখার মূল্য বুঝতে পারলেন; তাঁর ছবিতে তার ব্যবহার হল তেজোময়, ছবিতে ফুটল তাঁর ব্যক্তিত্ব। কিন্তু দাভিদের ক্ল্যাসিসিজমে তাঁর ব্যক্তিস্বরূপ ফুটল না, এল না অন্তর্দৃষ্টি, ছবি হল গতানুগতিক মামুলি ; বিষয়বস্তুতে তিনি পুরনো লক্ষণগুলি শুধু নকল করে গেলেন মাত্র। অবশ্য এটা ঠিক যে তাঁর নীরক্ত, যথাযথ নকল ব্রিটিশ প্রিরাফায়েলাইটদের নিতান্ত আত্মসচেতন, প্রাচীনের ঝুটো নকলের চেয়ে অনেক উঁচুদরের হল ; কেন হল তার উত্তর অবশ্য খুব সোজা। দাভিদ প্রিরাফায়েলাইটদের চেয়ে নিজের কাজ অনেক ভাল বুঝতেন, তাঁর তুলিও অনেক ভাল চলত। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কৃষ্ণলীলা বিষয়ক চিত্রের সঙ্গে প্রিরাফায়েলাইটদের কাজের তুলনা করা যায়। অবনীন্দ্রনাথের কৃষ্ণলীলা চিত্রে যে প্রাচীন রাজপুত ছবির ভাব আনার চেষ্টা আছে তা কিছুটা বাহ্য এবং ঠুনকো। তাছাড়া শিল্পীর পক্ষে সবচেয়ে ক্ষতিকর, নিজের কাজে প্রাণপণ চেষ্টা না করে, সে সম্বন্ধে হাল্‌কা, দায়িত্বহীন খেয়ালীভাব পোষণ করা। অবনীন্দ্রনাথ তাই করলেন। রাজপুত ধাঁচে ছবি এঁকে তার তলায় পারসী হরফের নকল করে লিখলেন শ্লোক, যাতে পুরনো পুরনো দেখায়। তার তুলনায় বরং নন্দলাল বসুর দুর্গাপ্রতিমা প্রভৃতি রেখাচিত্র দাভিদের কথা স্মরণ করায়। কিন্তু দাভিদের তুলনায় নন্দলাল বসুর রেখাচিত্রে তাঁর ব্যক্তিস্বরূপের ছাপ পড়ল আরও কম, তা হল মুখ্যত নিপুণ, প্রাণহীন, কুশলী কাজ। সাহিত্যে এর তুল্যমূল্য উদাহরণ পাওয়া যায়। অনেক সাহিত্যিক তাঁদের রচনায় ইওরোপীয় সঙ্গীতের ধ্রুপদী কোয়ার্টেট বা সিম্ফনির তুল্যমূল্য ফর্ম আনার চেষ্টা করেছেন। যেমন টি এস এলিয়ট তাঁর 'ওয়েস্টল্যাণ্ড' কাব্যে, অথবা টমাস মান তাঁর 'ডাঃ ফস্টাস' উপন্যাসে সিম্ফনির ফর্ম এনেছেন, টি এস এলিয়ট এনেছেন কোয়ার্টেটের ফর্ম তাঁর 'ফোর কোয়ার্টেট্‌স্' কবিতা সমষ্টিতে। এসব সাহিত্যিক রচনা সঙ্গীতের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে রূপায়িত হয়ে সার্থক হয়েছে। অপর পক্ষে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'অর্কেস্ট্রা' অথবা বিষ্ণু দে'র 'জন্মাষ্টমী' এ বিষয়ে অসার্থক। তাদের আন্তরিক ফর্মে সিম্ফনির সঙ্গে কিছু সম্বন্ধ নেই, ছন্দের যৎসামান্য চটুল বৈচিত্র্য যা আছে তা নিতান্তই ভাসাভাসা, উপরের ফ্যাশনদুরস্ত বসন, তার সঙ্গে ভিতরের কাঠামোর যা নাকি অর্কেস্ট্রাসঙ্গীতের মূলমন্ত্র, কোন সম্বন্ধই

নেই। অর্কেস্ট্রাসঙ্গীতের নিতান্ত বাহ্যিক কতগুলি ছন্দোবৈচিত্র্য মাত্র টেনেবুনে লাগানো হয়েছে।

শুধুমাত্র অপটুত্ব বাদ দিলে চিত্র-উপাদানের সবকটি অঙ্গের যথার্থ প্রয়োগ না হলে যে সব অভাব হয় তার ফলে চিত্রে এক বা ততোধিক উপকরণের উপর অনাবশ্যক ঝোঁক পড়ে। তার কারণ এই যে যে-শিল্পীর নিজের কিছু বক্তব্য নেই, অথচ কিছুটা কারিগরি নৈপুণ্য ও দক্ষতা আছে তিনি অন্যে যেটা আরও ভাল ক'রে ক'রে গেছেন তার শুধু নকল করতে পারেন। সাধারণত তিনি পূর্বজদের কোন বিশেষ ভঙ্গী বা বৈশিষ্ট্যকে সত্যভ্রমে আঁকড়ে ধরেন, আসল জিনিসটি থেকে সেই খণ্ডটুকু বার করে নিয়ে তাকে মূলমন্ত্র করেন। ফলে যেটুকু ধার করেন সেইটুকুই সর্বস্ব হয়, অন্য সব লক্ষণগুলি অবহেলিত হয়। যে শিল্পী তাঁর কারিগরিতে যত নিপুণ, অনভিজ্ঞ দর্শককে তিনি তত ঠকান। সুতরাং কোন শিল্পী সম্বন্ধে মোটামুটি বিচার করতে হলে চিত্রকলার ইতিহাস জানা দরকার। যেমন অবনীন্দ্রনাথের রাজপুত ও মুঘল ধাঁচের ছবি দেখে রাজপুত ও মুঘল মিনিয়েচারের প্রতি অনভিজ্ঞ দর্শকের অশ্রদ্ধা আসা স্বাভাবিক; অবনীন্দ্রনাথ রাজপুত ও মুঘল মিনিয়েচারের অসামান্য রঙের জমক, শক্তি, জ্যামিতি, অপূর্ব ডিজাইন বাদ দিয়ে নিলেন তার অপেক্ষাকৃত নিরেস গুণগুলি, অর্থাৎ তাদের ঠুনকো, পেলব কাব্যপনা, সুন্দরপানা, দুর্বল, নীরক্ত দেহ; তাদের কাব্যময় পরিবেশ। ভারতীয় চিত্রকলার ইতিহাসের সঙ্গে যাদের পরিচয় নেই, সেইরকম অনভিজ্ঞ দর্শকের চোখে অবনীন্দ্রনাথের ছবিই হল রাজপুত মুঘল মিনিয়েচারের প্রতীক (চিত্র ৩৫)। তাঁরা শস্তার নকলকে আসলের তুল্যমূল্য করতে শিখলেন। অবনীন্দ্রনাথ যে জ্ঞানত চাতুরি করেছেন তা নয়; তাঁর খামখেয়ালী মনই তাঁকে দিয়ে খেলা খেলিয়েছে। অথচ দেখুন তাঁর শাজাহান চিত্র, যেখানে তিনি আগ্রা ফোর্ট থেকে তাজমহলের দিকে চেয়ে আছেন, পায়ের কাছে জাহানারা, তা চিত্র হিসেবে কত সার্থক।

রঙ

আগেই বলেছি চিত্রে রঙই হচ্ছে সর্বপ্রধান ও সবচেয়ে মৌল প্ল্যাস্টিক উপাদান। রেখা, আলো, জমি বা স্পেস প্রভৃতি অন্যান্য উপাদান, রঙের রকমফের অবস্থা, অথবা রঙেরই বিভিন্ন দিক বলা যায়। রঙের দরুন ছবিতে যে গুণ বা ভাব আসে তা রঙের একান্ত নিজস্ব সত্তা থেকে আসে, যে সত্তা ছবির অন্যান্য নানা অঙ্গ উপকরণের অপেক্ষা রাখে না, যা নিতান্ত স্বাধীন। আমরা সকলেই জানি, এবং ব্যাপারটা খুব সাধারণ পরীক্ষাতেও প্রমাণ হয় যে, কোন কোন রঙে শান্ত স্তব্ধ বিশ্রামের ভাব আসে, আবার কোন কোন রঙ নিজেকে বড় জাহির করে, ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনার সৃষ্টি করে। কোন মহিলা ঠোঁটে আশমানী রঙের ওষ্ঠরঞ্জনী মাখার কথা কল্পনাও করতে পারেন না। অথবা ছবির বিশেষ বিশেষ রঙ আমাদের চোখকে যেমন যেমন অনুভূতি দেয়, ইন্দ্রিয়কে যে ভাবে প্রভাবিত করে, ছবি ভাল লাগা মন্দ লাগা তার উপর অনেকখানি নির্ভর করে, আপাতভাবে অথবা চিরস্থায়ীভাবে, রঙের উপর তার আবেদন নির্ভর করে। যেমন রাফায়েলে নিছক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ হিসেবে রঙের ব্যবহার খুব কমই সার্থক হয়েছে, ফলে তাঁর চিত্রের অন্যান্য প্লাস্টিক উপাদান থেকে রঙ যদি টেনে বার করে নেওয়া সম্ভব হত তাহলে হয়ত দেখা যেত সস্তার গালচে বা কার্পেটে যে রঙ ব্যবহার হয় রাফায়েলের রঙ প্রায় তাই—অর্থাৎ হয় ম্যাড়মেড়ে, নয় বড় বেশী উজ্জ্বল। অপরপক্ষে জর্জনে, সেজান বা রেণোয়ারে রঙের সমূহ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আবেদন ছবির অন্যসমস্ত জটিল কাজের মধ্যে ব্যাপ্ত থেকে তাদের গুণ আরও বাড়িয়ে দেয়। আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথের ছবিতেও রঙ এইভাবে কাজ করে। কোন সুন্দর চরিত্রবান ব্যক্তি যদি সুপুরুষ হন, তবে তাঁর সুদর্শন কান্তি যেমন তাঁর বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, চরিত্রের মাধুর্যকে আরও গরীয়ান করে, যার কৃপায় সে সব সদ্‌গুণ আমরা আরও ভাল করে অনুভব করতে পারি, আরও খোলা মনে গ্রহণ করতে পারি, তেমনি ছবিতে রঙ সার্থক হলে, ছবির অন্যান্য অঙ্গ উপকরণগুলিও আমরা অনেক সহজে বুঝতে পারি, অনুভব করতে পারি, গ্রহণ করতে পারি।

বৈচিত্র্য, ঐশ্বর্য এবং হার্মনি থাকলে রঙের 'গুণ' অনেক বেড়ে যায়;

শুধু রঙ নয় ছবির বিভিন্ন অংশে, খণ্ড খণ্ড ভাবে, ছবির বিভিন্ন উপাদানে, সমগ্র ছবিতেই নতুন মূল্য আসে। জর্জনে, তিশান, রুবেন্স, রেণোয়ার, সেজানের ছবির সামান্য সামান্য জিনিসে পর্যন্ত রঙের বিচিত্র বিভঙ্গ, দ্যুতি, ছটার যেন শেষ নেই; সামান্য কমলালেবুতে, পেয়ালায়, হাতে অথবা একগোছা চুলে রঙের বৈচিত্র্য যেন ফুরোয় না। অথচ তারই মধ্যে নানা বিভঙ্গ নিয়ে রঙের একেকটি গোছা তাদের নিজস্ব স্বাধীন সত্তা বজায় রাখে। এইভাবে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য, স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে একাত্মতা, বারবার ঘুরে ঘুরে এসে, আস্তে আস্তে, ছবির বড় বড় অংশ তৈরি করে, ক্রমে ক্রমে গোটা ছবিটি তৈরি হয়। ছবিটি হয় রঙের সিম্ফনি। প্রত্যেকটি রঙ ইন্দ্রিয়কে স্বতন্ত্রভাবে যে তৃপ্তি দেয়, তার উপরে অন্যান্য নানা রঙের সম্বন্ধপাতে, তাদের নিজস্ব ও সমষ্টিগত মূল্য অনেকগুণ বেড়ে যায়। একদিকে যেমন প্রতিটি রঙ স্বতন্ত্রভাবে অন্য সব রঙকে উস্কিয়ে দেয়, তেমনি সবগুলি রঙ একসঙ্গে মিলে আবার প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র রঙকে সমুজ্জ্বল করে।

আধুনিক চিত্রশিল্পীদের চিত্রে রসসৃষ্টির কাজে রঙ কতখানি স্থান অধিকার করে তা বুঝতে হলে ভিনিশান শিল্পীরা, বিশেষ করে জর্জনে, তিশান ও তিন্তোরেত্তো, রঙ কিভাবে ব্যবহার করেছেন তার সঙ্গে পরিচয় দরকার। সেই সঙ্গে আমাদের দেশে অজন্তা শিল্পীরা রঙ কিভাবে ব্যবহার করেছেন তাও মনে রাখা দরকার। এইসব শিল্পীরা এমন সব রঙ ব্যবহার করেছেন যা স্বভাবতই তৃপ্তি ও আনন্দ দেয়, তার উপর আবার তাঁরা এমনভাবে সেইসব রঙ ব্যবহার করেছেন যাতে বৈচিত্র্যও যেমন আসে, তেমন আসে হার্মনি। ফল হয় অত্যন্ত জমকালো। ভিনিশান ঐতিহ্যকে রুবেন্স, আঠারো শতকের ফরাসী শিল্পীরা, দেলাক্রোয়া, ইমপ্রেশনিস্টরা যথেষ্ট সমৃদ্ধ করেন; রেঁণোয়ার তাকে আরও সমৃদ্ধ করেন। ফলে তাঁর ছবির জমির অপূর্ব ঐশ্বর্যময় অলঙ্কারে রেণোয়ার অদ্বিতীয়। অন্যপক্ষে তাঁর রঙ যেহেতু অত ঐশ্বর্যময়, অত বেশী ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, যেহেতু তারা অত বেশী অভিভূত করে, সেই অনুপাতে তাঁর রঙ, তাঁর ছবির স্থাপত্যশক্তি খানিকটা কমিয়ে দেয়। সেই তুলনায় আমরা সেজানে অনেক বেশী শক্তির পরিচয় পাই। অজন্তার ছবির রঙে পোস্ট-ইম্‌প্রেশনিস্ট রীতি কি অদ্ভুতভাবে বর্তমান তা বোঝা যায় ইউনেস্‌কো প্রকাশিত অজন্তা অ্যালবামে অথবা গোলাম ইয়াজদানির চারখণ্ড বইয়ে।

অপরপক্ষে এঁদের তুলনায় লেওনার্দোর ছবিতে রঙের কিছুটা বন্ধ্যাত্ব

দেখা যায়। লণ্ডনে এবং প্যারিসে একই 'ভর্জিন অব দা রক্‌স্' ছবির যে দুটি সংস্করণ আছে, তাতে রঙের আবেদন তত মুখর, গম্‌গমে নয়। যে ভাবে রঙ ছবিটিতে ছড়িয়ে আছে তাতে উদ্ভাবনী কল্পনার অভাব চোখে পড়ে ; মনে হয়, শিল্পী রঙের নানা বৈচিত্র্য ও হার্মনির সম্ভাবনা সম্বন্ধে উদাসীন। ছবিটিতে রঙ মুখ্যত টোন হিসেবে প্রকাশ পায় ; যখন টোনটি ফিকে হয় তখন নেহাৎ ঝক্‌ঝক্ করে, যখন গাঢ় হয় তখন কাদাকাদা মত দেখায়। রঙ ও রঙের সমন্বয় বিষয়ে ত্রুটি তাঁর এই ছবিটির প্ল্যাস্টিক ফর্মের মূল্য ব্যাহত করে।

এখানে মনে রাখা একান্ত দরকার যে রঙের ঔজ্জ্বল্য আর রঙের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ঐশ্বর্য অথবা সুখদায়কতা এক জিনিস নয়। যেসব রঙ শুধুই উজ্জ্বল, অথচ বর্ণাঢ্য বা গভীর নয়, তা শুধু নিতান্ত উপরের চাকচিক্যই হয়, নিতান্ত ডগ্‌ডগে হয় চোখে এবং রুচিতে লাগে। প্রাচীন চিত্রকরদের মধ্যে লোরেনৎসো মোনাকো বা বালডুং গ্রীয়েন, আধুনিকদের মধ্যে কিস্‌লিং-এর, ছবির উজ্জ্বল রঙে, না আসে দ্যুতি না আসে জমক ; কিন্তু দ্যমিয়ে বা রেম্‌ব্রাণ্টে রঙ যদিও অনেক চাপা তবুও তবুও যেন দ্যুতি বিচ্ছুরিত হয় ; চাপা রঙ সত্ত্বেও তাঁদের ছবি মোটেই ম্যাড়মেড়ে বা দীনহীন দেখায় না। নন্দলাল বসুর অনেক ছবি খুবই রঙীন, এমনকি রঙ-চঙেও বলা যায়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কালো এবং বেগ্‌নে কালিতে আঁকা ছবি থেকে যে দ্যুতি, জমক বেরোয়, তাঁর ছবি থেকে তা বেরোয় না। গোপাল ঘোষের একেকটি ছবিতে যেন সমস্ত উজ্জ্বল রঙের ভাণ্ড উপুড় করে ঢেলে দেওয়া হয়েছে, তবুও তাদের মূল্য যামিনী রায় অথবা বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের যে কোন গাঢ় সবুজ গাছের চেয়ে হয়ত কম।

ইন্দ্রধনু বা স্পেক্‌ট্রামের সবকটি রঙের প্রয়োগেই যে রঙের বৈচিত্র্য আসে তা মোটেই নয়। রেম্‌ব্রাণ্টে গাঢ় রঙের যে সব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিভঙ্গ আছে তাতে রঙের অসীম বৈচিত্র্যের আভাস আসে। পিয়েরো দেলা ফ্রাঞ্চেস্‌কা এক ধরনের রূপালী নীল খুব ব্যবহার করতেন, কিন্তু সেই রূপালী নীল রঙে এত অসংখ্য পর্দা আনতেন, তাতে আলো ছায়ার এমন বিচিত্র স্পর্শ লাগত, যে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় তাঁর রঙের ভাণ্ডার ঐশ্বর্যে ভরপুর। যতক্ষণ না খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করা যায় ততক্ষণ বোঝা যায় না তিনি রঙের ব্যবহারে কত মিতব্যয়ী ছিলেন। পিকাসো তাঁর ব্লু পিরিয়ডের ছবিতে পিয়েরো দেলা ফ্রাঞ্চেস্‌কার নীল আশ্চর্য নৈপুণ্যে ব্যবহার করেছেন (চিত্রে ২৮)। দেলাক্রোয়ার কোন ছবি থেকে রঙগুলি তুলে যদি একে

একে পাশাপাশি রাখা যেত তাহলে তাঁর ছবিতে কত রকমের যে বিভিন্ন রঙ আছে তা বোঝা যেত, কিন্তু তা সত্ত্বেও পিয়েরোর কোন ভাল ছবি দেলাক্রোয়ার ছবির পাশে টাঙালে স্বীকার করতেই হয় যে বর্ণশিল্পী হিসেবে পিয়েরোই বড়।

রঙের ঐশ্বর্য আর রঙের বৈচিত্র্য আলাদা। রঙের ঐশ্বর্য কথাটি যখন ব্যবহার করি, তখন তাতে ঠিক বৈচিত্র্য বোঝাতে চাই না, যদিও, যখন রেণোয়ারের রঙের ঐশ্বর্যের কথা বলতে গিয়ে পেরূজীনোয় ঐশ্বর্য নেই বলি, তখন দুটি কথা হয়ত গুলিয়ে যেতে পারে। রঙের ঐশ্বর্য কথাটা আমরা আরও একটি অর্থে অনেক সময়ে ব্যবহার করি ; যখন রঙের রসালো টসটসে সজল ভাবটি বোঝাতে চাই, যা নাকি 'শুকনো' ভাবের বিপরীত। শ্রেষ্ঠ বর্ণশিল্পীদের ছবিতে রঙের এই রসালো গুণটি সর্বদা থাকে যেমন তিশানে, কনস্টেব্‌লে, দেলাক্রোয়ায়, রেণোয়ারে, বাশোলি চিত্রে, রবীন্দ্রনাথে। এর বিপরীত গুণ অর্থাৎ শুষ্কতা, যে নির্জলা নিন্দার যোগ্য তা নয়। পুস্যাঁ অতি মহৎ শিল্পী, এবং বর্ণশিল্পী হিসেবে তাঁর স্থান যথেষ্ট উঁচুতে, কিন্তু তাঁর ছবিতে রঙ প্রায় সর্বদাই 'শুকনো'। সুতরাং এই যে তফাতের দাঁড়ি টানছি, তার মানে এ নয় যে একটিকে বলছি ভাল, আরেকটিকে খারাপ ; কারণ, চিত্রে রসশাস্ত্রসম্মত অনেক ক্ষেত্রই সম্ভব যেখানে শুকনো রঙ ছবিতে শক্তি দেয়। মন্তিচেল্লির মত শিল্পী ছবিতে খুব রসালো টসটসে রঙ এনেও প্রথম শ্রেণীর চিত্রশিল্পী হতে পারেন না। আবার পুভিস দ্য শাভান যদি রেণোয়ারের মত টসটসে, 'রসালো' রঙ ব্যবহার করতে যেতেন, তাহলে তাঁর নিজস্ব ফর্মের বৈশিষ্ট্য সম্ভবত ক্ষতিগ্রস্তই হত।

রঙের গুণের গূঢ় তফাৎগুলি তখনই ধরা পড়ে যখন রঙের সঙ্গে আমরা আলো, কম্পোজিশন, মডলিং ইত্যাদির সম্বন্ধ বিচার করি। আলোর সঙ্গে রঙ মিশে সৃষ্টি হয় বায়ুমণ্ডল বা আবেশ, ইংরেজিতে যাকে বলে অ্যাটমসফিয়র। রসবিচারে বায়ুমণ্ডল খুব বড় স্থান অধিকার করে, যেমন ভিনিশান শিল্পীদের, রেমব্রাণ্টের, ইমপ্রেশনিস্টদের ছবিতে। তাছাড়া রঙের উপর আলো সরাসরি কাজ করে, যার ফলে আলো রঙের ভিতর থেকে দ্যুতি বা জ্বলজ্বলে ভাব টেনে বার করে তার ঐশ্বর্য বাড়ায়। যে ছবিতে এইভাবে রঙের দ্যুতি ভিতর থেকে বেরোয় না, অর্থাৎ রঙের ল্যুমিনসিটি নেই, বুঝতে হবে সে ছবির প্ল্যাস্টিক ফর্মে গুরুতর গলদ আছে। বাস্তবজগতে আলোর কমবেশীর উপরে রঙের গুণাগুণ বদলায়,

আর এই যে বদলায় সেই সত্যটিকে ছবিতে ঠিকমত কাজে লাগাতে পারাই হচ্ছে শিল্পীর বাহাদুরি ; তাই দেখে বলা যায় শিল্পী তাঁর মালমশলা কতখানি নিজের আয়ত্তে এনেছেন। যখন রঙ আর আলোর যোটক সার্থক হয় না, তখন চিত্রে বাস্তবের সত্যরূপ প্রতিফলনে হানি ঘটে। কারণ রঙের উপর আলো খেলে যে বৈচিত্র্য ও ঐশ্বর্য আসা উচিত —দৃশ্যমান জগতে যেমন আসে —তা আসে না, ছবিতে স্থাণুত্ব আসে। রঙের মধ্যে নতুন নতুন বিচিত্র সুর, হার্মনির সৃষ্টি না করে তখন আলো যেন উল্টে রঙকে মুছে দেয়, রঙের জায়গায় নিজেই চড়াও হয়ে বসতে চায়। লেওনার্দো আর রাফায়েলের ছবিতে অত্যধিক আলো এসে আলোছায়ার বৈষম্যকে বড় বেশী প্রকট করে ; উপরন্তু রঙকে প্রাণবন্তভাবে কাজ করতে বাধা দেয়। রেমব্রাণ্টে আলোছায়ার বৈষম্য আরও বেশী স্পষ্ট, আরও বেশী প্রকট, প্রথমেই তা চোখে পড়তে বাধ্য। কিন্তু তিনি রঙের রেশ, আভাসগুলি এমন নৈপুণ্যে ফুটিয়েছেন যে তাঁর কিয়ারসক্যুরো বা ছায়াতপ রঙকে আরও উজিয়ে দেয়, রঙের স্বল্পতাকে ঢেকে দেয় না। অর্থাৎ যেটুকু রঙ আছে তার সবটুকুকে পুরোমাত্রায় উদ্ভাসিত করে।

রঙের সঙ্গে মিশে আলো যে বায়ুমণ্ডল বা আবহাওয়া আবেশের সৃষ্টি করে, তার সবচেয়ে সার্থক প্রয়োগ দেখা যায় ভিনিশান, বার্বিজঁ ও ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পীদের কাজে। তারও আগে, চোদ্দ শতকের ফ্লোরেন্টাইন শিল্পী মাজাচ্চোর কাজেও দেখা যায়। বাস্তব জগতে বায়ুমণ্ডলের দরুন দূরের বস্তু চোখে ঝাপসা দেখায়, তাদের সীমারেখাগুলি অস্পষ্ট হয়। সাধারণত প্রকৃতিতে দূরত্বের দরুন যে অস্পষ্টতা বা কুয়াশার আমেজ (অথচ কুয়াশা মোটেই নয়) আসে, মাজাচ্চো রঙের সার্থক প্রয়োগে সেই ভাবটিতে ষড়ঙ্গের মূল্য আনেন (চিত্র ২৭)। প্রিমিটিভদের চিত্র ছাড়া, প্রায় সমস্ত চিত্রশিল্পীরা দূরের জিনিসের সীমারেখাগুলি অস্পষ্ট, ঝাপসা দেখিয়েই ক্ষান্ত হন, কিন্তু যে ভাস্বর রঙীন বায়ুমণ্ডলে সমস্ত প্রকৃতি আসলে ভাসে, সে রকম বায়ুমণ্ডল খুব কম চিত্রেই দেখা যায়। যেমন হুইসলারে বায়ুমণ্ডল হয়েছে নিছক কুয়াশা ; টার্নারের ছবিতে তা মেলোড্রামা বা অতিরঞ্জনের ভাব সৃষ্টি করে আনে ঝুটো রোমান্স ; কিন্তু ঠিক মাত্রামত যখন ব্যবহার হয়, যেমন হয়েছে ক্রোদে বা ভিনিশানদের ছবিতে, তখন তার নিজস্ব ষড়ঙ্গজাত মূল্য হয়, ছবিতে লাবণ্য আসে। ক্রোদে বায়ুমণ্ডল সোনালি, ভিনিশানদের ছবিতে সোনালির সঙ্গে ব্রাউন, কোরোতে রূপালী। ঈষৎ অস্বচ্ছ বায়ুমণ্ডল, যাকে ইংরেজিতে বলে হেজ,

তার চাপা দ্যুতিতে সমস্ত বস্তুকে এক স্বচ্ছপ্রায় খোলসের মধ্যে রাখে, সেই বায়ুমণ্ডল আবার প্রতিটি জিনিসের বিশিষ্ট রঙের সঙ্গে হয় মেশে, নয় তাকে বর্ণাঢ্য করে ছবির অলঙ্কারাত্মক গুণ বাড়ায়, কম্পোজিশন বা রচনার বুননে সাহায্য করে ; এইভাবে ছবির প্ল্যাস্টিক ফর্ম সৃষ্টির কাজে তার স্থান বিশেষ মূল্যবান হয়।

আলোয় মিশে রঙ যেমন আবহাওয়া ও বায়ুমণ্ডলের সৃষ্টি করে, তেমনি ড্রয়িং এবং কম্পোজিশনের কাজেও রঙের স্থান ততোধিক মূল্যবান। এর আলোচনা পরে হবে। এখানে রঙের আরেকটি বিষয়ে একটু আলোচনা দরকার। চিত্রে রঙ কোন বস্তুর আসল ম্যাস্ বা কাঠামোর অঙ্গস্বরূপ মনে হতেও পারে নাও হতে পারে। ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি ছবিতে কোন বস্তুর ঘনত্ব এবং কঠিন ভাব দেখাতে হলে, আলো বা ছায়া ক্রমিকভাবে বাড়িয়ে দিতে হয়। এই ধরনের মড্‌লিং-এর পরাকাষ্ঠা হয় লেঅনার্দো আর মিকেলাঞ্জেলোর কাজে, তাঁদের পর থেকে ছবিতে বস্তুর ঘনত্ব দেখাতে হলে শিল্পীরা তাঁদের অনুসরণ করেন। কিন্তু শিল্পী যেসব ক্ষেত্রে বস্তুর ঘন গড়নের প্রকাশের কাজে রঙকে কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ করেন, সেসব ক্ষেত্রে মড্‌লিং-এর প্ল্যাস্টিক মূল্য আরও বেড়ে যায়। বস্তুর গঠনের কাজে রঙের প্রকৃত মূল্য ভিনিশানরাই প্রথম আবিষ্কার করেন। তাঁদের পরে, শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের কাজে, বিশেষ করে কন্‌স্টেব্‌ল, দেলাক্রোয়া, ভেলাস্কেথ, এল্ গ্রেকো, রেণোয়ার এবং সেজানের ছবিতে, এর অবদান খুব বেশী হয়। জর্জনে, তিশান বা তিন্তোরেত্তোতে যে-কোন ঘন বস্তুর ঘনত্ব এবং তার রঙ আলাদা করা যায় না ; দুটি অভিন্ন। মনে হয় বস্তুটির বস্তুত্ব যেন রঙের মধ্যে দিয়ে ঘন হয়ে ফুটে উঠেছে, অর্থাৎ রঙ যেন ঘন বস্তুটির অন্তরে প্রবেশ করে তাকে পরিব্যাপ্ত করেছে ; ঠিক যেমন পাথর আর তার কাল্‌চে বা ধূসর রঙ অভিন্ন। উদাহরণ স্বরূপ তিশানের 'দস্তানা হাতে লোক'টির কথা ধরা যাক। ছবিটি দেখে মনে হয় রঙ থেকেই যেন ছবির রূপ বা ফর্মটি আস্তে আস্তে বেরিয়েছে। লেঅনার্দোর বেলায় কিন্তু ঠিক উল্টো। লেঅনার্দো যেভাবে ছবিতে ঘনত্ব, গভীরত্ব, ওজন আনেন, তার সঙ্গে রঙের বিশেষ সম্পর্ক নেই। আসলে রঙেরই প্রাচুর্য নেই ; যাও বা আছে তা অনেকটাই উপর-উপর। অ্যাঙ্গরের ছবি দেখে মনে হয় শিল্পী ছবির ফর্মটি সম্পূর্ণ তৈরি এবং মড্‌ল্ করে নিয়ে তারপর রঙের কথা ভাবেন ; ফলে, গোড়া থেকে বস্তুর নির্মাণের কাজে রঙ ব্যবহৃত হলে ছবিতে যে ঘনত্ব, ওজন,

গভীরত্ব আসে, তা অ্যাঙ্গরের ছবিতে নেই (চিত্র ২০)। তাঁর রঙ অবশ্য প্রায়ই আরামদায়ক হয়, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা হয় অলঙ্কার উৎপ্রাস অথবা প্রসাধন দ্রব্য। ছবিতে তার অনিবার্যতা কম।

জত্তোর ছবিতে আমরা আরেক ধরনের রঙের কাজ পাই ; সে রঙ যেন সব কিছুকে জড়িয়ে ধরে রাখে। জত্তোর রঙ ভিনিশান অর্থে ছবির গড়নের সঙ্গে অভিন্নাত্মা নয়। যদিও তার রঙ ছবির সাধারণ ফর্মের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত (চিত্র ২৪ [ক])। তাঁর ছবিতে বায়ুমণ্ডল সাধারণত একেবারে স্বচ্ছ, তাতে আবরণের লেশমাত্র চিহ্ন নেই, রঙগুলি সেই স্বচ্ছতায় কন্‌কনে আকাশের তারার মত ঝক্‌ঝক করে। ভিনিশানদের ঠিক উল্টো ; তাদের ছবিতে বায়ুমণ্ডল খুব ঈষৎ অস্বচ্ছ, তাতে দূরত্বের ঝাপসা ভাব বর্তমান, যেন দিনের আলো ঘন হয়ে গেছে, যার মধ্যে দিয়ে চাপা আগুনের মত রঙের দ্যুতি বেরোয়। জত্তোর টলটলে স্বচ্ছতা সত্ত্বেও, তাঁর ছবির পরিব্যাপ্ত রঙ, যার মধ্যে লাল্‌চে, হল্‌দেটে, নীল্‌চে রঙের আভা মিশে যায়, সেই রঙ খুবই বিস্ময়কর ; এবং রঙের কৃপাতেই তাঁর ছবিতে অত মহান, রহস্যময় ভাব আসে। জত্তোর ছবির ধর্মভাবকে আমরা এক কথায় বর্ণনা করে বলতে পারি যে তাঁর ছবিতে বিশ্বজগৎ রূপান্তরিত হয়েছে, আর এই রূপান্তর সাধন করেছে তাঁর টলটলে ঝিকঝিকে রঙের আভা বা লাবণ্য। রেমব্রান্টের ছবিতে আসল রঙটি পদার্থ হিসেবে যদিও আলাদা তবুও একই অতীন্দ্রিয় রহস্যময় ভাবের উদ্রেক করে ; ফোটোগ্রাফের লেশমাত্র ইঙ্গিত না থাকলেও বাস্তব যেন সত্যরূপে মূর্ত হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রেও এই কথাই বলা উচিত যে রেমব্রাণ্ট রঙের মূল্য সম্বন্ধে অত্যন্ত তীব্রভাবে সজাগ ছিলেন, এবং মোক্ষম উপায়ে, নিশ্চিত হাতে, অতি সূক্ষ্ম ইঙ্গিতে তিনি রঙের যাবতীয় মূল্য ফুটিয়ে তুলতে পারতেন। বাস্তবিক বলতে কি, চিত্রে যে রহস্য, যে অতীন্দ্রিয়, আধ্যাত্মিক রস ফুটে ওঠে তা আসে মুখ্যত রঙের উপর একান্ত ও অসীম দখল থেকে। তাতে এই কথাই আরও ভালভাবে প্রমাণ হয় যে রঙই হচ্ছে চিত্রের সর্বোচ্চ "গুণের" আদি উৎস ; তার থেকে বড় উৎস আর নেই।

ভিন্ন এক ধরনের রঙের ব্যবহার পাই পিয়েরো দেলা ফ্রাঞ্চেস্‌কায় (চিত্র ২৮)। তাঁর ছবিতে না পাই আমরা বস্তুর কাঠামোর নির্মাণে রঙের ব্যবহার, না পাই রঙের রসালোভাব, যা নাকি রঙের ব্যবহারে সত্যকারের দক্ষতার পরিচয় দেয়। পিয়েরোর রঙ নিতান্তই শুকনো। তাঁর ছবি প্রথমেই দর্শকের মনে যে ভাব আনে তা হচ্ছে সুশীতল শান্তির ; সমস্ত ছবিতে যেন

একটি ঠাণ্ডা ভাব ছড়িয়ে আছে ; যে রঙ তিনি ব্যবহার করেছেন তা এই ভাবের পক্ষে একান্ত উপযোগী। এই ভাবের ভিত্তি হচ্ছে নীল রঙ ; কিন্তু আলো প'ড়ে এই নীল রঙে এত অসংখ্য বিভিন্ন ছটা আসে যে তাঁর ছবিতে নানা পর্দার ক্রমিকতায় এক নীল রঙেরই অতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পার্থক্য আসে। তা সত্ত্বেও তারা অন্যান্য রঙের সঙ্গে এমন খাপ খায়, মিশে গিয়ে হার্মনির সৃষ্টি করে, যে অবাক হতে হয়। যেমন নীলের সঙ্গে মেশে নানা পর্দার ঠাণ্ডা সবুজ, ছাই, লাল ; মিশে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের একান্ত বৈশিষ্টপূর্ণ রঙীন ফর্মের সৃষ্টি করে। পিয়েরোর ছবির শীতলতাই তার প্রধান ও মুখ্য ভাব, তার অন্তর্নিহিত ফর্ম, এবং ড্রয়িং, কম্পোজিশন ভাবপ্রকাশ প্রভৃতির সঙ্গে এই শীতলতা নিটোল ভাবে মিশে গিয়ে যে বিশিষ্ট যড়ঙ্গজাত রসের সৃষ্টি করে তার তুলনা দুর্লভ।

ফ্রা আঞ্জেলিকো এক ধরনের আরামদায়ক উজ্জ্বল নীল ব্যবহার করেছেন কিন্তু সে নীল ছবির অন্যান্য রসের সঙ্গে মিলে মিশে তত ভাল হার্মনির সৃষ্টি করে না (চিত্র ২৫)। পিয়েরোর সর্বব্যাপী লাবণ্য অথবা জত্তোর ঔজ্জ্বল্য ও শক্তির পাশে ফ্রা আঞ্জেলিকোর ছবিতে কাটা কাটা কঠিন স্পষ্ট পদক্ষেপে রঙের পর রঙ ক্যানভাসের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে চলে যায়। এইভাবে এক ধরনের রঙীন ফর্মের সৃষ্টি হয় বটে ; কিন্তু তা খুব রসোত্তীর্ণ হয় না, মনকে খুব নাড়া দেয় না। ছবির মধ্যে বিভিন্ন রঙের সম্বন্ধগুলি অন্যান্য অনেক শিল্পীর কাজ বড় বেশী মনে পড়িয়ে দেয় ; এবং এই দৈন্য আরও বেশী প্রকট হয় যদি মনে রাখি যে ফ্রা আঞ্জেলিকো রঙ বড় ভাসা ভাসা ভাবে লাগাতেন।

যে সমস্ত উদাহরণ দিলুম তাদের তাৎপর্য আরও বেশী করে স্পষ্ট হয়, যদি আমরা অন্যান্য প্ল্যাস্টিক উপাদান থেকে রঙকে বার করে শুধু রঙ নিয়েই আলোচনা করি। কিন্তু রঙ যে শুধু তার দ্যুতি বা ব্যাপ্তিতেই সার্থক তা নয়। অন্যান্য ধরনের রঙের ডিজাইনও যথেষ্ট সার্থক হয়। ডিজাইন সৃষ্টির কাজে রঙ কিভাবে ব্যবহৃত হতে পারে, আধুনিক শিল্পী সুত্যাঁর কাজ সে বিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তীব্র গতি আবেগ বা হৃদয়ের উত্তাল ভাব প্রকাশই হচ্ছে সুত্যাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। এই ভাব ও ফর্ম আনার জন্য তিনি রঙও বিশেষভাবে বাছেন, তাদের মেলানও বিশেষ একভাবে। তাঁর গরম, রসালো, দপদপে, বিচিত্র রঙ পিয়েরোর ঠিক বিপরীত। কিন্তু দুজনেই বিভিন্ন ধরনের, খুব উঁচুদরের, রঙের ডিজাইন সৃষ্টি করেছেন। তিন্তোরেত্তোর 'স্বর্গ' বা রেনোয়ারের 'স্নানরতাদের গ্রুপ' ছবিতে রঙের যে

ছন্দোময় স্রোত দেখি তা ছবি দুটির সাধারণ অভিব্যক্তির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, যার জোরে ছবিতে আসে তরল লাবণ্যময় আবর্তিত গতি, তৈরি হয় অত্যন্ত ঐশ্বর্যময় রঙের ডিজাইন যার কৃপায় ছবি দুটি সার্থক হয়।

প্রায় এই ধরনের কাজ আছে পুস্যাঁয় (চিত্র ১৫)। কিন্তু তাঁর রঙ বেশ শুকনো, বস্তুর নির্মাণে তা গভীরভাবে কাজ করে না, যদিও তা মোটেই উপরের বাহ্যিক প্রলেপ নয়। কিন্তু তবুও সেই রঙের স্রোত ও ছন্দ ক্যানভাসের প্রতিটি অংশে পৌঁছিয়ে পুস্যাঁর অতি সুকুমার, অতি যত্নে তৈরি, অতি খুঁতখুঁতে মন নিয়ে করা, ফর্মের ডিজাইনের সুষমায় খুব ভাল করে মিশে যায়। তাঁর রঙের ডিজাইন তাঁর রেখাগত ও রচনাগত ছন্দকে জোরালো করে, তার প্ল্যাস্টিক ফর্মে অতি সুষ্ঠুভাবে মিশে যায়, অথচ আলাদা ভাবেও নজরে পড়ে।

খুব কম ক্ষেত্রেই লেঅনার্দোর চিত্রের মূল ডিজাইনে রঙ সার্থকভাবে কাজ করেছে। 'মোনালিসা'য় অবশ্য মনে হয় যেন তিনি তাঁর লক্ষ্য বা গন্তব্যে পৌঁছেছেন, কিন্তু তাঁর 'ব্যাকাসে' ডিজাইনটি ফুটিয়ে তুলতে রঙ তেমন সাহায্য করে না। বস্তুত লেঅনার্দোকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম চিত্রশিল্পীদের সঙ্গে এক পঙক্তিতে বসাতে অনেক সময়ে যে দ্বিধা হয় তার কারণই হচ্ছে তিনি রঙের মধ্যে আলো অভিন্ন, একাকার করে দিতে পারতেন না, যেমন একাকার করেছেন জত্তো, তিন্তোরেত্তো, জর্জনে, তিশান, ডিউরর, ভান আইক, রেমব্রাণ্ট, সেজান, রেনোয়ার।

পেরুজীনোয় রঙ সম্বন্ধে অত্যন্ত গভীর বোধ না থাকলেও, ছবির ডিজাইনের সঙ্গে রঙ অবিচ্ছেদ্যভাবে ব্যবহৃত না হলেও, তাতে রসালোভাব বা ঐশ্বর্য না থাকলেও, মাঝে মাঝে, যেমন তাঁর 'প্রেম ও সতীত্বের দ্বন্দ্ব' ছবিতে, তাঁর রঙ ডিজাইনের সঙ্গে বেশ খাপ খায় ; অবশ্য তাঁর ডিজাইন সর্বদাই মোটামুটি হাল্‌কা, সুকুমার, সুরুচিপূর্ণ ; কিন্তু মানুষকে খুব নাড়া দেয় না। রাফায়েলে কোন সত্যকারেব রঙের বোধ নেই। যদি তাঁর ছবি থেকে অন্যান্য উপাদানগুলি একে একে বাদ দিয়ে রঙের ডিজাইন খুঁজি তাহলে নিতান্ত মূল্যবান, রসোত্তীর্ণ কিছু পাব না। কারণ আলো রেখা, ছবিতে ঘন বস্তুর সংস্থান, মডলিং, প্যাটার্ন সবকিছু তাঁর চিত্রে রঙ বাদেও সম্পূর্ণ। ঠিক এই কারণে তাঁর ছবি হাফটোনে ছাপলে নিতান্ত মন্দ দেখায় না। সাধারণত তাঁর রঙ অন্য শিল্পীদের থেকে ধার করা, তাতে তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিত্ব বা স্বকীয়তার ছাপ কম, যদিও মাঝে মাঝে ছবির সাজে, যেমন তাঁর 'নীল মুকুট পরা ভার্জিন' অথবা 'ওড়না

পরা মহিলা' চিত্রে রঙের দানও কম নয়। তাঁর বিখ্যাত 'মাদোনা লা বেল্ জার্দিনিয়ের' চিত্রটির অতি সূক্ষ্ম, সুকুমার রেখার কাজ ও স্পেসের অদ্ভুত অনুভূতি পুরোপুরি উপলব্ধি করতে হলে ছবির রঙকে উপেক্ষা করতে হয়। কারণ মাদোনার পোশাকের লাল রঙ সত্ত্বেও ছবিটির রঙ যেমন ক্যাটকেটে, তেমনি একঘেয়ে। আলোর সাহায্যে মডলিং খুব ভাল হয়েছে, কিন্তু রঙ খোলেনি বলে অত ভাল মডলিঙেও পুরো জোর নেই, ফিগরটিও প্রাণবন্ত হয়নি। ফলে ফিগরটি মাখা ময়দার মত থসথসে, আঠাআঠা দেখায়, যেন নরম প্ল্যাস্টারে তৈরি মূর্তি। রাফায়েল বর্ণশিল্পী হিসেবে যে কত গৌণ তা বোঝা যায় তাঁর 'কাউন্ট বালদাসার কাস্তিলিওনে'র সঙ্গে তিশানের 'দস্তানা হাতে লোক' ছবিটির তুলনা করলে। দুটি ছবিতেই রঙ মুখ্যত ব্যবহৃত হয়েছে টোন হিসেবে। কিন্তু রাফায়েলের ছবিতে প্রথমেই চোখে পড়ে বিভিন্ন রঙের পরস্পর সম্বন্ধের মধ্যে হার্মনির অভাব। রাফায়েলের রঙ ভাসাভাসা, শুকনো, একঘেয়ে ; ডিজাইন হিসেবে তার মূল্য নিতান্ত সামান্য. নেই বললেই হয়। কিন্তু উল্টোপক্ষে, তিশানের ছবিটি গোছা গোছা সুকুমার জমকালো রঙে ভরা, যার জন্য ছবির সাজটি আরও সুন্দর দেখায়।

সিমোনে মার্তিনির 'ক্যালভারি আরোহণ' ছবিটিতে উজ্জ্বল রঙগুলি এমন এক প্যাটার্নের সৃষ্টি করে যার ফলে সারা ছবি মুখর হয়ে ওঠে, যদিও ছবিটি আসলে বর্ণনামাত্র. সার্থক চিত্র বলা যায় না। ঔজ্জ্বল্য সত্ত্বেও রঙগুলি খুব নাড়া দেয় না ; তবুও তাদের সাজ ছবিটির সার্থক ফর্মের সঙ্গে বেশ খাপ খায় ; মান্তেনিয়ায় বিভিন্ন রঙের পারস্পরিক সম্বন্ধের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোন গুণ নেই. তারা সমগ্রতার সৃষ্টি করে না। এটি মান্তেনিয়ার ছবির রীতিমত দোষই বলা যায়। যে সব রঙ তিনি ব্যবহার করেছেন তার দোষে যে এ রকম হয় তা নয়. তার কারণ মার্তিনির আঁকা লুভরের ছবিগুলিতে যে গাঢ় সবুজ দেখা যায় তা অন্য অনেক চিত্রশিল্পীই ব্যবহার করেছেন, অথচ তাঁদের ছবিতে ও রঙ মোটেই ম্যাড়মেড়ে বা কাদাকাদা দেখায় না। তাঁর 'অ্যাগনি ইন দা গার্ডন' ছবিটি রঙের দিক দিয়ে অনেক বেশী সার্থক, কারণ এই ছবিটিতে রঙই ডিজাইনের অখণ্ডতা আনে এবং প্ল্যাস্টিক ফর্মের গৌরব বাড়ায়।

রঙের ব্যবহারে শিল্পজগতের মহাজনরা যে-পথে-গেছেন-সেই—পথই— শ্রেয় এই ভাব, অর্থাৎ ইংরেজিতে যাকে বলে অ্যাকাডেমিসিজ্ম, খুব বেশি দেখা যায়। রাফায়েলকে অ্যাকাডেমিক রীতির শ্রেষ্ঠ শিল্পী বলে

ধরা যায়, তার কারণ তাঁর প্রতিটি কাজে ছিল অসাধারণ নৈপুণ্য। কিন্তু তাঁকে যাঁরা নকল করেন, যেমন গিদো রেণি বা জিউলো রোমানো, তাঁদের কাজে রাফায়েলের নকল দুগুণ অ্যাকাডেমিক হয়ে যায়, ফলে তাঁদের কাজ শুধু যে অকিঞ্চিৎকর হয় তা নয়, রীতিমত বিরক্তিকরও হয়। সেই রকম রঙের তীর্থস্থান ভেনিসেও, জর্জনে, তিশান, তিন্তোরেত্তো প্রবর্তিত বিখ্যাত 'ভিনিশান দ্যুতি' গৌণ শিল্পীদের হাতে, যেমন পালমা ভক্কো বা সিবাস্তিয়ানা দেন পম্বোর তুলিতে হয়ে দাঁড়ায় নিত্যন্ত অ্যাকাডেমিক কৌশল : কোন একটি বিশেষ দিকে অত্যধিক ঝোঁক, মেলোড্রামা বা অতিরঞ্জন ; প্রতিটি খুঁটিনাটিতে নকলবাজি, যা অতিসহজেই ধরা যায় ; কারণ নকল করতে গেলেই আসলটির যেটুকু ভাল সেটি আরও ভাল করে দেখাবার লোভ সংবরণ করা দুঃসাধ্য হয়। বার্বিজঁ শিল্পীরা বা রুসো এইভাবে ক্লোদের রঙকে অ্যাকাডেমির কৌশলে নামিয়ে আনলেন, যার জন্যে তাঁদের ছবিতে দুর্বলতা অস্বাভাবিকতা এল। এই হিসেবে রুবেন্সকেও ভান ডাইক অ্যাকাডেমিক কৌশলমাত্রয নামালেন। পুস্যাঁর ঐতিহ্যও ল সুয়ে'র হাতে অ্যাকাডেমিক শস্তা খেলো হয়ে গেলো।

রঙের মধ্যে দিয়েই ডিজাইন, রঙের ব্যবহারেই ছবির অখণ্ড সমগ্রতা, রঙ ছাড়া ছবি ভাবা যায় না. প্রাচ্য চিত্রে এরকম ছবির চরম পরাকাষ্ঠা হয়েছে চীন দেশের চিত্রকলায়। প্রাচীন চীনের এমন অজস্র চিত্র আছে যেখানে রঙই হচ্ছে কারিকা শক্তি, যার মাধ্যমে অসীম অনন্ত বিশ্বের একটু অংশ ফ্রেমে আটকে শিল্পী নিজস্ব ডিজাইনের মধ্যে সমস্ত প্রকৃতিকে ঢেলে সাজেন, অর্থাৎ বিশ্বের প্রতিটি জিনিসের সত্যরূপ রঙের মধ্যে প্রকাশ করেন। এবং যেহেতু অজন্তায় চীনে প্রভাব সুস্পষ্ট সেহেতু অজন্তারও অনেক চিত্রে রঙের ব্যবহার চিত্র-ডিজাইনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে গ্রথিত। অজন্তার অনেক দেয়ালে অবশ্য চিত্রগত ডিজাইনের অভাব চোখে পড়ে, কিন্তু যেখানেই ডিজাইন সার্থক হয়েছে সেখানেই রঙের সঙ্গে চিত্রের ডিজাইনটি অভিন্ন। অজন্তার বহুমূল্য নানা অ্যালবাম সত্ত্বেও ইউনেস্কো প্রকাশিত অ্যালবামটি অজন্তা চিত্রের এই গুণটি বুঝতে খুব সাহায্য করে ; সবুজ হাঁস, গোলাপী হাতী, গাঢ় ব্রাউন বর্ণের স্ত্রী পুরুষের দেহের রঙে কি অপূর্ব দ্যুতি, রসালোভাব আসে বর্ণনা করা শক্ত, স্পষ্টই বোঝা যায় যে রঙই অজন্তার প্ল্যাস্টিক ফর্মের মুখ্য উপাদান, রঙকে আশ্রয় করেই চিত্রের ফর্মটি গড়ে উঠেছে। বায়ুমণ্ডল বা আবহাওয়া যার মধ্যে সারা দূর বিশ্ব প্রকৃতি আবছায়ায় ভাসে, তার গুণটি ভারতীয় মিনিয়েচর

শিল্পী খুব অদ্ভুত নৈপুণ্যে এনেছেন অনেক রাজপুত চিত্রে। আবার নিতান্ত স্বচ্ছ, কন্‌কনে আকাশে তারার মত দপ দপ করে জ্বলা বায়ুমণ্ডল ও আমরা পাই কাংড়া ও বাশোলি চিত্রে, চাম্বা বা তেহরি-গাড়ওয়ালের মিনিয়েচারে। কিন্তু যেখানেই পারস্যভাব প্রবল, অর্থাৎ ছবি খানিকটা রঙীন গাল্‌চে বা কার্পেটের মত নকশীকাঁথা হিসেবে নানা রঙের টুকরো টুকরো অংশের সমন্বয় হিসেবে তৈরি, সেখানেই রঙ হয়েছে ভাসাভাসা, আবরণ মাত্র। প্ল্যাস্টিক ফর্মটি প্রাণময় ক'রে, বাস্তবের সত্যরূপটি রঙের ভাষায় উচ্চারিত ক'রে, যে চিত্র সার্থক হয় তার সর্বশ্রেষ্ঠ নমুনা আমরা পাই তিব্বতী পতাকায় বা টাংকায়। টাংকায় সমস্ত রূপই রঙের ভাষায় ভাবা এবং নির্মাণ করা। অনন্তশূন্যে ভাসমান বোধিসত্ত্ব মূর্তি, পর্বতের হাল্‌কা হাওয়ায় ভাসা ফিগর, বায়ুমণ্ডলের স্পন্দিত প্রকাশ, বসন বা ড্রেপারির অত্যদ্ভুত রঙীন অস্তিত্ব, যার ফলে বসনে তুলো বা রেশমের রেশমাত্র থাকে না, তা হয়ে যায় রঙের দ্যুতির সঙ্গে অভিন্ন ; এ সমস্তই তিব্বতী পতাকার বিস্ময়কর গুণ, যার প্ল্যাস্টিক ফর্ম ও ডিজাইন সম্পূর্ণভাবেই তার রঙের ঐশ্বর্যের মধ্যে নিহিত। আধুনিক যুগে ভাস্বর, ফর্মালি বিন্যাসের সঙ্গে অভিন্নভাবে, দ্যুতিময় রঙ মৌলিকভাবে ব্যবহার করেছেন রবীন্দ্রনাথ। আমাদের দেশে অ্যাকাডেমিক রীতিতে রঙের ব্যবহারের উল্লেখ করলে করতে হয় নন্দলাল বসুর। কিন্তু নন্দলাল বসু যে ভাবে রঙ ব্যবহার করেছেন তা নিতান্তই অনুকরণ, তাতে এমন কি রঙের মৌলগুণ নিয়ে কোনরকম পরীক্ষাও খুব কম, ফলে তা অনেকস্থলে ভাসাভাসা, নিকৃষ্ট হয়েছে। অন্যপক্ষে অ্যাকাডেমিক রীতিতে রঙের ব্যবহারে গভীর মৌলিক সার্থকতা এনেছেন অবনীন্দ্রনাথ, বিশেষ করে তাঁর পূর্ববঙ্গ চিত্ররাজিতে অথবা হিউয়েন সাঙের ভারত যাত্রা চিত্রে। কিন্তু এসব চিত্রেও রঙ চিত্রের ডিজাইন বা প্ল্যাস্টিক ফর্মটি অনিবার্যভাবে গড়ে না। তার অবশ্য একটা কারণ এই যে, যে-ডিজাইন বা প্ল্যাস্টিক ফর্ম এখানে আলোচনার বস্তু সে ফর্ম বা ডিজাইন অবনীন্দ্রনাথের কোন চিত্রেই বোধহয় নেই।

সংক্ষেপে সামান্য যেটুকু আলোচনা হল তাতে এই দাঁড়ায় যে চিত্রে রঙ মোটেই গৌণ অঙ্গ নয়। যাঁরা উল্টো মত পোষণ করেন, অর্থাৎ ভাবেন যে চিত্রে রঙের স্থান অপেক্ষাকৃত গৌণ, তাঁরা নিতান্ত না বুঝে বলেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে রজার ফ্রাইয়ের মত সমালোচকও এইমত প্রকাশ্যে পোষণ করেছেন। বেরেন্‌সন একবার এই মত প্রকাশ ক'রে পরে আবার ফিরিয়ে নেন ; তা সত্ত্বেও ইটালিয়ান শিল্পী বিষয়ক প্রবন্ধসমূহে তাঁর

লেখার ধারা অনুধাবন করলে এটা বুঝতে দেরি হয় না যে তিনি প্ল্যাস্টিক শিল্পে রঙকে নিতান্ত গৌণ স্থান দেন। এ ত গেল একেবারে প্রথম শ্রেণীর সমালোচকদের কথা। গৌণ সমালোচকদের মধ্যেও, যেমন ম্যাথারের লেখায়, চিত্রকলায় রঙের ন্যায্য স্থান সম্বন্ধে কোন সুচিন্তিত বোধের প্রমাণ পাওয়া যায় না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, বর্ণশিল্পী হিসেবে চিত্রশিল্পের ইতিহাসে জত্তোর কত বড় স্থান তার উল্লেখ ম্যাথারের লেখায় একেবারে নেই, সমগ্র ফ্লোরেন্টাইন কলমের চিত্রেই বা রঙের কি কাজ হয়েছে তারও কোন উল্লেখ নেই। ম্যাথারের মতে ফ্লোরেন্টাইন কলম নাকি "স্পর্শগ্রাহ্য গুণ" অর্থাৎ মডলিং নিয়েই ব্যস্ত ছিল। তাই যদি থাকবে তাহলে চিত্র শিল্পের ইতিহাসে ফ্লোরেণ্টাইন কলমের অত বড় স্থান হওয়া সম্ভব নয়, কারণ, হাজার হোক, চিত্রশিল্পে মডলিং হচ্ছে একটি গৌণ ব্যাপার। ওদিকে ভিনিশানদের বেলায় রঙকে যদিও বড় বেশী বাড়ানো হয়েছে, তবুও চিত্রে রঙের কি কাজ সে সম্বন্ধে মোটামুটি সাধারণ সূত্রগুলিও কোথাও বলা হয়নি। ফলে ছবির গড়নে, বিষয়বস্তুর নির্মাণে, রঙ কিরকম অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত সে সম্বন্ধে কোন কথাই নেই। এইসব সমালোচক একটি বিষয়ে মারাত্মক ভুল করেন ; তাঁরা রঙকে শুধু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণ হিসেবে দেখেন, রঙের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতাকেই সবচেয়ে বড় স্থান দেন। তাঁরা ভুলে যান যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতাই রঙের সবচেয়ে বড় গুণ নয় ; রঙের বিভিন্ন অংশ এবং সম্বন্ধই আসলে যে কোন ছবিকে সংগঠন করে, সংহত করে। প্ল্যাস্টিক ফর্মে রঙের বিভিন্ন সম্বন্ধ-নিচয় তাই এত বেশী মূল্যবান।সব চেয়ে ভাল কম্পোজিশন তখনই হয় যখন তা রঙের মাধ্যমে, রঙের সংগঠনে হয়। চিত্রের ষড়ঙ্গে বা রসশাস্ত্রে এটি একটি মূলকথা ; অথচ ঠিক এই বিষয়েই অধিকাংশ লেখক অদ্ভুত অন্ধতার পরিচয় দেন। একটি সামান্য কথা মুহূর্তের জন্যে ভেবে দেখলে ব্যাপারটি পরিষ্কার হবে। দৃশ্যমান জগৎই শিল্পীর শিল্পের উৎস, অর্থাৎ যে বাস্তবটিকে তিনি তাঁর স্বীয় সত্যরূপে আরো বাস্তব করে ফোটাতে চান। সেই জগৎকে আমরা মুহূর্তের জন্যেও শুধু সাদা এবং কালো রঙে ভাবতে পারি না, কারণ তার যাবতীয় রঙই সে জগৎকে আমাদের চোখে সত্য করে, তৈরি করে। দৃশ্যমান জগৎকে যদি আমরা রঙ বাদ দিয়ে ভাবতে না পারি তবে ছবির জগৎ, যা নাকি বাস্তবের চেয়েও বাস্তব বলে নিজেকে ঘোষণা করে, সেই জগতে রঙ তার অন্তঃস্থলবর্তী গুণ না হলে কি করে সে জগৎ সম্ভব হবে।

নকশা

সাধারণত আমরা নকশা বা ড্রয়িংকে রেখার ক্রিয়া বলে ধরি, যে-রেখা বস্তু বা শরীরের সীমারেখা বা কন্টুরটি স্পষ্ট করে দেখায়, একসঙ্গে বা পাশাপাশি রাখা কতগুলি বস্তুর প্রত্যেকটিকে আলাদা করে দেয়। কিন্তু বর্তমান আলোচনায় ড্রয়িং-এর সংজ্ঞা আরও ব্যাপক। চিত্রে যে প্লাস্টিক গুণের অবতারণা এখানে হয়েছে, তাতে ড্রয়িং বলতে আমরা সেই ক্রিয়াটিকেই বুঝব যা নাকি চিত্রশিল্পীর সমগ্র ডিজাইনটির পক্ষে যে সব বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলা প্রয়োজন, সেগুলিকে সম্পূর্ণভাবে টেনে বার করে, অর্থাৎ রেখায় ফুটিয়ে তোলে। আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি সকল শিল্পসৃষ্টির মূল কথাই হচ্ছে বাছাই করা ; যে কোন বিষয়বস্তুর মাত্র কয়েকটি দিক নিয়ে সেই সৃষ্টি ব্যাপৃত থাকে ; এমন কি এই কয়েকটি দিকেও প্রকৃতি থেকে হুবহু নকল করার কোন প্রশ্ন সেখানে ওঠে না। উল্টে, তাদেরই কোন কোন অংশের উপর কমবেশী ঝোঁক পড়ে, বাঁকিয়ে দুমড়িয়ে নানাভাবে বিকৃত করা হয় ; উপরন্তু সমস্ত বিষয়টিকে একটি নতুন পটভূমিতে ফেলা হয়, যার ফলে, তার শিল্পরস ও তাৎপর্য বৃদ্ধি পায়। শিল্পের মধ্যে যে প্রকাশক্রিয়া বা ব্যঞ্জনাশক্তি আছে তার মূল কথাই হল এই বাছাই, ও নতুন করে বলা, নতুন মানে দেওয়া। একাজে শিল্পীর সমস্ত ক্ষমতা নিয়োগ করতে হয়, তাঁর সমস্ত ক্ষমতার নির্মম বিচার হয়, এবং আসলে এই নিয়েই হয় ড্রয়িং ; এই তার মূল কথা। প্লাস্টিক শিল্পের ভাষায় বলতে গেলে ড্রয়িং হচ্ছে সব কটি প্লাস্টিক উপায় উপকরণের সম্মিলিত দান : রেখার সঙ্গে আলো, রঙ ও স্পেসের সমন্বয় এবং সম্বন্ধ নির্ণয় ; এই সব বিভিন্ন উপাদানের কতখানি সংশ্লেষণ সাধন হয় তারই উপর চিত্রের রসগত মূল্য নির্ভর করে। সর্বশ্রেষ্ঠ ড্রয়িংএ রেখা পাশাপাশি দুটি বা ততোধিক রঙীন ক্ষেত্রের তীক্ষ্ণ সীমান্তমাত্র আর থাকে না, তখন তা রঙই হয়ে যায়। সে রঙ দেখা দেয়, হয় সরু রঙীন পটি হিসেবে, যেমন প্রায়ই দেখা যায় সেজানে মাতিসে এবং যামিনী রায়ে, নয় একটি ক্ষেত্র হিসেবে যাতে নাকি দুপাশের বস্তুর রঙ উপচে এসে পড়ে। এই ধরনের রঙের ক্ষেত্ররূপী লাইন প্রথম ব্যবহার করেন ভিনিশানরা, এর চরম উৎকর্ষ

হয় রেণোয়ারে। আবার যেসব চিত্রে রঙ এইভাবে উপছে পড়ে না, যেমন জত্তো, ভান আইক, ডিউরর প্রভৃতি প্রাচীন শিল্পীতে, সেখানেও পরিষ্কার তীক্ষ্ণ কাটা কাটা রেখা অন্যান্য প্লাস্টিক উপাদানের সঙ্গে অতি চমৎকারভাবে মিশে, অনবদ্য সংশ্লেষণ সাধন করতে পারে। এর বহু শ্রেষ্ঠ উদাহরণ আছে ভারতীয় চিত্রে : ভারতীয় দরবারী চিত্রের বিশেষত্বই বোধহয় এই রকম তীক্ষ্ণ তারের মত কঠিন রেখার সঙ্গে অন্যান্য প্লাস্টিক উপাদানের অপূর্ব সার্থক সংশ্লেষণ, যা ভারতীয় মিনিয়েচরের মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত একটানা ঐতিহ্য বজায় রেখেছে। অন্যপক্ষে রঙীন পটি হিসেবে রেখার ব্যবহারও ভারতীয় লোকচিত্রে খুব সার্থকভাবে দেখা যায়, যার চরম শুদ্ধ রসের উৎকর্ষ সাধন করেছেন যামিনী রায়। চিত্রে অবাস্তবতা, অসার্থকতা, বাস্তবের সত্যরূপের বদলে মিথ্যারূপ, তখনই আসে যখন রেখা একা একা নিঃসঙ্গ অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকে, যখন কন্টুর বা সীমারেখার সঙ্গে যে বস্তু সীমাবদ্ধ হচ্ছে তার কোন আত্মিক যোগ থাকে না।

ড্রয়িং-এর সঙ্গে রেখার যোগ খুব ঘনিষ্ঠ। যে কোন জিনিসের মূল বা মোদ্দা কথাটি বলতে হলে আমরা বলি রেখাচিত্র বা আউটলাইন, কোন জিনিসের ছবি বোঝাতে গেলে উল্লেখ করি তার আদলটির অথবা তার রেখায়িত রূপের, মুখের বৈশিষ্ট্যের কথা বলতে হলে বলি তার মুখের রেখার কথা। কালিকলমে আঁকা ড্রয়িং বর্ণনা হিসেবে অথবা রসপ্রকাশ হিসেবেও অতি উপাদেয় হতে পারে। সুতরাং ড্রয়িং সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে স্বভাবত রেখা দিয়েই আরম্ভ করতে হয়। কিন্তু আগাগোড়া একটি জিনিস সর্বদা মনে রাখা দরকার ; সে হচ্ছে, রেখা ততক্ষণই প্লাস্টিক অর্থে সার্থক এবং তাৎপর্যপূর্ণ হয় যতক্ষণ তা সমগ্র ফর্মের অন্যান্য অঙ্গ ও যাবতীয় উপাদানের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংবদ্ধ থাকে।

মজেইক থেকেই চিত্রকলার উৎপত্তি হয়। মজেইকে কন্টুরগুলি একেবারে পরিষ্কার কাটা কাটা থাকতে বাধ্য। তাই পরেও বহুকাল পর্যন্ত চিত্রকলার ঐতিহ্যে কন্টুর বা সীমারেখার এইরকম স্পষ্ট কাটাকাটা ভাব বজায় রইল। চীমাবুয়েতে দুটি বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে সীমারেখা সর্বদাই খুব তীক্ষ্ণ, কাটাকাটা ; যার ফলে ক্যানভাসের জমিটি রঙের খোপে খোপে ভাগ করা, একেকটি খোপে একেকটি রঙ ; খোপে খোপে কয়েকটি রঙ বন্দী ; তাদের মধ্যবর্তী রেখা কোন খোপেই পড়ে না। এইভাবে রেখার ব্যবহারের ফলে সমস্ত ফিগরগুলির হাবে ভাবে, ভঙ্গীর প্রকাশে, গতিতে,

বড় কাঠ কাঠ নিশ্চল ভাব আসে, যার ফলে গতি এবং উচ্ছল কর্মব্যস্ততার ভাব প্রকৃতভাবে ফোটে না। উপরন্তু বিভিন্ন বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন রেখার সংশ্লেষণ কম হয়, যার ফলে গোটা ছবিটিতে রেখাগত বা রেখাশ্রিত ডিজাইন আসা শক্ত হয়। চীমাবুয়ের পর ইওরোপীয় চিত্রে আলো, রঙ, এবং কম্পোজিশনের সঙ্গে রেখা অনেক বেশী সংশ্লেষিত হয়। তখন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করে প্রতিটি উপাদান বার করে না দেখলে তাদের আলাদাভাবে চেনা মুশকিল হয়। প্রথম দিকের ছবিগুলি মনে হয় মুখ্যত রেখাচিত্র, যার উপরে নাকি রঙ, আলো ইত্যাদি চড়ানো হয় ; অর্থাৎ সেগুলি লাগানোর আগেই চিত্রের মৌল ডিজাইনটি সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। পরে, যত দিন গেল, ততই ড্রয়িংএ সমস্ত প্লাস্টিক উপাদানগুলির যুগপৎ যোজনা হল, যার ফলে এল অধিকতর ঐক্য, বাস্তবের সত্যরূপ, গভীর আবেদন। জত্তো যখন আঁকলেন তখনই তাঁর রেখা আর নিছক অসংশ্লিষ্ট রেখা রইল না ; তা হল সরল, সংহত , যার পূর্ণ আস্বাদ শুধু কল্পনার দ্বারাই সম্ভব। তখনও, অর্থাৎ জত্তোতেও রেখা পরিষ্কার, কাটাকাটা ; কিন্তু তাতে দুপাশ থেকে রঙ আর আলো এসে মিশে গিয়ে রিয়ালিটির এমন এক প্রতীতিময় আমেজের সৃষ্টি করে যা শুধুমাত্র রেখায় সম্ভব নয় ; অর্থাৎ অন্যভাবে বলতে গেলে, অন্যান্য উপাদান থেকে শক্তি আহরণ করে তাদের সঙ্গে সম্বন্ধস্থাপন করেই রঙ এত জোর পায়, প্লাস্টিক হয়। আলাদা আলাদা ভাবে ছবির প্রতিটি বিষয়ে অথবা ছবির সমগ্র ড্রয়িংএ রেখা এবং ঘনবস্তুর ম্যাসেব মধ্যে তরল, গতিশীল, ছন্দোময় বিন্যাস সাধিত হয় ; তাদের মধ্যে হার্মনির সৃষ্টি হয়ে অখণ্ড, সম্পূর্ণ ডিজাইন হয়।

ইউরোপীয় শিল্পীদের মধ্যে যাঁর ড্রয়িং সর্বপ্রথম স্বাভাবিক প্রতিচ্ছবির দিকে এগোল তাঁর নাম মাজাচ্চো। এ বিষয়ে তাঁর কাজ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তিনিই প্রথম সীমারেখাকে একটু ঝাপসা বা অস্পষ্ট করে দিলেন। আন্দ্রেয়া দেল কাস্তানোর চিত্রে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আবর্ত আনার ফলে লাইনের তীক্ষ্ণভাব কমে গেল, তারই ফলে নিছক সরল রেখা ত্যাগ করার সময় এল, রেখা আরও সহজ হল, অপ্রাকৃত বা অ্যাবস্ট্রাক্ট ডিজাইনে রেখার ব্যঞ্জনাশক্তি আরও বাড়ল। মাজাচ্চো বা আন্দ্রেয়া দেল কাস্তানোর চেয়ে ফ্রা ফিলিপ্পো লিপ্পির রেখায় ব্যঞ্জনা বা জোর যদিও কম, তবুও তাতে লাবণ্য, এবং অলঙ্কার বাড়ল, ডিজাইন আরও বেশী সমৃদ্ধ হল। উচ্চেল্লোতে রেখা হল আরও কঠিন, কম লীলায়িত বা তরল, কিন্তু আরও বিচিত্রমুখী। এই সব গুণের কল্যাণে তাঁর ছবিতে এক অদ্ভুত বিশিষ্ট,

নিজস্ব, প্যাটার্ন এল। দুই শিল্পীতেই রেখা তখনও খুব তীক্ষ্ণ। এমনকি বিষয়বস্তুটি যখন নিতান্তই স্পষ্টভাবে কর্মব্যস্ত, গতিশীল, প্রাণস্পন্দিত, তখনও রেখায় গতি বা বেগ হল খুব কম, নেই বললেই হয় (চিত্র ২৬)।

পিয়েরো দেলা ফ্রাঞ্চেস্কায় রেখা, রঙ পেয়ে আরও জোরালো হল, সব মিলে ডিজাইন হল আরও বিস্তারিত, বিচিত্র, শক্তিমান, রসোত্তীর্ণ। রঙের ভিতর দিয়ে তিনি ড্রয়িং-এর অনেক উদ্দেশ্য সাধন করলেন, যদিও তিনি ড্রয়িং ও রঙের যে দুটি ভিন্ন স্পষ্ট চরিত্র আছে একথা কোন সময়েই গুলিয়ে ফেলেননি। তাঁর ছবির নিজস্ব চরিত্র হচ্ছে শান্ত, নিরাসক্ত, এমনকি নৈর্ব্যক্তিক, তারই তাগিদে তাঁর ড্রয়িংএ গতি বা নাটকের অভাব দেখা যায়।

বতিচেল্লিতে রেখাই আনে উচ্ছল কর্মব্যস্ততা কিন্তু সে রেখা এত অসংশ্লিষ্ট, অন্য সব কিছু উপাদান থেকে এত আলাদা করে আঁকা, এত নানাভাবে বিস্তারিত করা, তাকে দিয়ে এত বেশী সব-কাজ করিয়ে নেবার চেষ্টা দেখা যায়, যে ছবির প্লাস্টিক ঐক্য অনেকখানি নষ্ট হয়। ফলে তাঁর রেখা নানা জটিল জ্যামিতিক আলপনা বা অ্যারাবেস্কের সৃষ্টি করে, কিন্তু অন্যান্য প্লাস্টিক উপকরণগুলি সে-কাজে সাহায্যে লাগার সুযোগ খুব কম পায়। ফলে, কোথায় বতিচেল্লির ড্রয়িং সমস্ত ছবিটিতে নির্মাণের রূপ দেবে, কাঠামো তৈরি করবে ; তা না হয়ে হয় অলঙ্কার বা সাজন। এই সবের দরুন তাঁর ছবিতে প্রায়ই এক সাবলীল কসরতি, বা শ্রেষ্ঠ ওস্তাদের খেলার ভাব আসে। আপাতদৃষ্টিতে এই গুণটি দর্শককে খুব টানে, ঠিক যেমন টানে আমাদের দেশের যে-কোন বড় ওস্তাদের গাওয়া খেয়ালে বা ঠুংরিতে গলার কাজের অত্যাশ্চর্য বাহাদুরি। কিন্তু ঠিক যেমন সেই বাহাদুরিটি মূল গানের সংহতিকে নষ্ট করে, মনকে অযথা বিভ্রান্ত করে, এমন কি মনোযোগী কানে বিরক্তির সঞ্চার করে, অথচ সাধারণ শ্রোতাকে খুবই পুলকিত করে, ঠিক তেমনি বতিচেল্লির রেখা মনকে অনিবার্যভাবে নাড়া দেয় না। তাঁর রেখা অবশ্যই প্যাটার্নের সৃষ্টি করে, কিন্তু ক্বচিৎ তা ডিজাইনের সঙ্গে অভিন্ন, অখণ্ড হয়। অনেক সময়ে বিষয়বস্তুর সঙ্গে সে-রেখা কতখানি খাপ খাবে তাও যেন বতিচেল্লি হিসেব করেন না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় তাঁর ধর্মবিষয়ক চিত্রের। যে রেখা তাঁর 'প্রিমাভেরা'য় কিছুটা সার্থক, সেই রেখা তিনি চোখকান বুজে খ্রীষ্টবিষয়ক চিত্রে লাগিয়ে দেন ; ফলে, শুধু কতগুলি অসঙ্গত আবর্তের সৃষ্টি হয়।

লেঅনার্দোর রেখাও খুব স্পষ্ট, তীক্ষ্ণ, কিন্তু মডলিং-এর সঙ্গে সে রেখা

এক হয়ে যায় বলে ডিজাইনে অনেক বেশী সমগ্রতা আনে (চিত্র ২১)। বতিচেল্লির রেখার মত তা একরোখা হয় না, তাতে একপেশে ঝোঁক কম থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, তাঁর 'মোনালিসা'র হাতের আস্তিনের অথবা পশ্চাৎপটের রেখা সত্যসত্যই ভারী, ঘন, ওজনবিশিষ্ট বস্তুর আভাস দেয়, ছবিতে গভীরতা আনে। অন্যপক্ষে বতিচেল্লির 'ভিনাসের জন্ম' ছবিতে জটিল, রেখানির্ভর প্যাটার্নের সৃষ্টি করে তাঁর রেখায় শুধুমাত্র অলঙ্কারাত্মক গুণ আসে। রাফায়েল লেঅনার্দোর লাইন সরাসরি নিয়ে তাকে আরও ক্ষুরধার করলেন, তাঁর রেখা হল আরও নাটকীয়, বিচিত্রচ্ছন্দ ; ছবির সারা ডিজাইনে তা হল আরও কৌতূহলোদ্দীপক (চিত্র ৩০)। কিন্তু রেখার উপর অত্যধিক ঝোঁকের ফলে দুজনের ছবিতে স্বাভাবিক যথাযথতার উপর, সুন্দর মিষ্টত্বর দিকে ঝোঁক গেল বেশী, ফলে পোর্ট্রেট বা ফিগর হল বড় বেশী ললিত, মিষ্ট, বড় বেশী চোখের চেনাজানা। লেঅনার্দোর ছবির ম্যাস বা ঘনবস্তুর অত তিনমাত্রিক ওজন, ভার, গভীরত্ব সত্ত্বেও, কিংবা রাফায়েলের ছবির অত উচ্ছল, প্রাণবন্ত গতিমুখরতা সত্ত্বেও, এই মিষ্টত্বভাব বা ফোটোগ্রাফের ভাব থেকেই যায়। রাফায়েলের রেখা বড় প্রগল্‌ভ, তাতে সংহতি কম ; ফলে উপকরণের মিতব্যয়িতায় যে ব্যঞ্জনাশক্তির আভাস আসে তা তাঁর ছবিতে নেই। তাঁর রেখা অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, রঙের প্রয়োজন হয় না, আলো রেখার পরিপূরক, সুতরাং দুইয়ে মিলে ছবি যেন আরও বেশী নাটকীয় হয়ে যায়।

মিকেলাঞ্জেলোয় রেখা আর রঙ দুই-ই স্পষ্টত আলাদা, কিন্তু তাদের মধ্যে এমন একটি সম্বন্ধ আছে যার ফলে তাঁর ড্রয়িংএ অসম্ভব শক্তি আসে : সিনোরেল্লি আর কাজমো তুরার ড্রয়িং গ্রহণ করে তিনি তাকে নিজের মত করে বদলান, বিশেষ এক ভঙ্গীতে তাকে ছবির গোটা ফর্মের সঙ্গে মিলিয়ে দেন ; বস্তুতে অতিরঞ্জন বা মেলোড্রামার ব্যঞ্জনা আনেন।

পূর্বজরা ড্রয়িংএ যতখানি পারদর্শিতা দেখান ভিনিশান শিল্পীরা তাঁদের কাজে তার অনেক উন্নতি সাধন করেন ; রঙ আর আবছায়া কন্টুরকে তাঁরা খুব ভেবে চিন্তে গুছিয়ে ব্যবহার করেন। ছবির বিষয়বস্তুর গড়নে এবং কাঠামোয় রঙ ব্যবহার করার দরুন, বায়ুমণ্ডলে নরম দ্যুতি আনার ফলে, গোটা ডিজাইনটি খাড়া করার জন্যে ছবির বিভিন্ন অংশ স্পষ্ট, তীক্ষ্ণ, রেখা দিয়ে ভাগ করার দরকার ঘুচে গেল। প্রথম যুগের ভিনিশান শিল্পীরা, যেমন বেলিনি বা কার্পাচ্চো, ড্রয়িংএ তীক্ষ্ণ রেখা রাখলেন, কিন্তু তাকে ভাল করে আলো আর রঙের সঙ্গে মিশিয়ে দিলেন। তবে জর্জনে বা

তিশান এই তিনটি উপাদান আরও আশ্চর্য নৈপুণ্যে একত্রে মেশান, যার ফলে তাঁদের ছবিতে বাস্তবের সত্যরূপ বা রিয়ালিটি আরও বেশী চোখের সমুখে ভাসে। জর্জনেতে অবশ্য কন্টুরগুলি মোটেই অস্পষ্ট বা আবছায়া নয়, কিন্তু তা বলে তারা কটকটে করে বেরিয়েও থাকে না; সুতরাং দর্শকের চোখ তাদেরই উপরই বেশী নিবদ্ধ থাকে না। তিশান অনেক সময়ে কন্টুর হিসেবে চওড়া মোটা লাইন দেন, যা নাকি ছবির ফর্ম থেকে একটু আলগা হয়ে তফাৎ হয়ে যায়। তাতে ছবির অলঙ্কারাত্মক গুণ যদিও বাড়ে, তবুও চিত্রের ব্যঞ্জনাকে দুর্বল করে দেয়। অনেক সময়ে আবার তিশানের রেখা এত ঢিলেঢালা হয়ে যায় যে চিত্রের বস্তু যেন চারপাশের জমির মধ্যে মিলিয়ে যেতে চায়। ঠিক এই গুণটিই হচ্ছে যাকে বলে উপকরণের মিতব্যয়ী ব্যবহারে ড্রয়িং-এর সার্থক ব্যঞ্জনাঢ্য প্রকাশ। এসব ক্ষেত্রে রেখা রঙ আর আলো সম্পূর্ণভাবে সংশ্লেষিত হয়ে যায়, ড্রয়িং-সার্থকতা সর্বোচ্চ চূড়ায় ওঠে।

তিন্তোরেত্তোর ছবিতে রেখার কন্টুরটি প্রায়ই সরু রঙীন পটি হিসেবে উজিয়ে দেয়া হয়। সেই সঙ্গে রেখা রঙ আলো সবই একেবারে সম্পূর্ণভাবে ঘুরপাক খাওয়া আবর্তের ফর্মে মিশে যায়; যা নাকি জোরালো, উচ্ছল গতিবেগ, এবং নাটকীয় পরিস্থিতিময় ছবির পক্ষে একান্ত সার্থক রূপ। অবশ্য এই আবর্ত অন্য বিষয়বস্তুতেও খুব ভালভাবে ব্যবহার করা যায়। আবার যখন এই আবর্ত কমিয়ে, অর্থাৎ তার গতি মন্দ করে, ছবির বুনন বা টেক্সচার, অর্থাৎ স্পষ্ট, কঠিন স্পর্শগ্রাহ্য রূপটি বার করা হয়, তখন রঙের ওতপ্রোত প্রয়োগে ছবির বিভিন্ন বিষয়বস্তুর মধ্যে স্পষ্ট সীমারেখাগুলি আর আলাদা আলাদা রেখার মত একা, সম্পর্কবর্জিত লাগে না; ফলে সমস্ত ছবিতে অনেক বেশী ওজন, ঘনত্ব, গভীরত্ব এবং রিয়ালিটি আসে। তিশান, তিন্তোরেত্তোর মত পাওলো ভেরোনেজেও অনেক সময়ে রেখাকে রঙের পটি করে উজিয়ে দেন; তবুও জর্জনে, তিন্তোরেত্তো বা তিশানের চেয়ে ভেরোনেজের ছবিতে কন্টুর অনেক বেশী তীক্ষ্ণ। যেমন তাঁর 'সোডোম দাহনে' সারা ছবিতে রেখা পরিব্যাপ্ত হয়ে স্রোতের মত এক বস্তু থেকে আরেক বস্তুতে চলে যায়; মনে হয় যেন ছবির এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত একটি বিশেষ দিক ধরে সেটি চলে গেছে। সব জিনিসে এইভাবে পরিব্যাপ্ত থাকতে, সব কিছুকে এক সূত্রে বেঁধে রাখতে, একমাত্র শ্রেষ্ঠ ভিনিশান শিল্পীদের রেখাই পারে।

পুস্যাঁর রেখায় ভিনিশান প্রভাবের চেয়ে ফ্লোরেন্টাইন প্রভাব বেশি।

তাঁর রেখা খুবই সুকুমার, পেলব, সূক্ষ্ম, লাবণ্যময় ; কিন্তু তাতে শ্রেষ্ঠ ভিনিশান রেখার জোর নেই ; তাছাড়া ছবির গঠনে যে রঙ থাকে তাঁর রেখা সেই রঙে পুষ্ট হয় না। রাফায়েল বা লেঅনার্দোর রেখা যেমন খরশান, পুস্যাঁর সেরকম নয়। কিন্তু ভিনিশানদের শক্তি, বা রাফায়েল, লেঅনার্দোর কাটাকাটা, ক্ষুরধার ভাব না থাকলেও তাঁর নিজস্ব ডিজাইনে পুস্যাঁর রেখা খুব মানিয়ে যায়, তাঁর অলঙ্কারাত্মক অথবা ব্যঞ্জনামূলক ছবিতে সে রেখা খুব ভালভাবেই কাজ করে।

রুবেন্সের কণ্টুর তিশানের চেয়ে তীক্ষ্ণ। কিন্তু রাফায়েলের চেয়ে ভোঁতা। সুতরাং তাঁর আবর্তে রেখা ভেঙে ভেঙে যাবার মত হয় ; তার ফলে, চারকোণা জমির মধ্যে প্রশস্ত একটানা রঙের বিস্তার কমে যায় ; তা যদি না কমত, তাহলে কঠিন কণ্টুরগুলি আরও তীক্ষ্ণ হয়ে জমি থেকে ফুটে বেরোত। ছন্দের তালে তালে তাঁর রেখার বার বার পুনরাবৃত্তি ঘটে, তাতে ছবিতে প্রাণের ও গতির খুব বেশি রকম সাড়া জাগে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিন্তোরেত্তোর তুলনায় দর্শকের মন সে প্রাণের সজীবতা বা গতিমুখরতায় অনেক কম সাড়া দেয়। তার কারণ রুবেন্সের চেয়েও তিন্তোরেত্তোর ছবিতে তাঁর রঙ অন্যান্য প্ল্যাস্টিক উপাদানের সঙ্গে আরও গভীরভাবে মিশে গেছে, অভিন্ন হয়েছে।

রেমব্রান্ট ড্রয়িং-এর সম্রাট। তাঁর মত সংযম, উপকরণের মিতব্যয়, চরম সূক্ষ্মকাজ, অসম্ভব সাধন, আর কারোর ড্রয়িং-এ আছে কি না সন্দেহ। আলো, রেখা, রঙ এত নিখুঁতভাবে এত অবিচ্ছেদ্যভাবে মিশে গিয়ে এক হয়ে যায় যে তাদের আলাদা করতে হলে বহু সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের দরকার। উপরন্তু তারা যে ভাবের সৃষ্টি করে তা যেমন সংযত তেমনি জোরালো, রসসৃষ্টিতে অনবদ্য ; তাদের সঙ্গে রুবেন্সের তুলনা হয় না। তাঁর ছবিতে বিভিন্ন ঘন বস্তুর সীমান্তগুলি ঠিক কোথা কোথা দিয়ে গেছে দেখাতে বললে যে-কেউই ফাঁপরে পড়বেন। বতিচেল্লি বা রুবেন্সের চেয়ে তাঁর আশ্চর্য সূক্ষ্ম রেখায় লক্ষ্য গুণ বেশি প্রকাশশক্তি থাকে ; তাতে যে পরিমাণ অনুভূতি, ভাব, ভঙ্গী, প্রতিটি ফি-ারের নিজস্ব, বিশিষ্ট, গতিভঙ্গী ফুটে ওঠে তার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বোধের তুলনা বতিচেল্লি বা রাফায়েলে পাওয়া সম্ভব নয়। এই ধরনের সূক্ষ্মবোধ কিছুটা আছে ভেলাস্কেথে কিন্তু রেমব্রান্টের মত নয়। এল্ গ্রেকোয় রেখা স্বাভাবিক মাপকে এত বিকৃত করে, তা এত বিচিত্রমুখী, দৈর্ঘ্যে আনুপাতিক মাপে তা এত ঘন ঘন বদলায়, যে সব মিলে এক অত্যন্ত সুতীব্র ভাবোন্মাদনার সৃষ্টি করে, কিন্তু

তা সত্ত্বেও তাঁর ছবি অতিরঞ্জন বা মেলোড্রামা হয় না — এর কারণ তাঁর রেখার তীব্র কর্মব্যস্ততার সঙ্গে তাঁর আলো, রঙ এবং অন্যান্য প্ল্যাস্টিক উপাদানও সমানভাবে তাল রাখে।

ক্লোদের কোন ছবি আমরা যদি খণ্ড খণ্ড ভাবে পরীক্ষা করি তাহলে খণ্ড খণ্ড ড্রয়িং-এ আঁটসাঁট সংহতি, বা ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য বা ব্যঞ্জনাশক্তির অভাব দেখব ; শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পীদের তুলনায় তাঁর ড্রয়িং-এ এসব গুণ কম। কিন্তু টুকরো টুকরো ভাবে না দেখে যদি গোটা ছবিটার ড্রয়িং একসঙ্গে পরীক্ষা করি, তাহলে দেখব একটি ঘনবস্তুর পর আরেকটি ঘনবস্তু বা ফিগর পাশাপাশি লেগে, কেমন সুন্দর রেখাশ্রিত বা রেখাগত রূপ, ইংরেজিতে যাকে বলে লিনিয়ার এফেক্ট, এসেছে, যার কৃপায় বড় বড় রেখা হয়েছে তরল, ইচ্ছেমত খেলানো, বিচিত্র, ছন্দোময় নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে মহৎ। এই ধরনের ভাব একটি ঘনবস্তুর পিঠে আরেকটি ঘনবস্তু স্পষ্ট করে ফুটিয়ে দেখাতে গেলে আসে না। ক্লোদের ছবিতে ডিজাইন যেভাবে আসে তাতে সমগ্র দৃশ্যটির রেখাগুলি একসঙ্গে ফুটিয়ে তোলাই হল ছবির উদ্দেশ্য এবং এই উদ্দেশ্যটি সাধনের জন্যে তিনি ছবির প্রত্যেকটি বস্তুর খুঁটিনাটি ড্রয়িং সম্বন্ধে মনোযোগ কম দিতেন। বুশারের রেখা বেশ কঠিন, তাতে বতিচেল্লির সুকুমার, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, কমনীয়তা যেমন আছে তেমনি আছে অলঙ্কার ; কিন্তু তাতে ব্যঞ্জনাশক্তি কম। রেখার তীক্ষ্ণতার দরুন তাঁর ছবি মনে হয় যেন পাথরে বা কাঠে রিলিফ খোদাই করে রঙ দেয়া হয়েছে, ইংরেজিতে যাকে বলে ক্যামিয়োর গুণ। ওয়াতো বা ফ্রাগোয়াঁরে কণ্টুর আরও নরম, খানিকটা যেন দু পাশে ছড়িয়ে, মিলিয়ে যায়, রেখা আর রঙ ভাল করে না মেলার দরুন তাঁদের ড্রয়িং বেশ দুর্বল হয়ে যায়। শারদাঁর কণ্টুর অনেক বেশি তীক্ষ্ণ, কিন্তু তাঁর ড্রয়িংও কোমল, সূক্ষ্ম, ব্যঞ্জনাঢ্য ; তাতে রঙ আর আলো এত মোলায়েম যে তাঁর কণ্টুর নরম দেখায়, ছবির সমগ্র প্ল্যাস্টিক ফর্মে নিজেকে মোটে জাহির না করলেও, যথেষ্ট জোরালো দেখায়।

দাভিদের ড্রয়িং খুব নিপুণ, কুশলী, কিন্তু কঠিন আবেগের উত্তাপবর্জিত এবং মূলত অ্যাকাডেমিক, অর্থাৎ 'আর্ট অ্যাকাডেমি'র ব্যাপার। নতুন সৃষ্টির উত্তেজনা বা মহত্ত্ব তাতে নেই। সেই অনুপাতে অ্যাঙ্গরের ড্রয়িং আরও বিচিত্র, ছন্দোময়, সূক্ষ্মভাবপূর্ণ, অনেক বেশি মৌলিক। অ্যাঙ্গরের ছবিতেও অবশ্য ক্লাসিসিজ্ম্-সুলভ শীতল ভাব বর্তমান, রেখাও খুব আঁটসাঁট, কিন্তু তবুও তার মধ্যে কি যেন এক গুণ আছে যা অন্য কোন

শিল্পীর মধ্যে নেই। অ্যাঙ্গরের সব ছবিই প্রায় রেখায় রেখায় নির্মিত. কিন্তু তবুও তাঁর রেখা বিভিন্ন বস্তুর সীমান্তরেখা মাত্র নয় ; বস্তুর সীমারেখাটি সুস্পষ্ট করা ছাড়াও তার অন্য গুণও আছে। যে বস্তু আঁকা হচ্ছে অ্যাঙ্গর তার ত্বক বা আবরণ বা গাত্রের বুনিয়াদ বোধটি শুধুমাত্র রেখার সাহায্যে ফুটিয়ে তোলেন. তার জন্যে রঙ বা আলোর খুব দরকার হয় না। ফলে তাঁর লাইনই তাঁর পেন্টিং-এর ভিত্তি হয়। এই হিসেবে অ্যাঙ্গরের সঙ্গে ভারতীয় মিনিয়েচারের অদ্ভুত মিল আছে। ভারতীয় মিনিয়েচারেও পার্থিব বস্তু বা প্রাণী বা নরনারীর গাত্রের বোধটি মূলত রেখার জোরেই আসে ; তাতে রঙ বা আলো না থাকলেও মনে হয় ড্রয়িংটি স্পর্শগ্রাহ্য, অর্থাৎ আসল জগতে জিনিসটি ছুঁলে স্পর্শেন্দ্রিয়ে যে রকম লাগা উচিত, ছবি দেখেও সেই রকম বোধ আসে। কিয়ারসক্যুরো দিয়ে রেমব্রাণ্ট যে কাজ করিয়ে নেন, অ্যাঙ্গর রেখা দিয়ে কতকটা একই ধরনের কাজ করান। অর্থাৎ ঠিক যে গুণটুকু আনতে অ্যাঙ্গরের অন্যান্য প্ল্যাস্টিক উপাদানের সাহায্য নেওয়া উচিত হত তা তিনি রেখা দিয়েই সম্পন্ন করেন। অবশ্য রেখা দিয়ে রঙ, আলোর কাজ পুরোপুরি হয় না : তবুও অ্যাঙ্গর রেখা খুব জটিল প্রাণবন্তভাবে কাজ করে, তার ফলে বতিচেল্লির রেখার মত তা নিছক স্ফীত বা সর্বেসর্বা হয়ে ওঠে না। অ্যাঙ্গরের রেখা ছবির প্ল্যাস্টিক ফর্মের সঙ্গে বেশ মানানসই হয়. কিন্তু বতিচেল্লির রেখা প্রায় শুধু প্যাটার্নে পর্যবসিত হয়। অ্যাঙ্গর যেভাবে রেখা ব্যবহার করেছেন তা রসোত্তীর্ণ আর্টের পর্যায়ে পড়ে, নিছক ওস্তাদী বা কসরতি নয়। কিন্তু তবুও তাকে শ্রেষ্ঠ. সর্বোৎকৃষ্ট বলা যাবে না। তার একটা কারণ এই যে সমস্ত উপাদানের সম্যক যোজনায় যে-প্ল্যাস্টিক ফর্ম হয় তার ভার তাঁর রেখা বইতে অক্ষম। আরেকটি কারণ, সর্বশ্রেষ্ঠ. মহত্তম শিল্পীদের যে বিস্ময়বোধ, যে সদাভাব, যে গভীর অন্তর্দৃষ্টি থাকে, তা অ্যাঙ্গরের ছিল না। অর্থাৎ পৃথিবীকে বলবার, জানাবার কথা ছিল কম।

দ্যমিয়ে ছিলেন ড্রয়িং-এ আরেক সেরা শিল্পী, যদিও তাঁর জাত আলাদা। তিশান বা তিন্তোরেত্তোর মত কণ্টুরে তাঁর রেখা চওড়া হয়ে যায়, কিন্তু একটানা গতিতে চলে না, ভেঙে ভেঙে যায়। যেমন প্রচণ্ড তার বিক্রম, তেমনি তার ঘনীভূত. সংহত, ব্যঞ্জনাময় প্রকাশ. উপরন্তু আলো আর মড্‌লিং-এর সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে তা অসম্ভব ওজন. ঘনত্ব, গভীরত্ব, আর কর্মব্যস্ততার সৃষ্টি করে। তাঁর অনেক পেন্টিং আছে যার ড্রয়িং শক্তিতে, প্রকাশক্ষমতায়, ব্যঞ্জনায় রেমব্রাণ্টের সঙ্গে তুলনীয়। এবং সে

ড্রয়িং সার্থক হয়েছে রেখা, আলো ও রঙের নিখুঁত যোজনায়।

মৌলিক, প্ল্যাস্টিক প্রকাশভঙ্গিমার সার্থকতা বিচারে দেলাক্রোয়ার ড্রয়িং অপেক্ষাকৃত নিরেস। তাঁর ড্রয়িং-এর রেখা, রঙ, আলো রুবেন্স থেকে নেওয়া; প্রায়ই আবার এসব উপাদান তাঁর ছবিতে বড় হৈচৈ বাধায়, তাদের উদ্দেশ্য হয় বর্ণনা, অথবা মনস্তত্ত্বকে প্রাধান্য দেওয়া। কিন্তু চিত্রে মনস্তত্ত্ব আরও ঢের ভালভাবে ফুটিয়েছেন দেগা। দেগা তাঁর ছবিতে অ্যাঙ্গরের নমনীয়তা, বৈচিত্র্য ও নৈপুণ্য বিলক্ষণ আনেন; উপরন্তু এমন এক ফর্মের সৃষ্টি করেন যার মধ্যে রেখার মনস্তত্ত্বনির্ভর ব্যঞ্জনা পরিপূর্ণভাবে প্ল্যাস্টিক দেহ পায়। দেগার তেল রঙের ছবিগুলিতে — তাঁর প্যাস্টেলের কাজে নয় — অনেক সময়ে বড় বেশি রেখার উপর ঝোঁক, এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য প্ল্যাস্টিক উপাদানের প্রতি অবহেলা দেখা যায়। তার ফলে, তাঁর ছবি খুব খাঁটি এবং সত্যভাবপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও শুদ্ধ চিত্রের সর্বোচ্চশিখরে পৌঁছয় না।

দেগার তুলনায় কুর্বের রেখা একটু কড়া, কঠিন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর গোটা ড্রয়িংগুলি খুব সুঠাম, শক্ত, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, শক্তিশালী। তাঁর ছবিতে বাস্তবের প্রতিচ্ছবির আমেজ আনার পক্ষে তাঁর ড্রয়িং খুব উপযোগী। মানে'র রেখা ছবির অন্যান্য প্ল্যাস্টিক উপাদানের সঙ্গে বেশ ভাল মিশে যায়, তাঁর ড্রয়িং-এ অন্যের নকল প্রায় নেই-ই; তাতে তাঁর নিজস্ব ডিজাইনের বৈশিষ্ট্য খুব ভাল ফুটে ওঠে। অন্যপক্ষে ক্লোদ মনে'র রেখা অত্যধিক আলো আর রঙে প্রায় গলে, হারিয়ে যায়, ফলে তাঁর চিত্রে পৌরুষ, ব্যঞ্জনা, ডিজাইনের জোর কমে যায়। রেনোয়ার বা সেজানের চিত্রে রঙ আর আলোর পর্দার তলায় যে শক্ত কাঠামো বা ভিত্তি থাকে মনে'র ছবিতে তা নেই।

এইসব উত্তরগামী শিল্পীদের কাজে পূর্বসূরীদের দানের সারার্থ নতুন রূপে নতুন ফর্মের সৃষ্টিতে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন রেনোয়ার মূলত ভিনিশানদের ড্রয়িং নিলেন, কিন্তু তাকে এমন নতুন প্রকাশশক্তি, নতুন ব্যঞ্জনা দিয়ে উৎসারিত করলেন যে ভিনিশানদের চেয়েও তাঁর ছবিতে রেখা রঙ আর আলো বহুগুণ ভাল করে একসঙ্গে গলে এক হয়ে গেল; তাঁর পক্ষে এই রকম অসম্ভব কীর্তি সম্ভব হল তার আরও কারণ এই যে তিনি ইম্‌প্রেশনিস্টদের তুলি ও বুরুশের কাজ নিজের তাগিদ মত বদলে নিলেন। তাঁর আগে যত শিল্পী কাজ করে গেছেন তাঁদের সকলের চেয়ে রেনোয়ারের ছবিতেই রঙ অতি স্বচ্ছন্দগতিতে তাঁর

কণ্টুরের বাঁধ টপকিয়ে উপচে পড়ে। তাঁর শেষদিকের কাজে রেখা যেন নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব খুইয়ে হারিয়ে গেল ; কিন্তু তৎসত্ত্বেও এক ঘনবস্তুর পিঠে আরেক ঘনবস্তুর আলাদা আলাদা অস্তিত্ব বা ম্যাসের একটুও মূল্য কমল না। এইভাবে একেকটি বস্তুর মধ্যে রঙের যে বিচিত্র ও জটিল সম্বন্ধ স্থাপিত হল তার ঐশ্বর্যে বিষয়বস্তুতে এল অভূতপূর্ব জমক, একই সঙ্গে আবার এল তরল লীলায়িত সাপটা ড্রয়িং, যার মধ্যে ছোট খুচখুচে কাজ নেই ; অপ্রয়োজনীয় জিনিস বাদ দিয়ে সে ড্রয়িং বস্তুর একান্ত সত্তা ঠেলে ঠেলে ফুটিয়ে তুলল। সুতরাং তাঁর ড্রয়িং-এ যে ঐকান্তিক আত্মস্থগুণ এল তা শ্রেষ্ঠ ভিনিশান ড্রয়িং-এও আছে কি না সন্দেহ। মিকেলাঞ্জেলো, তিন্তোরেত্তো, এল গ্রেকো বস্তুর 'স্বাভাবিক' গড়নকে যেভাবে বাঁকিয়ে চুরিয়ে বিকৃত, ইংরেজিতে যাকে বলে 'ডিস্‌টর্‌শন্' করেন, সেজান সেই ঐতিহ্যকে গ্রহণ করে তাকে ইমপ্রেশনিজমের ধারায় পরিশুদ্ধ করেন, তার ফলে চিত্রকলার ইতিহাসে এল এক সম্পূর্ণ নতুন সুর, নতুন তাৎপর্য, নতুন রিয়ালিটি। এই সমস্ত গুণ তিনি সমুচ্চ করলেন ছবির চিরাচরিত পারস্পেক্‌টিভ বা পরিপ্রেক্ষিতের মধ্যে নতুন কতগুলি প্লেন বা স্তরকে পরস্পরের সঙ্গে কাটাকাটি বা ইংরেজিতে যাকে বলে ইন্টারসেক্ট, করিয়ে। সেজানেরও পরে আরেকজন শিল্পী, গ্লাকেন্স, রেনোয়ারের রীতির কিছুটা পুনঃপ্রবর্তন করলেন ; দ্যমিয়ে এবং দেগার মনস্তত্ত্বমূলক ব্যঞ্জনার অদলবদল করলেন, তাদের আরও সরল করলেন ; ভাবে ভঙ্গীতে গতিতে আরও সদ্যতা আনলেন।

প্রাচ্য চিত্রে ড্রয়িং দুই ধারায় গেছে। এক, যে অর্থে ড্রয়িং কথাটি এই অধ্যায়ে ব্যবহৃত হয়েছে, অর্থাৎ যা সমস্ত প্ল্যাস্টিক উপাদানের সম্মিলিত প্রয়োগের ফল। আরেক হচ্ছে, যা আমরা ড্রয়িং-এর সাধারণ বাংলা অর্থ বুঝি, অর্থাৎ নকশা বা রেখাচিত্র, অথবা রেখায়িত, রেখাশ্রিত রূপ। ড্রয়িং-এর প্রথম অর্থটি খুব ব্যাপক ; তা ছবির সমস্ত ডিজাইনটিকে রূপ দেয়, ছবিটিকে রসের পথে এগিয়ে দেয় ; বর্তমান প্রবন্ধে ড্রয়িং এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। ড্রয়িং-এর দ্বিতীয় অর্থে বোঝায় শুধু প্যাটার্ন। প্রথম অর্থে সার্থক ড্রয়িং আমরা পাই অসংখ্য চীনে চিত্রে, যার তুলনা ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পীতেও মেলা ভার। প্রাচ্য চিত্রের আলোচনায় মুশকিল হয় এই যে চিত্রশিল্পীদের নাম প্রধান কথা নয়, বহু সময়ে বহু শ্রেষ্ঠ শিল্পীই অনামী থেকে গেছেন, যদিও প্রবীণ ও ওস্তাদ সমালোচকদের হাতে অসংখ্য অনামী ছবিও এখন নথিবদ্ধ হয়েছে। অসীম বিনয়, ধৈর্য, অধ্যয়ন ও

অধ্যবসায়ের ফলে তাঁরা শতাধিক শ্রেষ্ঠ চীনে শিল্পীর নাম, পরিচয় বার করেছেন, এবং কার কোনটা সৃষ্টি লক্ষণ মিলিয়ে মিলিয়ে বহু পরিশ্রমে, সেগুলি লিপিবদ্ধ করেছেন। এঁদের ছবিতে রঙ ও আলোর সঙ্গে রেখা মিশে গিয়ে অসীম অনন্ত বিশ্বের যে ঐশ্বর্যময় রূপ প্রকাশ করে তা সত্যই বিস্ময়কর (চিত্র ১১)। এখনও অনেক সমালোচক অসাবধানতাবশে চীনে ছবির আলোচনায় 'লিনিয়ার এফেক্ট' বা রেখায়িত রূপের কথাই মুখ্যত উল্লেখ করেন ; চীনে ছবির কঠিন তারের মত স্পষ্ট সীমান্তরেখা, যা এক বস্তুকে আরেক বস্তু থেকে স্পষ্টভাবে বিচ্ছিন্ন করে দেখায় তার কথাই তাঁদের সর্বপ্রথম মনে হয়। কিন্তু যাঁরা চিত্রসৃষ্টি করেন তাঁরা সমালোচকদের চেয়ে আরও ভাল সমালোচক, কারণ যে গুণটি নিজেদের ছবিতে আনবার জন্যে তাঁরা আকুলিবিকুলি করেন, ঠিক সেই গুণটি অন্যের মধ্যে দেখলে কখনও তা তাঁদের চোখ এড়ায় না। কন্‌স্টেবলের পর প্রত্যেক ইউরোপীয় শিল্পী রঙ এবং আলো সম্বন্ধে নতুন করে সচেতন হন। বস্তুর একটানা সীমারেখাকে ভেঙে দিয়ে, প্রথমত রঙ, দ্বিতীয়ত আলো, কি ভাবে ঘনত্ব বা ম্যাস গভীরত্ব বা ডীপ স্পেসের অনুমানকে বাড়াতে পারে তারই সমস্যায় তাঁরা ব্যস্ত হলেন, অর্থাৎ রেখার ক্রমান্বয় গতিকে ভেঙে ভেঙে দিয়ে রঙ ও আলোর সাহায্যে প্ল্যাস্টিক ফর্মে নতুন মূল্য আনার জন্যে তাঁরা তৎপর হলেন। ঠিক এই সময়ে বহু চীনে ছবি অকস্মাৎ ইউরোপীয় শিল্পীর চোখের সমুখে এক নতুন জগতের সন্ধান দেয়, যেখানে রঙ, রেখা, আলো, এবং স্পেস মৌলিকভাবে প্ল্যাস্টিক সমস্যার নিরাকরণ করেছে দেখা যায়। চীনে ছবিতে এই নিরাকরণের রূপ হল অনন্ত ভাসমান বায়ুমণ্ডলকে প্রথমত ভাস্বর রূপ দেওয়া, অর্থাৎ আলো এবং রঙের অপূর্ব সংশ্লেষণ করা। দ্বিতীয়ত চীনে ছবিতে কণ্টুর বা সীমারেখা কোথাও ভাঙল, কোথাও চলে গেল, একই ছবিতে কোথাও সরু বা মোটা রঙিন পটি হল, কোথাও সূক্ষ্ম ধারালো রেখা হল, কোথাও সীমান্তরেখার দুপাশ থেকে রঙ পরস্পরের উপরে উপচে পড়ল। একই ছবিতে এইরকম অসমসাহসিক বৈচিত্র্য রেমব্রাণ্ট বা তিশানও দেখাননি। রেণোয়ারের দৃষ্টিতে এই গুণ নিশ্চয় এড়ায়নি এবং পরে ভান গখ এবং দেগা চীনে ছবির এই সব লক্ষণের যথোপযুক্ত ব্যবহার করেন। চীনে ছবিতে রঙ এবং আলোর জমকের সঙ্গে রেখার এই অপূর্ব মিশ্রণ ও বৈচিত্র্যের ফলে, পারসপেকটিভ, ডীপ স্পেস এবং ছবিতে যে আশ্চর্য ব্যাপ্তি আসে, তা পৃথিবীর চিত্রেতিহাসে বিস্ময়কর।

অজন্তার শিল্পীদের মধ্যে অনেকেই যে চীনে পদ্ধতিতে নিতান্ত পারদর্শী ছিলেন, সে বিষয়ে অজন্তার প্রতিটি গুহার ছবিতেই অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায়। ইউনেসকোর অ্যালবামটি সহজলভ্য, সুতরাং তার থেকে উদাহরণ দিলে বোঝা যাবে। এখানে বক্তব্য এই যে অজন্তা চিত্রে প্ল্যাস্টিক ফর্মের যে পরাকাষ্ঠা দেখা যায়, রঙে, আলোয়, রেখায়, স্পেসে যে ঐশ্বর্য দেখা যায় তার উৎস দ্বিমুখী ; প্রথমটি অবিসংবাদিতভাবে ভারতীয়, যার প্রমাণ আছে অমরাবতী, ভারুত, সাঁচির ভাস্কর্যে। এই সব ভাস্কর্যের কম্পোজিশন ও পারসপেকটিভ খুবই সার্থকভাবে অজন্তা চিত্রে নিয়োজিত হয়েছে, এবং তার ফলে চীনের গুহাচিত্র টুনহুয়াঙের কমপোজিশন অজন্তার পাশে অপরিণত ঠেকে। দ্বিতীয় উৎস হচ্ছে চীনে রীতিতে রঙের, আলোর, এমনকি রেখারও ব্যবহার। এমন কি লোকের মুখ, চোখ, ভঙ্গিতেও চীনে মুখ, চীনে ভুরু, চীনে ভঙ্গি ভুল করার জো নেই। ইউনেসকো অ্যালবামের তিন, চার, পনের, আঠার, একুশ নম্বরের প্লেট এ বিষয়ে সব সন্দেহের নিরাকরণ করে। কিন্তু এখানে আমরা দেহ বা মুখাবয়ব, বা মুখের ভুরুর রেখা নিয়ে ব্যাপৃত নই, আমাদের আলোচ্য অজন্তা চিত্রের প্ল্যাস্টিক ফর্ম অর্থাৎ তার রঙ, রেখা, আলো এবং স্পেসের সমন্বয়। প্রথমেই সকলে স্বীকার করবেন যে ভারতবর্ষে এক গুহাচিত্র ছাড়া ছবিতে আলোর ব্যবহার দুর্লভ। দ্বিতীয়ত, ফারগুসন থেকে পার্সি ব্রাউন, আনন্দ কুমারস্বামী এমনকি লরেন্স বিনিয়ন বা ব্যাজ্‌ল্‌ গ্রে পর্যন্ত সকলে যে বলেন যে অজন্তা চিত্র মুখ্যত রেখায়িত রূপ, তার কীর্তি মূলত লিনিয়ার এফেক্ট ; ছবিতে বস্তুর ম্যাস ক্রমিক ভাবে, অর্থাৎ ইংরেজিতে সিকোয়েন্সে যায়, এক ম্যাসের পিঠে আরেক ম্যাস চিত্রিত হয়ে ছবির জমক বাড়ায় না, তাঁদের এসব কোন কথাই ধোপে টেঁকে না। কারণ, অজন্তার প্রতিটি গুহায় এসব যুক্তি খণ্ডনের ভূরি ভূরি প্রমাণ মেলে। অজন্তায় পারসপেকটিভ ও স্পেস কম্পোজিশনের অতি সার্থক বৈচিত্র্য ও গরিমা দেখা যায়। প্রথমত পাওয়া যায় সরল কম্পোজিশন ; অর্থাৎ মধ্যবর্তী ফিগর, তার দুপাশে প্রতিসাম্য রেখে আরও দুটি গ্রুপ। তারপর পাওয়া যায় যোগসূত্র কম্পোজিশন, ইংরেজিতে যাকে বলে কনেকটিং-লিংক কম্পোজিশন। এই ধরনের কম্পোজিশন বাইজানটাইন ও প্রাচীন খ্রীস্টিয়ান মজেইকে যথেষ্ট আছে, এমনকি চীমাবুয়ে এবং জত্তোতেও আছে, অর্থাৎ একই দেওয়ালে দুই বা ততোধিক ভিন্ন ছবি ; প্রত্যেকটির কম্পোজিশন ভিন্ন ; যোগসূত্রস্বরূপ থাকে, হয় একটি ফিগর বা গ্রুপ, নয় কোন স্তম্ভ বা স্থাপত্য, যেমন

ঘরবাড়ির অংশ। এইভাবে ফিগরকে যোগসূত্র হিসাবে ব্যবহার করে শিল্পী এক আখ্যান থেকে অন্য আখ্যানে অবলীলাক্রমে চলে যান। স্থাপত্য উপাদানের যথোচিত ব্যবহারে, আবার একই কম্পোজিশনের মধ্যে চোখের বিশ্রামের জন্য যতিপাত হয়। উপরন্তু অজন্তা শিল্পী একই দৃশ্যে একাধিক পারসপেকটিভ বিন্দু আনেন, একে ইংরেজিতে বলে মাল্টিপ্‌ল ভিশন বা বহুমুখী দৃষ্টি। আধুনিক যুগে প্রথমে সেজান, তারপর ব্রাক, তারপর পিকাসো, এর প্রবর্তন করেন। এর বলে একই বিন্দুতে দাঁড়িয়ে শরীর সামান্য ঘোরালে ভিন্ন ভিন্ন পারসপেকটিভ প্রতিভাত হয়। এর আরেকটি নাম প্রদক্ষিণ পরিপ্রেক্ষিত বা রোটেশন পারসপেকটিভ ; এর বিচিত্র ব্যবহার হয়েছে অসিরিয়ান ও ব্যাবিলোনিয়ান ভাস্কর্যে ও মজেইকে। এর ফলে ছবিতে অসম্ভব গতি আসে, দর্শক দৃশ্যে অংশ গ্রহণ করে। শেষকালে বলা দরকার যে অজন্তা শিল্পী প্রাচ্য পারসপেকটিভ রীতি (যাতে দূরের বস্তুর সীমান্তরেখা থেকে কর্ণরেখা বা ডায়াগোনালগুলি দর্শকের চোখে কেন্দ্রবিন্দু করে) ও পাশ্চাত্য পারসপেকটিভ রীতি (যাতে চোখ থেকে কর্ণরেখা বা ডায়াগোনালগুলি বেরিয়ে দিকরেখায় এক কল্পিত বিলীয়মান বিন্দু বা ভ্যানিশিং পয়েন্টে গিয়ে মেশে) দুই-ই সমানতালে ব্যবহার করেছেন। ছবির সামান্য অংশে অসীম মিতব্যয়ে নানা বিচিত্র রঙের ও আলোর যে বুনন দেখা যায় তা শ্রেষ্ঠ ইউরোপীয় চিত্রেও দুর্লভ। দ্বিতীয়ত, ড্রয়িং-ই সেখানে রঙীন রূপে দেখা দেয় ; অজন্তা চিত্রে রঙ এবং রেখা তফাৎ করা প্রায় অসম্ভব। উপরন্তু আরও বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে সমস্ত ফিগরটি রঙের মধ্যে দিয়েই নির্মিত হয় ; তাতে অবশ্য গুহার পাথরের অমসৃণ গা খুব সাহায্য করে, কিন্তু এইভাবে পাথরের গায়ের সাহায্য নেয়াও যে শ্রেষ্ঠ শিল্পীমনের পরিচয় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। রঙ, আলো, রেখা ও স্পেসের এই অপূর্ব সংশ্লেষণের ফলে অজন্তা চিত্রে আসে বলিষ্ঠতা, গুরু ওজন, গভীরত্ব, জমক, দ্যুতি, আলো। ইউনেসকো অ্যালবামের সাত বা ষোল নম্বর প্লেটের হরিণ বা হংসের নিছক হরিণত্ব বা হংসত্ব আনতে পারলে সেজানও সার্থক বোধ করতেন। এগারো, বারো, কুড়ি, একুশ, তেইশ, চব্বিশ বা বত্রিশ নম্বর প্লেটের রঙ ও ফিগরের সঙ্গে শ্রেষ্ঠ শিল্পীর কীর্তির তুলনা অনায়াসে চলে। রঙের অপূর্ব বিস্ময়কর ব্যবহারের পরই উল্লেখ করতে হয় রেখা বা কণ্টুরের ব্যবহার। যেমন এক নম্বর প্লেটে পাই স্পষ্ট আউট লাইন, তিন নম্বর প্লেটে দেহরেখা অস্পষ্ট, ছয় নম্বর প্লেটে মোটা রঙিন পটি, এগারো নম্বর প্লেটে রেখার দুধার থেকে রঙ

উপছে পড়ে, ষোল নম্বর প্লেটে রেখা হারিয়ে, গলে যায়। বলা বাহুল্য, স্পেস, রেখা, রঙ এবং আলোর এরকম অসমসাহসী বহুবিচিত্র সংশ্লেষণেই অজন্তা চিত্রের প্ল্যাস্টিক ফর্মে এতখানি ঐশ্বর্য আসে। বর্ণনাত্মক ছবি বলে অজন্তা চিত্রের ডিজাইনে অনেক সময়ে একটু অসন্তোষের কারণ ঘটে, কিন্তু বহু প্যানেল আছে যেখানে ডিজাইন সম্বন্ধেও খুঁত কাড়া অসাধ্য।

অজন্তার পর ভারতীয় চিত্র কি করে সূক্ষ্মকায় হয়ে পুঁথিচিত্রে রূপান্তরিত হল তার পুরো ঐতিহাসিক অথবা অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যাখ্যা আজও সম্ভব হয়নি। বড় বড় আসমুদ্র সাম্রাজ্য ভেঙে ছোট ছোট রাজ্যের সৃষ্টি এবং বণিক শ্রেণীর অভ্যুদয় সম্ভবত একটি কারণ। কিন্তু পশ্চিম ভারতীয় পুঁথিচিত্রে যা প্রথমেই চোখে পড়ে তা হচ্ছে সেই ছবিতে আলোর অভাব। এই সময়ে চিত্রকলায় পারসীক প্রভাব বেশি রকম আসে, তার প্রমাণ প্রাচীনতম জৈন পুঁথিতেও বর্তমান, বিজাপুরের ছবিতেও বিলক্ষণ দেখা যায়। পারসীক ছবি মূলত অলঙ্কারাত্মক, রঙিন প্যাটার্ন; যার প্রতি অংশে, প্রতি রঙে, আলো সমান উজ্জ্বলভাবে পড়ে; অর্থাৎ অন্য কথায়, আলো অবর্তমান, আছে শুধু স্পেস, রেখা ও রঙ। চিত্রের চারটি মূল উপাদানের মধ্যে একটিই সম্পূর্ণভাবে অন্তর্হিত হবার ফলে চিত্ররসের, প্ল্যাস্টিক ফর্মের মর্যাদাহানি অনিবার্য। ফলে অজন্তা চিত্রে যে ভল্যুম, ডীপ স্পেস, এবং স্পেস-কম্পোজিশন আমরা পাই আলোর অভাবে পরবর্তী চিত্রে তার অনেক মাহাত্ম্যই খর্ব হল। আলোর অভাবে ছবি একচোটে তিনমাত্রা থেকে দুইমাত্রায় নেমে এল। বলা বাহুল্য, সঙ্গে সঙ্গে চিত্রের রিয়ালিটিও ক্ষুণ্ণ হল; কারণ, রিয়ালিটি তখনই পরিপূর্ণ হয় যখন সমস্ত প্ল্যাস্টিক উপাদানগুলি একজোটে কাজ করে। তা সত্ত্বেও কিছু কিছু ডেকানী ছবিতে, যেমন দ্বিতীয় ইব্রাহিম আদিল শাহের সপারিষদ পোর্ট্রেটে এমন জমক দেখা যায় যা কিছুটা পিয়েরো দেলা ফ্রাঞ্চেস্‌কার কোন কোন ছবির সঙ্গে তুলনীয়। পারসীক প্রভাব সত্ত্বেও মুঘল মিনিয়েচারে প্ল্যাস্টিক অর্থে সার্থক অনেক ছবি আছে আনোয়ার-ই-সুহায়লি, রজমনামা আকবরনামা প্রভৃতি গ্রন্থের চিত্রে। এর কারণ মুঘল মিনিয়েচারে রঙের অদ্ভুত ব্যবহার, যা বস্তুর স্বরূপের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য। অনেক সার্থক মুঘল চিত্রে বায়ুমণ্ডল অদ্ভুতভাবে ভাস্বর। অনেকে মনে করেন ভারতীয় মিনিয়েচারে পারসপেকটিভ, ডীপ স্পেস বা স্পেস-কম্পোজিশন বুঝি অবর্তমান। ভারতীয় শিল্পী জ্যামিতিক পারসপেকটিভ না জানলেও রঙ, রেখা ও স্পেসের সংশ্লেষণে গভীরত্ব এবং ম্যাসের আভাস আনার ব্যাপারে

যথেষ্ট পটু ছিলেন, কিন্তু আলো না থাকায় তাঁদের চিত্র কিছুটা পঙ্গু হয়। আরেকটি মজার ব্যাপার প্রায়ই পরিলক্ষিত হয়। অধিকাংশ ভারতীয় মিনিয়েচারে মেঘ এবং বায়ুমণ্ডল চীনে ঐতিহ্যে আঁকা, বিদ্যুতে থাকে আলো, কিন্তু ছবির অন্যান্য অংশ আলোবিহীন ; ফলে ডিজাইন অসম্ভব রকম খণ্ডিত হয়। উপরন্তু আলোর পরিবর্তে সোনা ও রূপার জল ব্যবহারের দরুণ ছবিতে নিছক ডেকরেটিভ গুণ আরও বাড়ে, প্ল্যাস্টিক গুণ কমে।

অজন্তার ছবির সীমান্তরেখার রঙিন পটির ঐতিহ্য বজায় থাকে ভারতের লোকচিত্রে। সেখানে রঙিন পটি থাকল রঙিন কণ্টুর হয়ে, অর্থাৎ রিয়ালিটির আভাস নিয়ে, যদিও লোকচিত্রে আলো চলে গেল। ছবি হল দুইমাত্রিক। কিন্তু যেহেতু আলো বাদে সেখানে রঙ, রেখা, এবং স্পেস তিনটি উপাদানই অল্পবিস্তর বজায় রইল, সেজন্যে ছবি নিছক প্যাটার্নে নেমে গেল না, তার মধ্যে সম্পূর্ণ চিত্রের আভাস বা ডিজাইন বজায় থাকল। এই ডিজাইন সবচেয়ে সার্থক হল পুতুলে, যেখানে আস্ত দৈর্ঘ-প্রস্থ-ঘনত্ব বিশিষ্ট দেহের আশ্রয় পেয়ে রঙ, রেখা এবং স্পেসের সার্থকতা এল, পুতুলের গায়ের অসংখ্য স্তরে স্বাভাবিকভাবে আলো খেলে বেড়াল। অপর পক্ষে রাজপুত মিনিয়েচারে ছবি হল স্পষ্ট, তীক্ষ্ণ, কাটাকাটা, রেখার উপর নির্ভর, যার খোপে খোপে এক একটি রঙ তার স্বাধীন অস্তিত্ব নিয়ে বন্দী রইল, খেলে বেড়াল না। তার ফলে ছবিতে এল গতির অভাব, ছবি হল স্থাণু। রেখার উপরে অস্বাভাবিক ঝোঁকের ফলে ছবিতে এল শুধুমাত্র রেখারই ছন্দ। যে-কোন ছবির যে দুটি মূল অঙ্গ আছে অর্থাৎ ছন্দ বা কনট্রাস্ট, তাদের রাজ্য সুস্পষ্ট ভাবে ভাগ হয়ে গেল ; রেখা নিল ছন্দের ভার, রঙ নিল কনট্রাস্টের ভার। ছবিতে রিয়ালিটির বিচিত্র ঐশ্বর্য চলে গিয়ে এল মাত্র একটি সুর, সাহিত্যের ভাষায় যাকে বলে গীতিকাব্য-ধর্মিতা, লিরিসিজম্। পরিপূর্ণ নাটকের বদলে হল একটি রসের একটানা কবিতা বা লিরিক। তার ফলে খুব তাড়াতাড়ি বিকৃতি এল, ছবি হয়ে গেল সুকুমার, তনু, পেলব, ঠুনকো, এমনকি ধোঁয়াটে। রেখা, রঙের সঙ্গেও সংশ্লেষণ রাখতে পারল না। ওরই মধ্যে যেসব ছবিতে রেখার সাহায্যে যেখানে গোলক, চোঙা, এবং সরু সরু প্রিজমের আকারে ভল্যুম এল, সেখানে কিছুটা জমক হল ; এমন কি বহু ছবিতে শুধু রেখার সাহায্যে ফিগরের গা বা সারফেস খুব ভাল ফুটল, যেমন পাই অ্যাঙ্গরে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রেখার উপর অত্যধিক নির্ভরতার ফলে ছবি হল

অলঙ্কার, নিছক প্যাটার্ন। যেসব ক্ষেত্রে রঙের সঙ্গে মিশে রেখা আবর্তের সৃষ্টি করল, যেমন কাংড়ার 'ঝড়' বা 'কানামাছি খেলা' চিত্রে, অথবা তেহরি-গাড়ওয়ালের 'কালীয়দমন' চিত্রে সেসব ক্ষেত্রে ছবির মূল্য বহুগুণ বেড়ে গেল বটে, তবুও চিত্রের সবকটি উপাদানের যুগপৎ ও সার্থক সংশ্লেষণের ফলেই যে ম্যাস, ভল্যুম এবং স্পেস-কম্পোজিশন অর্থাৎ বাস্তবের সত্যরূপ, শিল্পীর ব্যক্তিত্ব, ছবিতে আসা সম্ভব, তা এল না। অনেক ক্ষেত্রেই রেখা রঙ ও স্পেস অসম্পৃক্ত, অসংলগ্ন থাকার ফলে ছবিতে ঠুনকো, সুকুমার, পেলব ভাব প্রশ্রয় পেল।

আধুনিক ভারতীয় শিল্পীদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ চিত্রকলায় রঙ, আলো এবং রেখার জোটকে অদ্ভুত, বিচিত্র মূল্য আনেন : রীতিসিদ্ধ প্রথায় অনুশীলনের অভাবে তার ছবিতে ডীপ স্পেস বা গভীর পরিপ্রেক্ষিত খুব সাফল্য লাভ করেনি। ছবির ভিতর দিকে জমির অভাবে, অর্থাৎ ডীপ স্পেসের অভাবে, তাঁর ছবিতে ইউরোপীয় মতে স্পেস কম্পোজিশন নেই। কিন্তু ছবির সমান জমিতে, সাদা জমি ছেড়ে ফিগর বা প্রতিমাটি অমোঘভাবে নিক্ষেপ করার ফলে তাঁর ফিগর ও সাদা জমি মুহূর্তে কর্মব্যস্ত, গতিমুখর, চঞ্চল হয়ে ওঠে ; সারা ফ্রেমের মধ্যে এক অপূর্ব টান বা টেনশনের সৃষ্টি হয়। তা সত্ত্বেও তাঁর ছবিতে পুরো কম্পোজিশনের পরিবর্তে প্রধান হয় রীতিদুরস্ত বিন্যাস, ইংরিজিতে যাকে বলে ফর্মাল অ্যারেঞ্জমেন্ট। এই ফর্মাল বিন্যাসে সাহায্য করে রেখা, রঙ এবং আলো। কালিতে আঁকা ছবিতে বস্তু বা ফিগরের সীমা বা শারীর রেখা একবার স্পষ্ট, তীক্ষ্ণ, কঠিন, কাটাকাটা কলমের রেখায় আঁকা হয়ে গেলে রবীন্দ্রনাথ সে আউটলাইন কখনও বদলাতেন না ; তিনি সর্বদা নকশা একবারই চূড়ান্তভাবে আঁকতেন। তাঁর রঙ কখনও রেখার আউটলাইন উপছে বাইরে যেত না, সর্বদাই সীমান্তরেখার মধ্যে আবদ্ধ থাকত। রেখা প্রায়ই হত কঠিন তারের মত সূক্ষ্ম, ঋজু, কিন্তু ফিগরের ভিতরের রেখা প্রায়ই হত রঙিন পটি। আউটলাইনের ভিতরে তিনি অদ্ভুত নতুনত্ব আনলেন ; নানা রঙ একের পর এক লেপে দিয়ে আনলেন অপূর্ব জমক এবং আলো, শুধুমাত্র আলো এবং রঙের সাহায্যে ফিগরের নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ করলেন ; যাবতীয় স্তর, বা প্লেন হল রঙের তৈরি ; জটিল মিশ্রিত রঙের একটি জমির সঙ্গে সেই ধরনেই রঙ দেওয়া আরেক খণ্ড জমির সঙ্গে আনলেন বহু বিচিত্র ছন্দ ও কনট্রাস্ট। ভারতীয় মিনিয়েচারে এতদিন রেখা আনতো ছন্দ, রঙ আনতো কনট্রাস্ট। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ দুটি অঙ্গ একসঙ্গে মিলিয়ে

দিয়ে, তার সঙ্গে আলো যোগ করে আনলেন রঙেরই স্পন্দিত, লীলায়িত ছন্দ, কণ্টুরেরই রঙীন কনট্রাস্ট, ফলে ছবিতে এল কঠিন বিচিত্রবর্ণ মজেইকের ঋজুতা। যেহেতু রেখা ভেঙে ভেঙে, হারিয়ে বা গলে গেল না, সেহেতু তা এক পরুষ কঠিন ছন্দের সৃষ্টি করল ; অন্যদিকে বস্তুর আসল সত্তা, তার অন্তর্নিহিত ফর্ম ফুটে উঠল রঙে এবং আলোয়। একমাত্র কালি এবং প্যাস্টেলে আঁকা কতগুলি ল্যাণ্ডস্কেপে তাঁর লাইন অন্তর্হিত হল ; এগুলিতে রঙ এবং আলোই সৃষ্টি করল আকার, সেই সকল রঙীন আকার আবার ছবির কাগজে নিক্ষিপ্ত হয়ে স্পেসকে একান্ত বিশিষ্টরূপে সাজাল। এসব ছবিতে যে ডিজাইন আসে তা ভারতীয় চিত্রে নিতান্তই দুর্লভ।

ভারতীয় চিত্র ঐতিহ্যকে আত্মস্থ করে নতুন বৈচিত্র্য এবং একান্ত বিশিষ্ট মূল্য দিয়েছেন যামিনী রায় (চিত্র ৩৬)। চিত্রের উপাদানগুলিকে তিনি নিরাভরণভাবে ব্যবহার করে চিত্রের মূল উৎসে গেছেন। চিত্র জীবনে অনেক বছর অ্যাকাডেমিক রীতিতে আঁকার পর তিনি তার অসারতা উপলব্ধি করে, ড্রয়িং-এর পুনরুদ্ধারে মন দেন। আস্তে আস্তে, নানা সরঞ্জাম বাহুল্য ছেড়ে, তিনি মোটা বুরুষের সাপ্‌টা টানে রঙিন পটির মত কণ্টুরে ফিগর এঁকে সাদা জমির মধ্যে স্থাপনা করেন। প্রথমে এইসব কণ্টুর হয় সাদা জমির উপর নানা রঙের পটি। এই বিষয়ে আমাদের দেশের পুতুল ও লোকচিত্রের ঐতিহ্য তাঁকে সাহায্য করে। চোখের চেনা-জানার বস্তুর সীমারেখার মত কণ্টুর না এঁকে সমস্ত অলঙ্কার বাদ দিয়ে, নানা চিত্তবিভ্রান্তিকর উপকরণ বর্জন করে, চিত্রিত রেখাকে করলেন একেবারে সংহত, আঁটসাঁট : তাকে এত সরল করলেন যে তাতে ফিগরের শুধু অন্তর্নিহিত জ্যামিতিক রূপ, রস, তাৎপর্যটুকু থাকে ; যার দরুন আমরা চোখের-চেনা ফিগরের সঙ্গে তার মিলটুকু বুঝতে পারি ; যে বিষয় চিত্রিত হয়েছে তার বস্তুনিষ্ঠ রিয়ালিটি সম্বন্ধে যথেষ্ট অবহিত হই, অথচ আমাদের কল্পনা মুক্তি পায়। কিন্তু রঙের অভাবে, শুধু রঙিন কণ্টুরে ড্রয়িং-এর শুদ্ধগুণ আসা সত্ত্বেও, তাঁর ছবি হল একটু গীতিকাব্যধর্মী, লিরিকাল ; সুডৌল রেখা সত্ত্বেও তাঁর ছবি হল রেখাত্মক, লিনিয়ার। এর প্রধান কারণ হল চিত্রের অন্যান্য উপাদান অর্থাৎ রঙ, আলো এবং ডীপ স্পেস বাদ দিয়ে, তিনি শুধু কণ্টুর ও স্পেস নিয়ে ব্যাপৃত ছিলেন বলে। রঙীন পটির চওড়া-সরুর ভিতর দিয়ে তিনি মডলিং-এর পুরো গুণ আনেন। কিন্তু ছবিতে রঙ এবং আলো থাকল না। তখন তিনি কাগজে পাতলা করে ভুসোর আস্তর দিয়ে ভুসোর কালিতে ড্রয়িং আঁকলেন। ভুসোর পাতলা,

গাঢ়-ফিকে আস্তরের উপর, ভুসোর কণ্টুরে আবদ্ধ জমিতে, ভুসোর ফাঁকে ফাঁকে যে সাদা কাগজের আলো ফুটে উঠল তাই হল যথেষ্ট। ছবি মনে হল যেন ছাই রঙের বেলে পাথরে খোদা, তাতে উপকরণের অসাধারণ মিতব্যয়ে ফুটে উঠল পুরো মড্‌লিং, এমনকি ডীপ স্পেসের আভাস, বস্তুর অন্তর্নিহিত সত্তার রঙ। এ ডীপ স্পেসের ধারণা তিনি পরে আরও ভাল করে ফোটান একটি বড় ডিমের আকারের মধ্যে ছোট ডিমের আকারকে অল্প আড়াআড়ি ভাবে রেখে, ছবিতে ভুসো বা যখন বাঁকুড়া অঞ্চলের লাল কাঁকড়ের লালচে ব্রাউন আস্তর পড়ে তখন ছবির জমিতে সেই রঙের বড় বড় ফোঁটায় রঙ দিয়ে ; তাতে চিত্রের যে মনুমেণ্টাল রূপ এল (অর্থাৎ দেখে মনে হয় ইচ্ছেমত অনেকগুণ বাড়ালে তবেই ছবির ফর্মটির খোলতাই হবে) তা সত্যই বিস্ময়কর। কিন্তু রঙ, রেখা, আলো ও স্পেসের যুগপৎ সার্থক সংশ্লেষণের ফলে চিত্রে যে সৃষ্টির সত্যরূপ আসে তা তাঁর ছবিতে তখনও এল না। রঙ এবং আলোর অভাবে তাঁর ছবি একদেশদর্শী হয়ে পড়ল। রেখা এবং কণ্টুরের ছন্দ অস্বাভাবিক প্রাধান্য পেল। তিনি ছবিতে পুনরায় রঙ আনার অনিবার্য তাগিদ অনুভব করে কৃষ্ণ, বলরাম, গোপিনী চিত্রাবলী, পরে রামায়ণ চিত্ররাজিতে, চাপ চাপ সমান উজ্জ্বল রঙ এনে কণ্টুরকে আরও উজিয়ে দিলেন। মাঝে মাঝে আলো দিলেন হলদে পটিতে বা মোটা রেখায়, চোখের সাদায়। রেখা এবং কণ্টুরকে দিয়ে তিনি চূড়ান্ত কাজ করিয়ে নিলেন। শুধু যে রেখায় অসীম শক্তি এল তা নয়, রেখার মধ্যস্থিত জমিতেও এল অপূর্ব আবেগ। ইতিমধ্যে বরাবরই তিনি কিছু ল্যাণ্ডস্কেপ এঁকেছেন, তাতে রঙ, আলো, রেখা এবং স্পেসের ব্যবহার যথেষ্ট সার্থক। কিন্তু তবুও তিনি রেখা এবং কণ্টুরের বেড়াকে ভেঙে তাঁর চিত্র ডিজাইনকে মুক্তি দেবার তাগিদ বোধ করেন। এই সন্ধিক্ষণে হঠাৎ আড়বুননে বোনা তালপাতার চাটাই-এর উপর রঙিন ছবি আঁকা তাঁর শিল্প জীবনে মোটেই আকস্মিক বা খেয়াল খুশীপনা নয়, বরং নিতান্ত ভবিতব্য রূপে দেখা দিল। চাটাই-এর বস্তুগত স্বভাবে, রঙের খণ্ড খণ্ড জমিতে তাঁর সীমারেখা বা কণ্টুর ভেঙে গেল, দুপাশ থেকে কখনও রঙ সীমারেখা টপকে মিশে গেল, কখনও বা কণ্টুর একেবারেই গলে, হারিয়ে গেল। চাটাই-এর বুননের গুণে রঙের ফাঁকে ফাঁকে ভিতর থেকে আলো ঠিকরে উঠল। এইভাবে রঙ, রেখা আর আলো নতুন সংশ্লেষণের মধ্যে পুনর্জন্ম পেল, ছবিতে এক নতুন ঐশ্বর্য এল। এখন মনে হয় যে যে-কণ্টুর তাঁর চিত্রজীবনে বহুদিন অবিচ্ছেদ্য সঙ্গী ছিল সেই কণ্টুর আর আগের রূপে

থাকবে না, তার সঙ্গে রঙ, আলো এবং ডীপ স্পেস ওতপ্রোতভাবে মিশে গিয়ে ভবিষ্যতে তার ডিজাইনের জমক আরও বাড়াবে।

অল্প কথায় বলতে গেলে, ড্রয়িং তখনই রসসিদ্ধ হয় যখন তার মধ্যে বিভ্রান্তিকর আড়ম্বর থাকে না, ছবির মূল ডিজাইনের সঙ্গে অসম্পৃক্ত থাকে না, স্বাভাবিক বস্তুর যথাযথ কণ্টুরের প্রতিচ্ছবি হয় না অথবা তাতে মাত্রাধিক অলঙ্কারগুণ থাকে না। যখন তা এত আঁটসাঁট, এত সংহত, এত সরল হয় যে জাগতিক বস্তুর আকারের পরিচয়টুকু মাত্র থাকে, যার ফলে আমরা তার সত্তা, তাৎপর্যটুকু বুঝতে পারি, বিশ্বজগতের সঙ্গে পরিচয় নিবিড় হয়। অর্থাৎ বস্তুর স্বাভাবিক আকার রেখার কণ্টুরে বা আকারে. ফোটোগ্রাফির যাথাযথ্যে প্রতিফলিত করা ড্রয়িং-এর কাজ নয়।

যিনি সার্থক শিল্পী তিনি ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর সীমান্ত রেখাগুলি স্পষ্টভাবে আলাদা আলাদা খণ্ডে রাখেন, তার মধ্যে কতগুলি অংশকে বিশেষ করে বাছেন, তাদের উপরই তাঁর নজর বিশেষভাবে পড়ে। এইভাবে চোখের-দেখা জগতে বিবিধ বস্তুর স্বাভাবিক বিন্যাসকে তিনি পুনর্গঠিন করেন ; তার ফলে স্বাভাবিক দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি না হয়ে, তা হয় তাঁর একান্ত নিজস্ব ব্যক্তিগত ভাবে দেখা নতুন ফর্ম। রেখার ভিতরে যে জমি আবদ্ধ হয় সেই জমি যেভাবে বদলে যায়, পুনর্গঠিত হয়, তারই জোরে রেখা জোর পায়। অন্যান্য সমস্ত ফর্মের ক্ষেত্রে যে কথাটি খাটে এক্ষেত্রেও তা সত্য ; অর্থাৎ রেখা যেসব সম্বন্ধের প্রবর্তন করে, সৃষ্টি করে, তার মধ্যেই তার একান্ত বৈশিষ্ট্য নিহিত থাকে। যে কোন পেণ্টিং-এ রেখার স্বতন্ত্র, খণ্ড- অস্তিত্ব বিচার করা উচিত নয়। কারণ যে কোন পেণ্টিং-এ রেখা, রূপ এবং ফর্ম পায় অন্যান্য রেখার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে, তাদের সান্নিধ্যে এসে। রসবিচারে রেখার মূল্য নিরূপণ হয় তা অন্যান্য চিত্র উপাদানের সঙ্গে কেমন মিলেছে, মিশেছে, তারই উপর। অর্থাৎ রঙ, আলো, স্পেস, ঘনত্ব বা ম্যাস, ছায়া, রেখা সব মিলে হয় ড্রয়িং।

ড্রয়িং-এর মধ্যেই শিল্পীর একান্ত নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এবং ব্যক্তিত্ব ফুটে বেরোয় ; বোঝা যায় তিনি কতখানি সরল, ঋজু, সত্যাশ্রয়ী, তাঁর মধ্যে কতখানি চালবাজি আছে বা নেই। সেই হিসেবে শিল্পীর ড্রয়িং তাঁর মুখ, তাঁর হাতের লেখা, বা মনের গড়নের মতই একান্ত তাঁর নিজস্ব, তাঁর ব্যক্তিস্বরূপের পরিচায়ক।

রচনা বা কম্পোজিশন

ঠিক যেমন শিল্পী তাঁর ড্রয়িং-এ বস্তুর স্বরূপ বেছে, তার উল্লেখ্য দিকগুলি টেনে বার করে, সেগুলি তাঁর ছবির ডিজাইন অনুযায়ী গড়েন, তেমনি কম্পোজিশন সমস্ত প্ল্যাস্টিক উপাদান উপকরণগুলিকে গুছিয়ে তাদের মধ্যে শৃঙ্খলা এনে, একটি ছবির ফর্মে অখণ্ড করে গাঁথে : সাধারণত চলিত কথায় কম্পোজিশন মানে শুধু বোঝায় ছবিতে ঘনবস্তু, অর্থাৎ ম্যাসগুলি, কি ভাবে সাজানো হয়ে থাকে। কিন্তু কম্পোজিশন মানে শুধু এইটুকু বুঝলে কথাটার প্রতি অবিচারই করা হয়। যে-কোন ছবির কম্পোজিশনের খণ্ডগুলি ম্যাস হতে পারে, নাও হতে পারে, অর্থাৎ ঘনবস্তুই হতে হবে এমন কোন কথা নেই। অন্যান্য উপাদানেও কম্পোজিশন যথেষ্ট সম্ভব, যেমন ভিন্ন ভিন্ন রঙের জমি, আলোর ছোট বড় দ্বীপ, রেখার জ্যামিতিক নকশা বা অ্যারাবেস্ক, কিংবা অন্য যে কোন কিছু, যার সাহায্যে ছবিতে ভারসাম্য এবং অখণ্ডতা আসে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ভিনিশান দ্যুতি, রেমব্রান্টের ছায়াতপ, রেণোয়ারের বর্ণবিস্তার, মাতিসের রঙের নকশিকাঁথা, আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথের বর্ণচ্ছটা, অথবা যামিনী রায়ের কণ্টুর, সবই ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে তাঁদের ছবির প্রত্যেকটি অংশকে এক অখণ্ড ছন্দের সমগ্রতায় ফেলে। বিশেষ করে আধুনিক চিত্রকলায়, যেখানে অপেক্ষাকৃত অপ্রাকৃত, অ্যাবস্ট্রাক্ট ডিজাইনই মুখ্য, সেখানে ছবির সমস্ত অংশই কম্পোজিশনের দিক দিয়ে প্রায় সমান মূল্যের হয়। অন্যপক্ষে ইওরোপীয় চিত্রকলার প্রথম যুগের প্রিমিটিভ বা রেণেসাঁস ছবিতে কম্পোজিশন সাধারণত কেন্দ্র করত কোন বিশেষ ম্যাস বা ভল্যুমকে, অথবা একত্র সন্নিবিষ্ট কতগুলি ভল্যুমকে। অতএব ইওরোপীয় চিত্রে কম্পোজিশনের প্রগতি সম্বন্ধে আলোচনায় আমরা প্রথমে বলব ছবিতে ঘনবস্তুর সংস্থানের কথা, অর্থাৎ সাধারণত যাকে 'ম্যাস কম্পোজিশন' বলে তার কথা। তারপর বলব, যতই দিন গেল ততই কম্পোজিশন কেমন স্বচ্ছন্দ, জড়ত্ববর্জিত, তরল হল, আস্তে আস্তে কি করে রঙের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে যুক্ত হল। রঙের ভাষায় রঙের মাধ্যমে যে কম্পোজিশন হয় সেই হচ্ছে প্ল্যাস্টিক সংশ্লেষণের চূড়ান্ত কীর্তি।

ম্যাস কম্পোজিশনের কতগুলি সাধারণ বা রীতিসিদ্ধ পদ্ধতি আছে। এই পদ্ধতিগুলি ঘুরে ফিরে ছবিতে হরদম আসে ; সে সম্বন্ধে একটু জানা দরকার। ম্যাস কম্পোজিশনের সর্বচেয়ে সরল রূপ হচ্ছে, যেখানে ছবির মধ্যস্থলে থাকে প্রধান ম্যাস অর্থাৎ পিণ্ডটি, তার ডাইনে বাঁয়ে দুধারে ভারসাম্য রাখার জন্য থাকে আরও দুটি ফিগর বা পিণ্ড ; এইভাবে দুধারে, দোরোখা প্রতিসাম্য সাধিত হয়। অনেক সময়ে দুইপাশে দুই ফিগর না থেকে থাকে ফাঁকা জায়গা ; ছবিটি সাদা কাগজে এমনভাবে ন্যস্ত হয় যে, দুপাশের সাদা জমিই স্থিতিস্থাপকতা আনে, মধ্যবর্তী পিণ্ডকে গতিশীল করে। আমাদের দেশে এর অনেক সার্থক দৃষ্টান্ত আছে রবীন্দ্রনাথে ও যামিনী রায়ে। এই সরল ফর্মটি হয় সাধারণত পিরামিডের ফর্ম, খুবই স্পষ্ট আর প্রকট ; কাজেকাজেই তাতে স্থিতিস্থাপকতা যে আপনিই আসবে তা বলাই বাহুল্য। এই ফর্ম সবচেয়ে ঘন ঘন পাই রাফায়েলের মাদোনা ছবিতে, যেমন সিস্তিন মাদোনায় মধ্যবর্তী মাদোনার ডাইনে বাঁয়ে পোপ সিকসটাস ও সেন্ট বার্বারা, পায়ের তলায় দুটি দেবশিশু। সত্য বলতে কি রাফায়েল এই ফর্মকে এত বেশী ব্যবহার করেছেন যে, তাতে তাঁর কল্পনা ও উদ্ভাবনীশক্তির অভাবই প্রমাণ হয়। কিন্তু এই ফর্মটি যতই সামান্য হোক, তার সঙ্গে যখন রঙ, আলো, রেখার নিপুণ, বিশিষ্ট গুণ যুক্ত হয়, যখন সেই সংযোগে বিশিষ্ট চরিত্র ফুটে ওঠে, যেমন ওঠে কাস্তেলফ্রাঙ্কো জর্জনেতে, তখন তা নিতান্ত অসামান্য হয়। আবার যখন মধ্যবর্তী পিরামিডের দুইধারে দুটি ফিগর বা ভল্যুম নিছক ভারসাম্য সাধন না করে তাদের পরিবর্তে আমরা অন্য ধরনের ভল্যুম পাই, যাদের কাজ মোটামুটি একই কিন্তু যা নতুনত্বে আমাদের বিস্মিত করে, অথচ ভারসাম্যের প্রতি আমাদের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষাকেও পরিতৃপ্ত করে, তখন বিভিন্ন ম্যাসের এই ধরনের সংস্থানে অনেক বেশী ব্যঞ্জনা আসে, শিল্পীর একান্ত নিজস্ব ব্যক্তিত্বও অনেক বেশী ফুটে ওঠে। যেমন তিশানের "ইমায়ুসে খ্রীষ্টের শিষ্যগণ" ছবিতে মধ্যবর্তী ফিগরের ডানদিকে যতগুলি ফিগর আছে বাঁয়ে তার চেয়ে বেশী আছে ; কিন্তু ডানদিকে ফিগরের স্বল্পতার পরিপূরক হিসেবে আছে একটি খোলা জানালা, তার মধ্যে একটুক্‌রো ল্যাণ্ডস্কেপ ; তাতে ডিজাইনটি আরও খোলতাই হয়, ছবির ঐক্য বা অখণ্ডতা নষ্ট হয় না, উল্টে বৈচিত্র্য বেড়ে যায়।

এই ধরনের কম্পোজিশনে মধ্যবর্তী ম্যাস বা পিণ্ডটিই দুইধারের বা অন্যান্য ম্যাসকে একত্রে বেঁধে রাখে। মধ্যবর্তী ফিগরটিই সবচেয়ে প্রধান

হয়, সবচেয়ে বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সুতরাং মধ্যবর্তী ফিগর ও দুইপাশের ফিগরের মধ্যে যে সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, তার প্ল্যাস্টিক মূল্য এবং বর্ণনাত্মক বা সাহিত্যিক অথবা মানবিক মূল্যের মধ্যে সুস্পষ্ট যোগাযোগ থাকে। অর্থাৎ এ ধরনের ফর্মে চিত্রের নির্মাণগত রূপে আপনা আপনি চিত্রবহির্ভূত অন্য রস এসে যায়। কিন্তু যে বস্তুটি চিত্রের বিভিন্ন অংশকে একসঙ্গে বেঁধে রাখে, বর্ণনার দিক দিয়ে তা নেহাৎ গৌণ হতে পারে ; যথা তিশানের 'জুপিটার' এবং 'অ্যাণ্টিওপি' চিত্রে কিউপিডের ফিগর বা কজিমো রসেল্লির 'ফেরো কর্তৃক লোহিত সাগর ধ্বংস' চিত্রে গাছের নকশা। সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের, ভিন্ন গোত্রের কম্পোজিশনও খুবই সম্ভব এবং সফল হতে পারে। যেখানে মধ্যবর্তী ম্যাস বা পিণ্ডটি আর প্রধান আকর্ষণ-কেন্দ্র থাকে না ; যেমন, জর্জনের 'খোলা মাঠে কনসার্ট' ছবিতে। আবার অনেক ছবিতে মধ্যস্থলবর্তী ম্যাস আদৌ নেই, যেমন জত্তোর কোন কোন আসিসি ফ্রেস্কোয় অথবা কাংড়া কলমের 'লঙ্কাদাহন' ছবিগুলিতে। এসব ছবিতে বিভিন্ন অংশগুলি বিক্ষিপ্ত হয়ে খুলে খুলে পড়ে না, তার কারণ তাদের মধ্যে কতগুলি সূক্ষ্ম সম্বন্ধসূত্র স্থাপিত হয়, তারই মাধ্যমে শিল্পীর গ্রুপিং সম্বন্ধে আন্তরিক বোধ ও অনুভূতি প্রকাশ পায়। এই 'গ্রুপিং সম্বন্ধে আন্তরিক বোধ ও অনুভূতি' বলতে নানা বস্তুর মধ্যে ছন্দোময় সমন্বয়বোধই বোঝায় ; এবং প্ল্যাস্টিক আর্টে এই বোধ অন্যান্য উপাদানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট না হয়েও স্বতন্ত্রভাবে থাকতে পারে ; যেমন রাফায়েলের ছবিতে রঙের চেয়ে কম্পোজিশন বোধ অনেক বেশী ভাল।

কিন্তু সার্থক চিত্রে সমস্ত উপাদানগুলির সমন্বয় ও সংশ্লেষণ হয়. তার মধ্যে ঘনবস্তু বা ম্যাসের যথাযথ সংস্থান বা নিয়োগ একটি অঙ্গ মাত্র। শ্রেষ্ঠ ছবি সর্বদা রঙ দিয়ে রচিত বা কম্পোজড হয়, অতএব তাতে রঙ আর রচনা অভিন্ন হয়। পিয়েরো দেলা ফ্রাঞ্চেস্কা বা জত্তোয় রঙ ও রচনা একত্রে দৃঢ়ভাবে মেশে ; তাতে তাঁদের ছবি নিতান্ত বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিপূর্ণ হয়। জর্জনের 'খোলা মাঠে কনসার্ট' ছবিতে রঙের ছন্দগুলি ছবিকে একত্রে বাঁধে. তার সঙ্গে থাকে রেখা এবং ঘনবস্তুর ক্রমিক পর্যায় বা সিকোয়েন্স। তিশানের 'এনটুমমেণ্ট' ছবিতে বিচিত্র, গভীর জমকালো রঙ সমস্ত ক্যানভাসে পরিব্যাপ্ত হয়ে ছবির বিভিন্ন খণ্ডগুলিকে একসঙ্গে বাঁধে। মধ্যবর্তী গ্রুপের ডাইনে বাঁয়ে নতদেহ ফিগরগুলির আল্‌খাল্লার রঙ ফ্রেমের কাজ করে, যার মধ্যে মধ্যবর্তী গ্রুপটি আবদ্ধ হয়ে ছবিটিকে অখণ্ড করে। তিন্তোরেত্তোর 'স্বর্গ' ছবিতে রঙ যেভাবে ছন্দের ক্রমিকতা সৃষ্টি করে তার

সঙ্গে রেখার ছন্দ ওতপ্রোতভাবে মিশে যায়, তার ফলে আবর্তিত গতির সৃষ্টি হয়, এই ঘূর্ণি বা আবর্তই হয় ছবির ডিজাইনের মূল সুর। সর্বকালের সব শ্রেষ্ঠ ছবির মত এখানেও রঙ ও রচনা যতই একাত্ম হয়েছে ততই ছবিটি প্রাণবন্ত, প্রতীতিময়, সত্যরূপে মণ্ডিত, বিশিষ্ট, ব্যক্তিত্বপূর্ণ হয়েছে, ততই গতানুগতিক অ্যাকাডেমিক রীতিকে ছাড়িয়ে উঠেছে। কম্পোজিশনের আরেকটি অঙ্গ হচ্ছে আলোর সংস্থান। রঙের মতই আলো ও ক্যানভাসের নানা জায়গায় পড়ে নিজস্ব একটি প্যাটার্নের সৃষ্টি করে। সেই প্যাটার্নের মধ্যে কোথায় কোন ফিগর বা বস্তু কিভাবে আছে, তার উপর তার মূল্য এমন কি ক্রিয়াও বদলায়। প্ল্যাস্টিক ফর্ম থেকে আলোর প্যাটার্ন আলাদা করা না গেলেও তাকে আলাদাভাবে বোঝা যায় ; যেমন তিশানের 'দস্তানা হাতে লোক' ছবিটির কম্পোজিশনের প্রাণই হচ্ছে তার আলোর প্যাটার্ন। অর্থাৎ কম্পোজিশন হচ্ছে ছবির সমগ্র ডিজাইনটির সবচেয়ে বড় অঙ্গ। ছবিতে সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে ডিজাইন, তারপর তার কম্পোজিশন ; সুতরাং সবকিছু বাদ দিয়ে ছবিতে কম্পোজিশন বিচার করার যেসব অ্যাকাডেমিক বাঁধা গৎ আছে, তার অধিকাংশই নিরর্থক। যেসব রেখা বিষয়বস্তুর সীমারেখা বা কণ্টুর দেখায় কম্পোজিশনের পক্ষে সেগুলি খুব দরকারী। যেমন কুর্বের 'চিত্রশিল্পীর স্টুডিও' বা পুস্যাঁর 'জেরিকোর অন্ধগণ' ছবিতে শুধু যে ছবির মধ্যবর্তী একটি বিন্দুর চারদিকে সংস্থাপিত হয়ে ফিগরগুলি বাঁধা থাকে তা নয়, একটি ঘনবস্তু থেকে আরেকটি ঘনবস্তুতে 'লিনিয়ার এফেক্ট' সঞ্চারিত হয়ে ছবিতে ঐক্য আনে। ফলে সমস্ত কম্পোজিশনটি বহতা হয়, মোটেই অনড়, স্থাণু হয়ে থাকে না। কম্পোজিশন থেকে যদি রেখাকে বার করে নেওয়া যায় তাহলে দেখা যাবে রেখাই একটি প্যাটার্নের সৃষ্টি করেছে ; সেই প্যাটার্নই আবার সৃষ্টি করেছে অন্যান্য গৌণ প্যাটার্নের-সমষ্টি ; সেগুলি পরস্পরের মধ্যে মিশে গেছে। সমস্ত আঁটবুননের কম্পোজিশনেরই একটি উল্লেখযোগ্য লক্ষণ হচ্ছে ছবির মধ্যবর্তী ফিগরের সঙ্গে সম্বন্ধ রেখে চারপাশে রেখার বুনন। যেমন লেওনার্দোর 'ভার্জিন, সেন্ট আান এবং শিশু যীশু' অথবা রাফায়েলের 'প্রথম ফ্রাঁসোয়ার পূত পরিবার' ছবিতে ফিগরগুলি একত্রে এবং আলাদা আলাদাভাবেও কতগুলি ফোকাল পয়েন্ট বা দৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দু তৈরি করে, যার চারধারে তিনমাত্রিক রেখার জাল ঘোরে। রেখার প্যাটার্ন অসংখ্য উপায়ে নিজেদের মধ্যে বৈষম্য আনতে পারে, পরস্পরকে দৃঢ় করে, উজিয়ে দিতে পারে। স্পেস সম্বন্ধে শিল্পীর কতখানি বোধ আছে তারই

উপর অবশ্য এই ধরনের বৈচিত্র্য নির্ভর করে। যেমন উচ্চেল্লোর 'সান রোমানোর ফৌত' ছবিতে যে প্ল্যাস্টিক ফর্ম পাই তার কম্পোজিশনের প্রধান উপকরণই হল 'লিনিয়ার এফেক্ট', যা নাকি বিষয়বস্তু থেকে স্পষ্টই স্বতন্ত্র এবং আলাদা করে ভাবা যায়। এতেই আরো বোঝা যায় কেন সমস্ত কিছু প্ল্যাস্টিক উপাদানকে ছবিটির ডিজাইনের সঙ্গে মিলিয়ে বিচার করা উচিত। অ্যাকাডেমিক মানদণ্ডের বিচারে বলতে হয় উচ্চেল্লোর ছবিতে কম্পোজিশন নেই। কিন্তু ছবির সমগ্র ডিজাইনটি যদি মনে রাখি তাহলে বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক সম্বন্ধগুলি স্পষ্টভাবে ফুটে উঠবে। অপ্রাকৃত জ্যামিতিক রূপের দিক দিয়ে উচ্চেল্লোর ফর্মের সঙ্গে কিউবিজমের মিল আছে। অতএব তাতে প্রতিচ্ছবিমূলক সততা কতখানি আছে সে বিচার অবান্তর।

কম্পোজিশনে সব সময়ে যে কোন একটি ফিগর বা ম্যাস আলাদাভাবে একটি অংশ হিসেবে কাজ করে তা নয়। কখনও বা একটি ফিগর বা ম্যাস একটি পুরো গ্রুপের অংশ হয়ে থাকে, সেই গ্রুপটি আবার কম্পোজিশনে একটি অংশের কাজ করে। এটা সাধারণত বেশ বড় ছবিতে হয় : সেখানে কম্পোজিশনও খুব জটিল এবং জোরালো হয়। সে সব ক্ষেত্রে একেকটি গ্রুপের মধ্যে আবার গৌণ কম্পোজিশন দেখা দেয়। ঠিক যেমন ইওরোপীয় সঙ্গীতে সিম্ফনিতে কয়েকটি অংশ বা মুভমেণ্ট থাকে ; তার একেকটি মুভমেণ্টই পুরো কম্পোজিশন হয় ; আবার সবকটি মুভমেণ্ট মিলে সিম্ফনিটির বৃহত্তর কম্পোজিশন তৈরি করে। যেমন ফ্রাঞ্চেসকো দি জর্জোর 'ইওরোপা হরণ' ছবিতে গাছলতাপাতার সমস্ত গ্রুপটিই একটি সমগ্র ম্যাস হয়, যার মধ্যে আবার একেকটি গাছ তার ডালপালাপাতা নিয়ে গৌণ কম্পোজিশনের সৃষ্টি করে। তেমনি রেমব্রান্টের 'নির্দয় ভৃত্য' ছবিটিতে ডানদিকের তিনটি ফিগর মিলে একটি মাত্র ম্যাসের সৃষ্টি করে এবং তিনে মিলে বাঁদিকের একটিমাত্র ফিগরের সঙ্গে ভারসাম্য রাখে ; কিন্তু ডানদিকের তিনটি ফিগরের প্রত্যেকটি আবার স্পষ্টভাবে আলাদা হয়ে থাকে এবং আলাদা কম্পোজিশন হিসেবে প্রত্যেকটিই সার্থক। যে কোন মহৎ চিত্রে গৌণ কম্পোজিশনগুলি ছবির সমগ্র ডিজাইনে খুব মানিয়ে যায়, উপরন্তু সমগ্র ডিজাইনটির মূল্য বাড়ায়। নিরেস ছবিতে গৌণ কম্পোজিশনগুলি খণ্ড খণ্ডভাবে ভাল হতে পারে, কিন্তু তাতে ছবির সমগ্র ডিজাইনের গৌরব বাড়ে না। যেমন বত্তিচেল্লির 'মোজেসের জীবনে কয়েকটি ঘটনা' ছবিটি আসলে দুটি আস্ত আলাদা ছবি ; তারা দুই ভাগে

মিলে কিছুতেই একটা অখণ্ড কম্পোজিশন হয় না ; অথচ কজিমো রসেল্লির 'ফেরো কর্তৃক লোহিত সাগর ধ্বংস' ছবিতে দুটি আলাদা বিষয় বেশ এক হয়ে মিলে গেছে, তিশানের 'অসাম্পশান' ছবিতে বিভিন্ন অংশ বা গ্রুপ খুব আশচর্যভাবে মিলে অখণ্ড কম্পোজিশন হয়েছে ; তাদের রেখা এবং ঘনবস্তুর ছন্দ জোর পেয়েছে আলো, রঙ এবং স্পেস থেকে ; সব মিলে ছবিকে এক অদ্ভুত সুষমামণ্ডিত অখণ্ডতায় বেঁধেছে ; ছবিতে মানবিক গুণ এবং প্ল্যাস্টিক গুণ একাকার হয়ে মিশে গেছে। রাফায়েলের 'ট্রান্সফিগরেশন' চিত্রের কম্পোজিশনের কাঠামোটি তিশানের ছবির সঙ্গে প্রায় এক ; অথচ রাফায়েলের ছবিতে কম্পোজিশন হয়েছে নিতান্ত উপর উপর, অগভীর, ফাঁপা।

যখন পশ্চাৎপট বা ব্যাকগ্রাউণ্ডের সঙ্গে সমুখের ফিগর বা ম্যাসের সম্বন্ধ নির্ণয়ের কথা ওঠে তখনই স্পেস-কম্পোজিশন সম্বন্ধে আলোচনা এসে পড়ে। যে সব ছবি রসের বিচারে একেবারে শ্রেষ্ঠত্বের চূড়ায় স্থান পেয়েছে বলা যায় তাদের প্রায় সবকটির কম্পোজিশনেই তৃতীয় মাত্রা বা তৃতীয় ডিমেনশন কোন না কোনভাবে সার্থক হয়েছে। এমন কি যেসব পেণ্টিং নিজেদের সমান, চ্যাপটা, বা ফ্ল্যাট বলে স্পষ্টত ঘোষণা করে যেমন মাতিসের বা মানে'র ছবি, সে সবেও সবকিছুই যে একস্তরে থাকে তা মোটেই নয়। এসব ছবিতে যদিও স্পেসগত গভীরত্বের উপর ঝোঁক নেই, তবুও তার অভাবও নেই। এ বিষয়ে আমাদের দেশে গৌণভাবে তুলনা চলে যামিনী রায়ের ছবির সঙ্গে ; তাঁর কণ্টুরে আঁকা ছবি যদিও দুইমাত্রিক, তবুও কণ্টুরের পটির সরু-মোটার বৈচিত্র্যের মধ্যে, একটি ডিম্বাকৃতি জমির সঙ্গে আরেকটি ডিম্বাকৃতি জমির সম্বন্ধের মধ্যে দিয়ে, পুরো মডলিং অর্থাৎ তিনমাত্রার আভাস আশ্চর্য মিতব্যয়ে ফুটে ওঠে। ইওরোপীয় পোর্ট্রেটের কথাই ধরা যাক : একটি মাত্র মাথা আর তার পিছনের জমিই ছবিটির কম্পোজিশন নির্ণয় করে। মাথা আর তার পিছনের জমির মধ্যে যে সম্বন্ধ স্থাপিত হয় তার অনেকখানি করে রঙ, আবার অনেকখানি করে যাকে আমরা সংকীর্ণ অর্থে বলি কম্পোজিশনের নিজস্ব যন্ত্রপাতি। কখনও পোর্ট্রেটের রেখাগুলি যে প্যাটার্নের সৃষ্টি করে সেগুলি পশ্চাদপটেও কাজ করে ; আবার কখনও বা আপাতাদৃষ্টিতে দুইয়ের মধ্যে কোন সম্বন্ধই থাকে না, যেমন পিজানেল্লোর 'এস্তে বংশের রাজকুমারী' ছবিতে। এই ছবিটিতে পশ্চাৎপটের লতাপাতাফুলের সঙ্গে মেয়েটির মাথার চিত্রগত প্ল্যাস্টিক রূপের কোন সম্বন্ধই যেন নেই ; অথচ প্রকৃতপক্ষে দুইয়ের মধ্যে সম্বন্ধ

নিতান্ত ওতপ্রোত ; অঙ্গাঙ্গী এবং এই সম্বন্ধ সাধিত হয়েছে ছন্দের প্যাটার্নের পুনরাবৃত্তিতে। ফ্রা ফিলিপ্পো লিপ্পির 'ভার্জিন কর্তৃক শিশুর (যীশু) আরাধনা' ছবিটিতে মধ্যবর্তী ফিগ্‌রগুলি ও পিছনের পশ্চাৎপটের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং ছবিটির পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়, যদিও প্রথম দেখলে মনে হয় পশ্চাৎপটের যাবতীয় বস্তু পর্দার প্যাটার্নের মত করে আঁকা মাত্র। অন্যপক্ষে পশ্চাৎপট অত্যন্ত সরল সামান্য হতে পারে, যেমন রেমব্রান্টের 'হেন্ড্রিকে স্টোয়েফেলসে' অথবা তিশানের 'দস্তানা হাতে লোক'-এ। দুটি ছবিতেই অতি সূক্ষ্ম, নিপুণ দক্ষতার সঙ্গে ফিগরদুটি পশ্চাৎপট থেকে আস্তে আস্তে বার করে সমুখে আনা হয়েছে। দুটি ছবিতেই অতল গভীরত্বের আভাস যেভাবে আসে, তা স্পেস-কম্পোজিশনের ইতিহাসে চিরকালের বিস্ময়স্থল হয়ে থাকবে। সেই তুলনায় রুবেন্সের 'বার্ঁ আঁরি দো ভিক' ছবিতে পিছনের জমির ওপর মাথাটি যদিও বেশ বাহাদুরি করে সংস্থিত হয়েছে, তবুও তিনি যেসব উপাদানের সাহায্য নিয়েছেন, অর্থাৎ কড়া বৈষম্যমূলক রঙ, সেগুলি বড় সহজেই বোঝা যায় ; মনে হয় নিতান্ত মুন্সিয়ানা কাজ। তাছাড়া তাঁর ছবির উপকরণবাহুল্যও তিশান বা রেমব্রান্টের সংযম ও মিতব্যয়ের তুলনায় তাঁর কাজের রসাত্মক মূল্য অনেক কমিয়ে দেয়।

স্পেস-কম্পোজিশন আসে মুখ্যত পারস্পেকটিভের ব্যবহারে এবং সবচেয়ে সার্থক হয় যখন তার নির্মাণে রঙই সবচেয়ে বড় উপাদান হয়। কিন্তু নিপুণ পারস্পেকটিভ হলেই স্পেস কম্পোজিশনও যে সঙ্গে সঙ্গে খুব ভাল হবে তা নয়। নিপুণ পারস্পেকটিভ আর সার্থক কম্পোজিশনের মধ্যে তফাৎ হচ্ছে এই যে, সার্থক স্পেস-কম্পোজিশনে শুধু যে গভীরত্বের অনুমান বা ভ্রম খুব ভালভাবে আসবে তা নয়, উপরন্তু ছবির ফিগর বা বস্তুগুলির মধ্যে যে-ব্যবধান, যে পরিসর থাকে, সেই পরিসরের মধ্য যে পারস্পরিক দূরত্ব থাকে, সেগুলিও চোখকে খুব আরাম দেবে ; এবং এই ব্যবধান রচনার মধ্যেই থাকবে শিল্পীর নিজস্ব অনুভূতি, বোধ, ব্যক্তিত্ব, তাতে নিছক বাস্তবে যেরকম ব্যবধান থাকে শুধু তাই থাকবে না। কারণ বাস্তব জগতে চোখে যেভাবে পারস্পেকটিভ ভাসে, সেইটেই যথাযথ দেখানো সার্ভেয়ার বা সিভিল এঞ্জিনিয়ারের কাজ, চিত্রকলার কাজ নয়। ছবিতে যখন ভাল মত স্পেস-কম্পোজিশন হয় তখন তার মধ্যে বস্তুগুলি জড়াজড়ি বা ভীড় করে থাকে না ; প্রত্যেক বস্তুই তার নিজের চারপাশে স্পেস বা খালি জায়গার আভাস নিয়ে থাকে ; প্রত্যেকেরই চারধারে এমন

জায়গা থাকে যেন সরে নড়ে বসতে পারে, সে জায়গা যত কমই হোক না কেন। এই ভাবে চিত্রের বস্তুগুলির পরস্পরের মধ্যে শৃঙ্খলা এলেই তবে ছবির স্পেস-কম্পোজিশন সমগ্রভাবে সার্থক হয়, চিত্রে রসসৃষ্টি হয়।

এমন কি স্থাপত্যে, ভাস্কর্যেও, যেখানে স্পেস সশরীরে বর্তমান, সেখানেও প্রাণবন্ত, ব্যক্তিগত, বৈশিষ্ট্যময় স্পেসের সামঞ্জস্য সাধন— যাতে গভীরত্ব ও বিস্তারের বোধ অনুভূতি আসে— এক কথা, আর সেটিকে তিনমাত্রিক মাধ্যমে পরিষ্কার করে ফুটিয়ে তোলা আরেক কথা। আদিম নিগ্রো ভাস্কর্যে তিনমাত্রার মাধ্যমে বস্তুত আকারের বোধ যতখানি আসে গ্রীক ভাস্কর্যেও ততখানি আসে না।

তিনমাত্রিক কম্পোজিশনে দুইমাত্রিক কম্পোজিশনের সবকটি গুণ আরও ফলাও করে ফুটে ওঠে। শূন্যে নিক্ষেপ এবং প্রতিনিক্ষেপ, ভারসাম্য, ছন্দ, আলোছায়ার খেলা সবই অনেক বেশী বিচিত্র, শক্তিশালী হয়। সত্যকারের স্পেস সম্বন্ধে বোধ আসে, সেগুলি ছন্দে ছন্দে ভাগ হয়ে যায়। ক্লোদ, পুস্যাঁ, পেরুজীনো, রাফায়েল এবং সব শ্রেষ্ঠ ভিনিশান শিল্পীদের ছবিতেই এই গুণটি দেখা যায়। স্পেসের ব্যবহারে রাফায়েলের জুড়ি মেলা ভার। মধ্য ইটালির স্বচ্ছ, পরিষ্কার, পার্বত্য হাওয়া নিশ্চয় তাঁকে এবং পেরুজীনোকে এ ব্যাপারে সাহায্য করে; কারণ এই রকম হাওয়াতেই গভীর স্পেসে বিভিন্ন ম্যাসের নানারকম সম্বন্ধ খুব স্পষ্টভাবে চোখে প্রতীয়মান হয়। ঠিক সেই কারণেই তিব্বতী টাংকায় মহাশূন্যে সংস্থিত পাহাড়, মেঘ, নানারকম ফিগর, এত স্পষ্টভাবে স্পেসের বোধ দেয়।

পুস্যাঁর প্রায় প্রতিটি ছবিতেই শুধু যে দূরত্ব সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা জন্মায় তা নয়, বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে ব্যবধান ও পরিসর সম্বন্ধেও আশ্চর্য বোধ আনে (চিত্র ১৫)। বিভিন্ন ম্যাসগুলি সামনে, পিছনে, নিজেদের মধ্যে, স্পষ্ট সম্বন্ধে, দূরত্বে গ্রথিত; সেই সঙ্গে ক্যানভাসেও তাদের সংস্থান স্পষ্ট বোঝা যায়। এইভাবে পরস্পর সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়ে তারা ছবির সাধারণ প্ল্যাস্টিক ডিজাইনটিকে নির্মাণ করে। স্পেসে যে ডিজাইনটি তৈরি হয়, রঙ তার জলুস এবং শক্তি বাড়ায়; রঙ থেকে তা প্রথমত পায় স্পর্শগ্রাহ্য, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণ; দ্বিতীয়ত বিভিন্ন রঙগুলিই আবার ছবিতে বিচিত্র সম্বন্ধের সৃষ্টি করে, গৌরব বাড়ায়, তার উপরে থাকে রেখা, আলো, ছায়া। সব মিলে অতি চমৎকার পরিষ্কার, ঝরঝরে, হালকা, লালিত্যময় ডিজাইন হয়, যেন চারদিকে হাওয়া খেলে বেড়াচ্ছে। জর্জনের 'খোলা হাওয়ায়

কনসার্টে' নীল এবং সোনালি দিগ্‌রেখার সঙ্গে ল্যাণ্ডস্কেপের সমস্ত অংশগুলি যে সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়, তাতে রহস্য, প্রেম, রোমান্স, জাঁকজমকের আবেশ অনেক বেড়ে যায়। ক্লোদের ছবি আরও বেশী রোমান্টিক, ঢের বেশী রাজকীয়, জমকালো ; তার ফল প্রায় আজগুবি হত, যদি না তাঁর ছবিতে অনন্ত ; উন্মুক্ত, স্পেস থাকত, যার কৃপায় তাঁর আলোর বিশাল বিশাল প্যাটার্নগুলি বাস্তবের ভিত্তিতে দাঁড়ায়, সত্য হয়। উপরন্তু তাঁর ছবিতে বিভিন্ন বস্তুর পরিসর, ব্যবধানগুলি যেভাবে বিন্যস্ত হয়, যেভাবে পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধযুক্ত হয়, তাতেই ছবির প্রসাদগুণ বেড়ে যায়। জত্তোর ছবি স্পেস-কম্পোজিশনের খুব উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। অ্যাকাডেমিক বিচারে তাঁর পারস্পেকটিভে যথেষ্ট দোষ আছে, কিন্তু ডীপ স্পেসে অথবা গভীর শূন্যে প্রত্যেকটি বস্তু অমোঘ হাতে ন্যস্ত করার ব্যাপারে তাঁর প্রতিভা ছিল অসীম। এই ধরনের বিন্যাস হত যেমন বিচিত্র, তেমনি শক্তিশালী এবং প্রতিবারই আশ্চর্যরকম নতুন, গতানুগতিকতা বর্জিত। কিন্তু প্রতিবারই তা হত যেন যথোচিত, তেমনি সমগ্র ডিজাইনটির সঙ্গে একান্ত সঙ্গত।

অন্যান্য সব প্লাস্টিক ক্রিয়ার মতই স্পেস-কম্পোজিশন সবচেয়ে সার্থক হয় যখন তা রঙের মাধ্যমে, রঙের ভাষায় সাধিত হয়। সেজানের সমস্ত ছবিতে রঙই হচ্ছে মূল উপাদান, রঙই তাঁর সব ছবিকে গড়ে, সাজায়। কম্পোজিশনে রঙ কত একান্তভাবে আবশ্যক, তা বোঝা যায় গভীর স্পেসে ভল্যুমগুলিকে সেজান কত গতিশীলভাবে সাজান তার থেকে। কিন্তু সেজানের চেয়েও ভাল দৃষ্টান্ত আমরা পাই রেণোয়ারে, বিশেষ করে তাঁর ১৯০০ সালের পরের কাজে। রেণোয়ারে রঙ এমন স্বচ্ছন্দে কণ্টুর উপছিয়ে যায় যে, স্পেসে বিভিন্ন বস্তুর ব্যবধান মুখ্যত রঙের সাজে দেখা দেয়। তাঁর অনেক ছবিতে রঙ যেন সমস্ত অংশগুলি রাঙিয়ে, চুবিয়ে দেয়, বিভিন্ন অঙ্গগুলিকে এক অবিচ্ছেদ্য অখণ্ড সমগ্রতায় গেঁথে দেয়। অন্যান্য সব প্ল্যাস্টিক উপাদানের মতই স্পেস-কম্পোজিশনে আতিশয্য এলে তাতে অত্যধিক ঝোঁক পড়লে অ্যাকাডেমিক হয়ে যাবার সম্ভাবনা আসে। উদাহরণস্বরূপ পোরুজীনোর 'খ্রীষ্ট পীটরকে চাবি দিচ্ছেন' ফ্রেস্কোটির উল্লেখ করা যায়। ছবিটিতে ফিগরগুলির গ্রুপিংএ পায়ের তলায় বাঁধানো সানের রেখার প্যাটার্নে, দক্ষতা এবং কৌশল এত বেশি প্যাঁচ প্যাঁচ করে ফুটে উঠেছে যে তার ফলে ছবিটি শস্তা খেলো হয়ে গেছে। টার্নারের 'ডাইডো কার্থেজনগর নির্মাণ করছেন' ছবিটিতেও স্পেস নিয়ে একই

ধরনের বড় বেশি মাতামাতি দেখা যায়, কিন্তু এক্ষেত্রে ক্রোদ থেকে তাঁর চুরি এত বেশী স্পষ্ট যে, ছবিটি এমন কি অ্যাকাডেমিক পর্যায়েও পড়ে না, নিছক পরস্বাপহরণ মত দেখায়।

প্রাচ্য চিত্রে সরল ও স্পেস-কম্পোজিশনের চূড়ান্ত নিদর্শন পাওয়া যায় চীনে ছবিতে। ফাইডন প্রেস কর্তৃক চীনে এবং জাপানী চিত্রকলার যে অ্যালবাম দুটি প্রকাশিত হয়েছিল সহজলভ্য বলে এখানে তার উল্লেখ প্রাসঙ্গিক হবে। চীনে ছবির স্বরচিত ফ্রেমের মধ্যে নিখুঁত সংস্থানের সঙ্গে বস্তুকে এমনভাবে আঁকা হয়, যাতে তার চতুর্দিকে স্বচ্ছন্দে হাওয়া খেলে বেড়ায় ; ফলে অসীম বিশ্বের আভাসের সঙ্গে গতিমুখরতার ব্যঞ্জনা এত সুন্দরভাবে আসে যা পৃথিবীর চিত্রকলার ইতিহাসে দুর্লভ। দ্বিতীয়ত খুব কম চীনে ছবিই আছে, যাতে কম্পোজিশন নিছক প্রতিসাম্য বা সিমেট্রি-নির্ভর। প্রায় প্রতি কম্পোজিশনই অসম ম্যাসের মধ্যে ডাইনামিক পয়েণ্ট বা গতিশীল বিন্দুটি অভ্রান্তভাবে সৃষ্টি করে, যাব ফলে ছবি ছন্দে, কর্মব্যস্ততায়, গতিতে চঞ্চল হয়ে ওঠে, অথচ আত্মস্থ থাকে। ভারতীয় চিত্রে অজন্তার কম্পোজিশন সম্বন্ধে এই প্রবন্ধের অন্যত্র বিশদভাবে আলোচনা আছে, কিন্তু ভারতীয় মিনিয়েচারেও কম্পোজিশন এবং প্রাচ্য পারস্পেকটিভ কত সার্থকতা লাভ করতে পারে, তা ললিতকলা অ্যাকাডেমি কর্তৃক প্রকাশিত 'মুঘল মিনিয়েচার' বইটি দেখলে বোঝা যায়। হামজানামা বা আনোয়ার-ই-সুহায়লির কতগুলি ছবি আছে যার ড্রয়িং স্পষ্টতই রঙের ভাষায় রচিত, রঙ উপরের আস্তর বা আবরণ মাত্র নয়। স্পেসের ব্যবহার অতুলনীয়, তার সঙ্গে রেখা ও রঙ যুক্ত হয়ে অনেক মিনিয়েচারই ডিজাইনের দিক থেকে অনবদ্য। আবার, অনেক মিনিয়েচারে আলো অবর্তমান থাকায় এবং মাঝে মাঝে রঙ প্রলেপমাত্র হওয়ায়, ছবি স্থাণু ও অলঙ্কারাত্মক হয়, যথেষ্ট পরিমাণে গতিশীল হয় না। ফলে বহুক্ষেত্রে নিছক নৈপুণ্য, কৌশল, এমনকি গতানুগতিক বাঁধা ছকই, প্রকাশ পায় বেশি ; শিল্পীর আপন বক্তব্য বা ব্যক্তিস্বরূপের পরিচয় পাওয়া যায় না। এবং ব্যক্তিত্ব না থাকলে শিল্পে নৈর্ব্যক্তিকতা অর্থাৎ বাস্তবের সত্যরূপের ব্যঞ্জনাও থাকে না। ডিজাইন প্যাটার্নে নেমে যায়।

পরিপ্রেক্ষিত বা পারস্পেকটিভ

সাধারণ আলাপ আলোচনায় আমরা পারস্পেকটিভ সম্বন্ধে নানা আলগা কথা বলি কিন্তু ব্যাপারটি আসলে নিতান্ত অঙ্ক এবং জ্যামিতিশাস্ত্রের কতগুলি সূত্র, যা আয়ত্ত হলে শিল্পী বা এঞ্জিনিয়ার কাগজে বাড়ী, ঘরদোর, মানুষ বা যে-কোন ঘন বস্তুকে বাস্তবরূপের ভ্রম দিতে পারেন। পারস্পেকটিভ ঠিক মত এলেই তবে যে-কোন আঁকা জিনিস ঘন শরীর-ও ওজনবিশিষ্ট মনে হয়, একাধিক চিত্রিত বস্তুর মধ্যে যে সব ফাঁক বা ছাড়া জমি থাকে সেগুলি স্পষ্ট প্রতীতি জন্মায়, মনে হয় যেন বাস্তব জগতে যেমনটি দেখি কাগজেও ঠিক তাই প্রতিফলিত হয়েছে। বাস্তব জগতে যা দেখি তার মূলে আছে দৃষ্টি ও আলোক বিজ্ঞানের গূঢ় সূত্র, যার পুরোপুরি হদিস এখনও পাওয়া যায়নি। চিত্রজগতে বাস্তবের প্রতিচ্ছবির মূলে থাকে পারস্পেকটিভের শাস্ত্র। পাশ্চাত্য পারস্পেকটিভের সবচেয়ে প্রামাণ্য সূত্রকার লেঅনার্দো দা ভিঞ্চি ; চিত্রশাস্ত্র সম্বন্ধে বই আরম্ভই করেন তিনি এই বলে : যিনি গণিতজ্ঞ ন'ন তিনি যেন আমার এই বইটি না পড়েন। চিত্রশাস্ত্র সম্বন্ধে শুরুতেই চিত্রকলাকে তিনি চিত্রবিজ্ঞান বলে আখ্যা দেন। তাঁর মতে সমস্ত চিত্রের মূল ভিত্তি হচ্ছে জ্যামিতিতে। এই অধ্যায় সেই জ্যামিতির প্রাথমিক সূত্রগুলি আলোচনা করব মাত্র। যাঁরা আরও বেশী জানতে চান তাঁরা এই বইগুলি পড়লে বোধহয় উপকৃত হবেন : ডব্লিউ-পি-পি লংফেলোর 'অ্যাপ্লাইড পারস্পেক্‌টিভ ফর আর্কিটেক্টস্ অ্যাণ্ড পেনটার্‌স' (১৯০১) এবং এ-ক্লার্কের 'পারস্পেকটিভ' (১৯৩৬)। একটি বেশ ভাল ছোট বই কিছুকাল আগে বেরিয়েছে, নাম 'পারস্পেকটিভ ড্রয়িং', লেখক এইচ-টি হলিস (১৯৫৫)। তবে সবচেয়ে সুখপাঠ্য হচ্ছে স্বয়ং লেঅনার্দো দা ভিঞ্চির 'নোটস অন এ ট্রিটিস অভ পেন্টিং', পিয়েরো দেলা ফ্রাঞ্চেস্‌কার 'পারস্পেকটিভ' এবং আলবের্তির 'অন পেন্টিং'।

আধুনিক পাশ্চাত্য পারস্পেকটিভের মূল সূত্রগুলি জ্যামিতির ভাষায় সর্ব প্রথম রূপ দেন বোধহয় ব্রুনেলেসকো বা ব্রুনেলেসকি। ইনি ছিলেন ফ্লরেন্সের বিখ্যাত স্থপতি। ১৪২০ সালে তিনি একটি ছোট বই লেখেন।

ব্রুনেলেসকির সূত্রগুলিকে কি ভাবে চিত্রকলায় ব্যবহার করতে হয় তার সর্বপ্রথম বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেন লিওঁ বাতিস্তা আলবের্তি। ১৪৩৫ সালে 'দেলা পিত্তুরা' বলে একটি বই লেখেন। আলবের্তির বইটি রেণেসাঁস চিত্রকলার ভিত্তি বললে অত্যুক্তি হয় না। তাঁর পরে আরেকজন শিল্পী লুকা পাচিত্তলি, 'দিভিনে প্রোপোর্সিয়নে' বলে একটি বই লেখেন। তার পর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বই হয় শিল্পীশ্রেষ্ঠ পিয়েরো দেলা ফ্রাঞ্চেস্কার 'দি প্রসপেত্তিভা'। তার পর লেখেন লেঅনার্দো দা ভিঞ্চি তাঁর জগদ্বিখ্যাত প্রবন্ধ। এর পর জার্মানি থেকে মহাশিল্পী আলব্রেকট ডিউরর ইটালিতে আসেন পরিপ্রেক্ষিত শিখতে। জার্মান সুলভ ধ্যান ও অধ্যবসায়ের ফলে তিনি লেখেন তাঁর প্রামাণ্য বই 'উন্টেরভাইসুং ডের মেস্সুং'। চিত্রশাস্ত্রে পরিপ্রেক্ষিত বিজ্ঞান সম্বন্ধে এঁদের চেয়ে উৎকৃষ্ট লেখা পরবর্তীকালে আর বিশেষ বেরোয়নি, যদিও স্থাপত্য বা বাস্তুশাস্ত্রে পারস্পেকটিভ বিজ্ঞান সম্বন্ধে পরে আরও জটিল ও প্রামাণ্য গবেষণা অনেক হয়েছে।

ইতিহাসের আগের যুগে বা প্রাচীন সভ্যতার যুগে শিল্পী তাঁর চিত্রে ফোটোগ্রাফিক যাথাযথ্য আনার জন্য বিশেষ চেষ্টা করতেন না। অর্থাৎ তাঁরা চিত্রকলায় লোকঠকানো ব্যবসা করতেন না ; বাস্তবের প্রতিচ্ছবির চেয়ে তাঁবা চাইতেন বাস্তবের সত্যরূপ, ফলে তাঁদের ছবির স্পেস ও ঘনত্ব শিল্পের আইনসম্মত হলেও তাদের দৃশ্যমান প্রকৃতির বা নিসর্গের একটু অংশ বলে ভুলের আশঙ্কা ছিল না। যথা ঈজিপশন শিল্পী টেবল-চেয়ার বা অন্যান্য বস্তু সর্বদাই একপাশ করে বা প্রোফাইলে আঁকতেন, সে সব বস্তুর যে পাশগুলি পিছনের দিকে চলে গেছে, তা দেখাবার কোন চেষ্টা ছিল না, ফলে আমরা সমান চ্যাপটা বা ফ্ল্যাট জমিতে ফ্ল্যাট ছবিই দেখি। কিন্তু তবুও শিল্পী কখনও একেবারে ফ্ল্যাট ছবি আঁকতে পারেন কিনা সন্দেহ। ইতিহাসের আগের যুগের গুহাচিত্রেও কন্টুরের রেখা এমন সরু-মোটা করে আঁকা অথবা একই রঙ এমন গাঢ়-ফিকে করে লাগানো যাতে গভীরত্ব ও ঘনত্বের আভাস আসে। জিউক্সিস ও পারাসিআসের গল্পে একটু বোঝা যায় যে প্রাচীন গ্রীক শিল্পীরা আধুনিক পারস্পেকটিভের কাজ জানতেন, যদিও তার বিজ্ঞানটুকু সূত্র আকারে জানতেন কিনা জানা নেই। গ্রীকদের পরবর্তীকালে চীন, ভারত, এসিরিয়া, ব্যাবিলন, এবং ইউরোপের চিত্রে চিত্রশিল্পী যে সর্বদাই ছবিতে স্পেস এবং ঘনত্ব, গভীরত্ব ঠিকমত দেখাবার জন্য সচেষ্ট ছিলেন, গণিততত্ত্বে যেটুকু অজ্ঞ ছিলেন পর্যবেক্ষণের সাহায্যে যে সেটুকু পূরণ করতেন তার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে।

পশ্চিম ইউরোপের চিত্রকলায় পরিপ্রেক্ষিতবিজ্ঞান ভাল করে শেখার আগেও ইওরোপীয় শিল্পী শুধু চোখের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে কত ভাল পরিপ্রেক্ষিত আঁকতে পারতেন তার উদাহরণস্বরূপ সিমোনে মার্তিনির 'সেন্ট অগাস্টিনের জীবনের একটি দৃশ্য'.ছবিটি উল্লেখ করা যায়। ছবিটি ব্রুনেলেস্কির প্রবন্ধের প্রায় আশী বছর আগে আঁকা, অর্থাৎ তখন পরিপ্রেক্ষিতের গণিত সৃষ্টি হয়নি। তবুও ছবির বাড়ীটি যেন সত্যিই পাথরে তৈরি মনে হয়, বাড়ীর সমুখের উঠোনে যথেষ্ট জমি ছাড়া, বাড়ীর সমুখটির সঙ্গে তার পাশগুলি এবং ভিতরটিও দেখা যাচ্ছে। পাশগুলি এবং ভিতরটি যত দূরে গেছে ততই ছোট হয়ে গেছে। সামনে থেকে যত দূরে যায়, অথচ ছবির ভিতরদিকে চলে যায় ততই আকার ছোট থেকে ছোট করে আঁকতে হয়, একে ইংরেজিতে বলে ফোরশর্টনিং অর্থাৎ সমুখ দিকটা খাটো করে দেওয়া (কথাটি আসলে যা হওয়া উচিত তার ঠিক উল্টো, অর্থাৎ বাস্তবিক পক্ষে বলা উচিত ফোর ওয়াইডনিং অর্থাৎ সমুখদিকটা বড় করে দেওয়া)। অর্থাৎ তখনই শিল্পীরা বিলক্ষণ জানতেন যে-কোন বস্তু যত কাছে থাকে তত বড় দেখায়, যত দূরে যায় তত ছোট দেখায়। ইওরোপের বহু আগে, চীনে অবশ্য এ বিষয়ে চূড়ান্ত কাজ হয়ে গেছে। কিন্তু পনেরো শতকের আগে দূরে দেখা একাধিক জিনিসের মধ্যে মাপজোপের কি সম্বন্ধ হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে অঙ্কশাস্ত্র তৈরি হয়নি।

ব্রুনলেস্কি এবং আলবের্তিই প্রথম এই সম্বন্ধগুলি অঙ্কের ভাষায় লেখেন। তাই পূর্বজদের চেয়ে তাঁদের কাজে গভীরত্ব বা ডীপ স্পেসের আভাস এবং শৃঙ্খলা অনেক বেশী এল। দর্শক বা শিল্পী কল্পনায় ঠিক কোন বিন্দুতে দাঁড়িয়ে ছবির যাবতীয় দ্রষ্টব্যগুলি দেখছেন তাই সর্বপ্রথম ঠিক করতে হবে, এই হল তাঁদের প্রথম ব্যক্তব্য। অর্থাৎ শিল্পী এবং দর্শক থেকে ছবির প্রত্যেকটি বস্তু বা ফিগর কোনটি কতদূরে কতখানি কোণ করে আছে তাই প্রথম বার করতে হবে। সেই স্থানটি থেকে যতগুলি দৃষ্টিরশ্মির কর্ণরেখা বেরোবে, তারা ছবির প্রতিটি বস্তুর রেখা এবং গা ছুঁয়ে, সে মেঝে বা জমিই হোক বা বাড়ির ছাদ হোক বা গা হোক, সবাই মিলে সোজা বহুদূরে ছুটে গিয়ে একটি মাত্র বিন্দুতে মিশবে। সেই বিন্দুটিকে বলা হয় বিলীয়মান বিন্দু বা ভ্যানিশিং পইন্ট। এই ভ্যানিশিং পইন্টটি ছবির 'পিছনে' দিকরেখায় অবস্থিত, এটি ঠিক মুখোমুখি ছবি থেকে বেরিয়ে সমুখদিকে এলে দর্শকের চোখে এসে মিশবে। অতএব এই ছবির এই বিলীয়মান বিন্দুটি ছবির ঠিক মধ্যস্থলেও হতে পারে, আবার ডাইনে, বাঁয়ে,

উপরে, নীচে এমন কি ছবির বাইরেও হতে পারে। যেখানেই থাকুক, যে-ছবিতে বিজ্ঞানসম্মত পারস্পেকটিভ আছে তাতে একটি ভ্যানিসিং পইন্ট থাকতেই হবে, এবং সেটি দিকরেখার সঙ্গে মিলে যাবে। অবশ্য এটা মনে রাখতে হবে যে সব কটি পিছিয়ে যাওয়া রেখা বা স্তরই যে সোজাসুজি সরলগতিতে দূরে পিছনে ছুটে যায় তা নয়। ওরই মধ্যে কতগুলি দর্শকের চোখ থেকে কোণাকুণি পিছিয়ে যায়, কিন্তু সর্বদাই তাদের গতিবিধি দর্শকের চোখের বিন্দুর সঙ্গে অনড় সম্বন্ধ রেখে চলে। দর্শকের চোখ থেকে যে সব কর্ণরেখা সোজা বেরিয়ে দিকরেখার ভ্যানিশিং পইণ্টে মিলিয়া যায় সে বিন্দুটি আর দর্শকের চোখের সঙ্গে কোণ করে সমান্তরাল রেখার সমষ্টি দিকরেখায় যে ভ্যানিশিং পইণ্টে মেশে, সে বিন্দুটি অবশ্যই বিভিন্ন। এ সম্বন্ধে পরে আরও বিশদভাবে বলা হবে।

ছবির ভিতরে বা বাইরে ঠিক কোন বিন্দুটির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দর্শককে ছবি দেখতে হবে শিল্পী যখন সেটা ঠিক করেন সেইসঙ্গে তিনি দর্শক ছবি থেকে কত দূরে দাঁড়িয়ে দেখবেন তাও ঠিক করেন। ছবিতে চিত্রিত বস্তুগুলি কত বেগে পিছনদিকে সরতে সরতে আকারে কমে যাবে তা এই দূরত্বের উপর নির্ভর করবে। পরিপ্রেক্ষিতবিজ্ঞানের একটি সুবিধা এই যে দূরত্ব যদি দ্বিগুণ হয় তবে আকারে একটি জিনিস অর্ধেক দেখাবে, যদি তিনগুণ বা চারগুণ হয় তবে আকারে তিনভাগ বা চারভাগের একভাগ দেখাবে। এরফলে ছবিতে কোন জিনিসটি কতদূরে আছে, এবং পরস্পরের মধ্যে তাদের আকারের সম্বন্ধ কি রকম বলা খুব সহজ হয়ে পড়ে। সুতরাং পরিপ্রেক্ষিতবিজ্ঞান জানা থাকলে শিল্পী ছবিতে খুব সহজেই পরিচ্ছন্নতা, শৃঙ্খলা আনতে পারেন, প্রত্যেকটি জিনিসকে ছবিতে ঠিকমত ন্যস্ত করতে পারেন। ঠিক যেমন বাস্তব প্রকৃতিতে আমরা মাপজোপ করে যে কোন জিনিসের নিখুঁত সংস্থানটি বার করে দিতে পারি।

শুধু যে দূরত্বের দরুন জিনিসের আকারই ছোট হয়ে যায় তা নয়, তাদের রঙ ও কমে যায়। কাছের জিনিস খুব স্পষ্ট দেখায়, তাদের রঙ হয় কড়া, উজ্জ্বল, তাদের ছায়াও হয় তীক্ষ্ণ। যত দূরে যায় রঙও ফিকে হয়ে যায়, তাদের সীমারেখা বা কণ্টুরগুলিও আবছায়া, অস্পষ্ট হয়ে যায়। আধুনিক ভাষায় রঙের পরিপ্রেক্ষিতকে বলে রঙের মূল্যবোধ বা ভ্যালুজ্। রেখা ও রঙ মিলিয়ে যে জটিল পরিপ্রেক্ষিতের সৃষ্টি হয় তাকে বলে বায়ব বা বায়ুমণ্ডলের পরিপ্রেক্ষিত, ইংরেজি এরিয়ল পারস্পেকটিভ। রেখাগত

পরিপ্রেক্ষিত নির্ণয় করা যত সোজা বায়ব পরিপ্রেক্ষিত নির্ণয় করা অত সোজা নয়, নিছক অঙ্কের ভাষায় তা করাও যায় না। বলা বাহুল্য পরিপ্রেক্ষিতের সার্থক ব্যবহার আয়ত্ত হলেই তবে ছবিতে ডিজাইন আসে।

এখন পরিপ্রেক্ষিতের জ্যামিতিক নিয়মকানুন সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করার আগে লেঅনার্দো দা ভিঞ্চির অপূর্ব এবং অত্যাশ্চর্যরকম প্রাঞ্জল লেখার সামান্য কিছু অংশের অনুবাদ পড়তে ভাল লাগবে। দুঃখের বিষয় এটি লেওনার্দোর ইটালিয়ানের ইংরেজি অনুবাদের বাংলা অনুবাদ। পারস্পেকটিভ সম্বন্ধে লেওনার্দো এইভাবে আরম্ভ করেছেন:

"পরিপ্রেক্ষিত। পরিপ্রেক্ষিত হচ্ছে চিত্রকলার লাগাম এবং হাল। চিত্রকলার ভিত্তি হচ্ছে পরিপ্রেক্ষিতে। পরিপ্রেক্ষিত হচ্ছে চোখের ক্রিয়া সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান, তা ছাড়া অন্য কিছু নয়। চোখের সমুখে বিশ্বপ্রকৃতির যাবতীয় বস্তুর রূপ এবং রঙ এক পিরামিডের আকার ধারণ করে চোখে এসে লাগে। চোখের শুধু কাজ হচ্ছে এই পিরামিডটিকে গ্রহণ করা। পিরামিড বললুম তার কারণ চোখের যে বিন্দুটিতে এসে এই সব পিরামিডগুলি মেশে তারা প্রত্যেকেই চোখের বিন্দুটির চেয়ে অত্যন্ত বড়। কাজে কাজেই যে-কোন বস্তুর চারপাশ থেকে রেখা টেনে চোখের একটিমাত্র বিন্দুতে মেশালে সে রেখাগুলি একটি পিরামিডের সৃষ্টি করবেই।

"পরিপ্রেক্ষিতের তিনটি শাখা আছে। প্রথমটি হচ্ছে চোখ থেকে জিনিস যত দূরে সরে যায় ততই সে কেন ছোট হয়ে যায় : তার হিসাব : একে বলে পরিপ্রেক্ষিত অথবা আকারে কমে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিত (পারস্পেকটিভ অভ ডিমিনিউশন)। দ্বিতীয়টি হচ্ছে. চোখ থেকে যত দূরে সরে যায় তত রঙ কিভাবে বদলায় তার ব্যাখ্যা। তৃতীয় এবং শেষ শাখাটি হচ্ছে চোখ থেকে কতগুলি জিনিস যত দূরে সরে যায় ততই কিভাবে তাদের আনুপাতিক সম্বন্ধগুলি অস্পষ্ট দেখায়। এই তিনটির নাম হচ্ছে, রেখাগত পরিপ্রেক্ষিত, রঙের পরিপ্রেক্ষিত এবং অস্পষ্ট হয়ে মিলিয়ে যাবার পরিপ্রেক্ষিত (আধুনিক ভাষায় দ্বিতীয় শাখাটিকে বলে 'ভ্যালুস', তৃতীয়টিকে বলে এনভেলাপমেণ্ট বা পরিবেষ্টন)।

"যাবতীয় বস্তুর আকার এবং তাদের গায়ের যাবতীয় রঙ নিয়ে গড়ে উঠেছে চিত্রবিজ্ঞান : চিত্রবিজ্ঞানের বিষয় হচ্ছে বস্তুর পারস্পরিক দূরে-কাছের অনুমান এবং যতদূরে যায় ততই কোন বস্তু আকারে কিরকম

ছোট হয়ে যায় তার নির্ণয় করা ; এই বিজ্ঞান হচ্ছে পরিপ্রেক্ষিতের জননী, এটি আসলে দৃষ্টি রশ্মির বিজ্ঞান। পারস্পেকটিভ তিনভাগে বিভক্ত : প্রথমটি বস্তুর রেখাগত নকশা নিয়ে ব্যাপৃত ; দ্বিতীয়টি বস্তু যতই দূরে পিছিয়ে যায় ততই তার রঙ কিভাবে কতখানি ম্লান হয়ে যায় তাই নির্ণয় করে। তৃতীয়টির বিষয় হচ্ছে নানারকম দূরে কাছে বস্তু কিভাবে কতখানি অস্পষ্ট হয়ে যায় তার বিচার। এখন প্রথম যে অংশটি শুধু বস্তুর রেখা এবং সীমান্ত নিয়ে ব্যাপৃত তাকে বলে নকশা বা ড্রয়িং, এর কাজ হচ্ছে বস্তুর আকারটি ফুটিয়ে তোলা। এর থেকে হয়েছে আরেকটি বিজ্ঞানের উৎপত্তি, তার বিষয় হচ্ছে আলো আর ছায়া, যার অন্য নাম কিয়ারসক্যুরো, এটি বোঝাতে গেলে অনেক কথা বলতে হয়।

"এক টুকরো স্বচ্ছ মসৃণ কাঁচের মধ্যে দিয়ে যাবতীয় জিনিস দেখে কাঁচের ওপাশে যে সব জিনিস দেখা যাচ্ছে তাদের সেই কাঁচের উপর আঁকাকেই পারস্পেকটিভ বলা যায়। প্রতিটি জিনিসই পিরামিডের আকারে চোখের বিন্দুতে এসে মেশে, এবং এই পিরামিডগুলি কাঁচটিতে কাটা পড়ে যায়।

"যা কিছু স্থূলরূপ চোখে পড়ে তার তিনটি গুণ আছে : ঘন দেহ, আকার এবং রঙ। তিনের মধ্যে রঙ বা আকার যত দূর থেকে চেনা যায়, দেহ তার চেয়েও দূর থেকে চেনা যায়। আবার আকারের চেয়ে রঙ সাধারণত আরও বেশি দূর থেকে চেনা যায় ; অবশ্য এ নিয়মটি ভাস্বর বা দ্যুতিমান বস্তু সম্বন্ধে খাটে না।

"একই আয়তনের একাধিক বস্তুর মধ্যে যেটি চোখ থেকে সবচেয়ে দূরে থাকবে সেটিই সবচেয়ে ছোট দেখাবে।

"একই আয়তনের, একই রঙের, একই রঙের ঔজ্জ্বল্যের একাধিক বস্তুর মধ্যে যেটি সবচেয়ে দূরে থাকবে সেটিই সবচেয়ে ছোট এবং সবচেয়ে ফিকে রঙের দেখাবে।

"সমান গভীর একাধিক ছায়ার মধ্যে যেটি চোখের সবচেয়ে কাছে থাকবে সেটিই সবচেয়ে অগভীর দেখাবে।

"কোন গাঢ় রঙের জিনিস আর চোখের মধ্যবর্তী বায়ুমণ্ডল যত বেশী ভাস্বর হবে ততই জিনিসটি বেশী নীল দেখাবে, এর প্রমাণ আকাশের নীল।

"আমি শুধু এইটুকু জোর করে সূত্র হিসেবে বলতে চাই যে সমান ঘনত্বের হাওয়ার মধ্যে যে সব আলোর রশ্মি চলে তারা সর্বদাই সরলরেখা

ধরে চলে।

"সারা বায়ুমণ্ডলে অসীম, অনন্তসংখ্যক রশ্মিরেখা পরস্পরকে কাটাকাটি করে, জড়াজড়ি করে আছে, কিন্তু কোনটাই হুবহু আরেকটির সঙ্গে মিলে যায়না। তারাই প্রতিটি বস্তুর প্রকৃত রূপ বা ফর্মটি ফুটিয়ে তোলে।

"অসীম, অনন্ত সংখ্যক পিরামিডে বায়ুমণ্ডল ভর্তি। এই পিরামিডগুলি প্রতিটি জিনিসের গা থেকে বেরোয়। এরা পরস্পর কাটাকাটি করে, জাল বোনে, আলাদা আলাদাভাবে প্রত্যেকটি পিরামিড সৃষ্টি হয়, কেউ কারোর পথ আটকে দাঁড়ায় না। চারপাশের বায়ুমণ্ডলের মধ্যে দিয়ে প্রত্যেকটি পথ করে নেয়।...

"আরেক ধরনের পরিপ্রেক্ষিতকে বায়ব বা এরিয়ল পারস্পেকটিভ বলব, কারণ যে সব ঘরবাড়ী একই রেখা ধরে অবস্থিত মনে হয় বায়ুমণ্ডলের পার্থক্যের দরুন তাদের বিভিন্ন দূরত্বও আলাদা করে বোঝা যায়। যথা ধরা যাক উঁচু দেয়ালের মাথায় আমরা দূরের কয়েকটি বাড়ীর উপরের অংশগুলি দেখছি : প্রথমে সবগুলিকেই সমান আয়তনের মনে হবে। কিন্তু ছবিতে একটিকে আরেকটির চেয়ে দূরে দেখাতে হলে বায়ুমণ্ডলকে একটু ঘন করে দিতে হবে। আমরা সবাই জানি যে হাওয়া যদি সমানভাবে ঘন হয় তাহলে মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ বায়ুমণ্ডলের দরুন সবচেয়ে দূরের জিনিসগুলি—যেমন আকাশের কোলে পাহাড়পর্বত,—নীল দেখাবে ; সূর্য যখন পূর্বদিকে থাকে তখন বায়ুমণ্ডল যে রকম নীল দেখায় খুব দূরের জিনিসও প্রায় সেইরকম নীল দেখাবে। অতএব দেয়ালের ওপারে যে বাড়ীটি সবচেয়ে কাছে আছে সেটিকে তার স্বাভাবিক রঙে আঁকতে হবে, এবং আরও দূরের বাড়ীগুলিকে অল্প অস্পষ্ট এবং আরও নীল করে দিতে হবে।

তৃতীয় ভাগ : চিত্রবিশ্লেষণ

ভারতীয় চিত্রে রচনা ও পরিপ্রেক্ষিত

ভূমিকা

অজন্তার ছবির অন্যতম কৃতিত্ব হচ্ছে রেখার দক্ষতা, সাবলীলতা। এ বোধহয় সব প্রাচ্য ছবিরই বিশেষত্ব। প্রাচ্যের চিত্রকলার বিশেষত্বই হচ্ছে রেখা, যার কাছে রঙ গৌণ। এমনকি রেখার প্রাধান্য এত বেশি যে তার কাছে মডলিং, শেডিং, পারস্পেকটিভ, রঙ সবই গৌণ হয়ে গেছে, যদিও এসব সম্বন্ধে ভারতীয় শিল্পীর বিলক্ষণ জ্ঞান ছিল। গ্রীক ভাজের ছবির রেখা অপূর্ব, ডিউরার, হোলবাইন, লেওনার্দো দা ভিঞ্চির রেখার তুলনা নেই, কিন্তু তবুও অজন্তার কাছে যেন হার মেনে যায়। প্রথম থেকেই ভারতীয় চিত্রকলায় রেখা প্রধান, রঙ বা রঙের গাঢ় ফিকে, বা এক রঙের মধ্যে নিশ্চিন্তে আরেক রঙের মিল, যার থেকে ছবিতে রঙের টোন বা বর্ণালির বিশিষ্ট আমেজ বা সুর আসে তার দৃষ্টান্ত ভারতীয় চিত্রে খুব বেশি নেই। অজন্তা বা বাগেই তবু কিছু আছে। এর কারণ অনেকে বার করবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু জোর করে বলেননি। আমার মনে হয় এর এক প্রধান কারণ আমাদের গরম দেশের প্রখর সূর্যের আলো, যা এত প্রখর যে সে আলো সোজাসুজি পড়লে আলোছায়া বা রঙের খেলা খুব নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে, সে আলোর তলায় থাকে শুধু সীমারেখা, এক বস্তু থেকে আরেক বস্তু বিচ্ছিন্ন করা লাইনটুকু, আর মোটা মোটা রঙগুলি, যার মধ্যে অনেকগুলিই সূর্যের আলোর তেজে প্রায় স্বচ্ছ, তরল হয়ে আসে, অথবা এত তীব্র হয়, যার মধ্যে রকমারি শেড বা পর্দা পাওয়া অসম্ভব। যেসব ছবি স্পষ্ট দিনের আলোয় দেখবার, সেসব ভারতীয় ছবিতে পারস্পেকটিভ নামমাত্র, মডলিং প্রায় নেই, সবই প্রায় চ্যাপ্টা, ফ্ল্যাট, তাতে আছে শুধু সীমারেখা আর স্থানে স্থানে মোটা পর্দার রঙ যা এক মিহি পর্দার মধ্য দিয়ে আরেক মিহি পর্দায় যায় না। এর কারণ খুঁজতে হয় বিষুবরেখা অঞ্চলের প্রখর সূর্যের আলোয়, যে আলোর তীব্র তেজে শিল্পীর মিহি রঙের টোনের কাজ ব্যর্থ হতে বাধ্য, যার অত্যাচারে শুধু এক একটি আয়তন জুড়ে শুধু একটি রঙ নিজেরই রকমের গাঢ় ফিকে পর্দা নিয়ে টিকে থাকতে পারে। ভারতীয় শিল্পী মডলিং যে বিচক্ষণ বুঝতেন, পারস্পেকটিভ যে খুব ভাল বুঝতেন, আলোছায়ার গুণ যে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে শিক্ষা করেছিলেন তার অকাট্য প্রমাণ মেলে ভারতীয় ভাস্কর্যে, যার উপরে সূর্যের আলো পড়ে সর্বদা আলোছায়া, বিভিন্ন সূক্ষ্ম রঙের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করে (বোধহয় ভারতীয় চিত্র নির্মাণে দেখা যায়)। কিন্তু দেশ সম্বন্ধে জ্ঞানের বলে চিত্রশিল্পী ছবি থেকে সূক্ষ্ম পারস্পেকটিভ বাদ দেন, বাদ দিয়ে, যে রেখা প্রখর আলোয় গলবে না, হারিয়ে যাবে না, চোখে বিভ্রম ঘটাবে না, সেই রেখার আশ্রয় নেন। একটা খুব প্রণিধানযোগ্য ব্যাপারের কথা বলি। অজন্তার গুহার অভ্যন্তরে যেখানে ছবি দেখতে গেলে শুধু বাতি বা মশালের সাহায্যেই দেখতে হবে, সেখানেই শুধু অজন্তার চিত্রকর ভাস্কর্যের উচ্চাবচতা অর্থাৎ মডলিং বা পারস্পেকটিভ অর্থাৎ দূর কাছের সম্বন্ধাভাস এনেছেন, ছবিতে স্থাপত্য আকারের বাহুল্য গুণ এনেছেন, রঙ গাঢ়-ফিকে করে। কিন্তু বাইরে যেখানে সূর্যের আলোয় ছবি দেখতে হবে, সেখানে মডলিং প্রায় একেবারেই নেই, পারস্পেকটিভও নেই, আছে শুধু রঙিন

আল্পনা আর নকশা। এটা ভাববার কথা। ভারতবর্ষে সূর্যের আলোয় তেল রঙের ছবি চলা খুব শক্ত, কারণ তেলরঙ বড় চকচক করে, চোখকে দেখতে দেয় না, যদি না সে ছবি প্রায় অন্ধকার ঘরে দেখা হয়। গল্প আছে জাহাঙ্গীরের দরবারে স্যর টমাস রো যখন প্রথম তেল রঙের ছবি নিয়ে যান তখন বাদশা খুব চটে গিয়ে ছবি সরিয়ে নিতে বলেন, কারণ সে ছবি নাকি বড় ইতরের মত চকচক করছিল।

চিত্রশিল্পী রেখার সমস্ত গুণাগুণ আয়ত্ত করেছিলেন, ফলে শুধু রেখার মধ্যে দিয়েই তিনি যত কিছু ভাব প্রকাশ করতে শেখেন এবং রেখার মধ্যে আনেন মডলিঙের গুণাগুণ, উঁচুনীচু বোধ, ফোরশর্টনিং, পারস্পেকটিভ। রেখার মধ্যে প্ল্যাস্টিক গুণও আনেন। অজন্তার স্বর্ণযুগে এই রেখা সর্বদা বলিষ্ঠ, আত্মপ্রতিষ্ঠিত, তেজোময়।

রেখার সঙ্গে যুক্ত হয় অল্প কয়েকটি রঙ যেগুলি শুধু গাঢ়-ফিকে করেই আসে অসীম বৈচিত্র্য। রঙের ঐশ্বর্যের কথা আগেই বলেছি। মানুষের গায়ের চামড়া প্রায়ই হত গোলাপী আর ধূসর। কখনও কখনও সবুজ দেখা যায়, কিন্তু সবুজ রঙ আসলে ছিল তলাকার আস্তর। রীতি ছিল প্রথমে নরম সবুজে মানুষের গা রঙ করা, তারপরে দেওয়া হত গোলাপী রঙ, ফল দাঁড়াত স্নিগ্ধ অথচ উষ্ণ স্বচ্ছ-প্রায় এক ধরনের ধূসর রঙ। এছাড়া ব্রাউন, কালো আর লালের প্রচুর ব্যবহার ছিল।

প্রাচীন ছবির সবচেয়ে কৃতিত্ব ছিল ভাবভঙ্গী প্রকাশে, আর হাতের মুদ্রায়। হাত, আঙুল এমন সুনিপুণভাবে বোধহয় পৃথিবীর অন্যত্র আঁকা হয়েছে কিনা সন্দেহ, ছবির মধ্যের হাতে আঙুলে শিল্পী যেন কথা কওয়াতে পারতেন।

কিন্তু শেষে একথা মানতেই হয় যে গুহাচিত্র ছিল মুখ্যত আখ্যানমূলক, অর্থাৎ গল্প বলা ছবি। গল্প বলা ছবিতে গল্প বা আখ্যানই হয় মুখ্য, ছবি হয় গৌণ। ছবির ছবিত্বগুণ, যেখানে সে কি বলছে তার বিশেষ মূল্য নেই (অর্থাৎ ধ্রুপদী সঙ্গীতে যেমন কথা বা ভাষার কোন মূল্য নেই), শুধু সেই ধরনের ছবিতেই আসে একান্ত ছবির মৌল ঐক্য বা বাঁধুনি যার একাত্মতার ছন্দ ছবির নানান বিপরীত বিষয়, রঙ ও রেখাকে একই চৌহদ্দির মধ্যে এক সমগ্রতায় বেঁধে রাখে, নকশার শ্রেষ্ঠত্ব, চিত্রের কৈবল্য বা নৈর্ব্যক্তিকতা, যা আখ্যানের উপর ভর দিয়ে থাকে না, যা নিজের জোরে সম্পূর্ণ, যা নিছক ছবি এবং সেই হিসাবে কালজয়ী, অর্থাৎ কালকে যে অতিক্রম করে, যা দেখে মনে হয় এ ছবিতে কাল থমকে দাঁড়িয়ে আছে, স্তব্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু আখ্যানচিত্রকেও অজন্তাশিল্পী কি পরিমাণ চিত্রগুণমণ্ডিত করেছেন দেখে বিস্মিত হতে হয়, উপরন্তু প্যানেল চিত্রে আমরা পাই শুদ্ধ আখ্যানহীন ছবি, যার উৎকর্ষ চিরকালই সব শিল্পীর ঈর্ষার বস্তু হয়ে থাকবে।

অজন্তাচিত্রের রচনা ও পরিপ্রেক্ষিত

ভারতশিল্পের ইতিহাসে কয়েকটি বিশেষ ধরনের কাজের ও অলঙ্কারে যেমন একটি সুস্পষ্ট প্রগতি ও ক্রমবিবর্তনের ধারা পাওয়া যায়, ভারতীয় চিত্রকলায় রচনা ও পরিপ্রেক্ষিত সৃষ্টির বিভিন্ন ধারাতেও তেমন একটি স্পষ্ট যোগসূত্র দেখা যায়। চিত্রকলায় কোথায় কম্পোজিশন শেষ হয়ে পারস্পেকটিভ শুরু হয়, অথবা দুটির টেকনিকের মধ্যে কোথায় তফাৎ, অথবা আদৌ আছে কিনা, বলা শক্ত, কারণ কম্পোজিশনে যেসব

উপাদান দরকার হয় পারস্পেক্‌টিভ সৃষ্টিতেও তাদের স্থান বিশেষ প্রধান।

অজন্তাচিত্রের রচনা এবং পরিপ্রেক্ষিতের টেকনিক এবং ইস্‌থেটিক উদ্দেশ্য বিচার প্রসঙ্গে শুধু তার ব্যাকরণটুকু আলোচনা করলে খুবই ভুল হবে, কারণ ভারতীয় ঐতিহ্য এবং মূল আদর্শের উপরেই অজন্তাচিত্রের রচনা এবং পরিপ্রেক্ষিতের ভিত্তি বলা যায়। সুতরাং এক্ষেত্রে চিত্রের কৌশলগত যাবতীয় সমস্যার সঙ্গে ভারতীয় জীবনদর্শনের ওতপ্রোত সম্বন্ধ বর্তমান।

নয় এবং দশ নম্বর গুহার ফ্রেস্কোর পুনঃ-সংস্কারের পর এখন প্রায় জোর করে বলা যায় যে অজন্তার ফ্রেস্কো শুরু হয় সাঁচি যুগে, শেষ হয় গুপ্তযুগে। ফিলিপ স্টার্ন বলে এক ফরাসী পণ্ডিত অজন্তার স্থাপত্য এবং ভাস্কর্যের প্রমাণাদির উপর নির্ভর করে ২৯টি গুহার ক্রমপঞ্জী মোটামুটি বেঁধে দিয়েছেন। কিন্তু এখানে যখনই আমরা সাধারণভাবে অজন্তা শিল্প, অজন্তা যুগ বা অজন্তা রীতির উল্লেখ করব তখনই আমাদের মনে জাগবে তার সবচেয়ে গৌরবের যুগ অর্থাৎ খ্রীস্টীয় পাঁচ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ছয় শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত। বাস্তবিকপক্ষে ভারতের নানা স্থানের ভাস্কর্যকে বুঝতে এই যুগের অজন্তাচিত্রাবলীই সবচেয়ে বেশি সাহায্য করে; তার কারণ এর আগের যুগের ফ্রেস্কোগুলি, অর্থাৎ নয় আর দশ নম্বরের ছবিতে এমন কোন টেকনিকের নৈপুণ্য নেই যা নাকি সাঁচি, ভারুত, অমরাবতীতে নেই।

অজন্তায় গুপ্তযুগের ফ্রেস্কোগুলি প্রথম দেখলে একটু হতভম্ব হতে হয়। আষ্টেপৃষ্টে ফ্রেস্কোয় মোড়া দেয়ালগুলি প্রথম দেখলে মনে হয় যেন পাশাপাশি দুটি চিত্রবিষয়ের মধ্যে কোন রকম সীমারেখা নেই, সীমারেখার চেষ্টাও নেই। ফলে জাত মঞ্জরী বা মূর্তিলক্ষণাদি খুব ভাল রকম জানা না থাকলে, কোনখানে একটি আখ্যান শেষ হয়ে আরেকটি শুরু হল বলা শক্ত হয়। দেয়ালের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত অবধি, ছাত থেকে মাটি পর্যন্ত, একটুও জায়গা কোথাও ফাঁক না রেখে, সমস্ত দেয়ালময় ছবি আঁকা; তাতে প্রথম প্রথম চোখ কোন ছবিকে আলাদা করার অবসরই পায় না। সারা দেয়ালময় নবনারী, নগর, অট্টালিকা, পাহাড়, পাথর, গাছপালা, পশুপক্ষী ভীড় করে থাকে। কিন্তু এসব জিনিস যতই ঝাঁকালো হয়ে গিজগিজ করুক না কেন, কোথাও ভাবস্বরূপ হয় না; সমস্ত দেয়ালটি যেমন নিপুণ, কুশলী, তেমনি বিচিত্র, সঙ্গত সুরে বাঁধা। বেশ কিছুক্ষণ চেয়ে থাকলে, আস্তে আস্তে একটু একটু করে কিছু কিছু গ্রুপ চারপাশ থেকে নিজেদের ছাড়িয়ে বেরিয়ে আসে, দৃষ্টিপথে পড়ে, তাদের খুঁটিনাটি নজরে পড়তে শুরু করে। সেগুলি দেখা হলে দৃষ্টি আবার চলে যায় যেগুলি কম দরের বা কম জরুরী গ্রুপ, যেগুলি প্রধান দৃশ্যগুলির চারদিকে সাজানো আছে, তাদের দিকে। সেগুলি দেখা হলে পর চোখ আপনা আপনি, নিজের অজান্তেই আস্তে আস্তে আবার আরেকটি মুখ্য গ্রুপের উপর গিয়ে পড়ে।

এইসব কম্পোজিশনের ভিতরে কি ধরনের শৃঙ্খলা, কি ধরনের সঙ্গতি বর্তমান, তারা কোন আইনের অধীন, সেইটুকু আবিষ্কার করাই আমাদের উদ্দেশ্য। সবচেয়ে সরলরীতির কম্পোজিশন অবশ্য হচ্ছে যেগুলিতে প্রতিসাম্য বর্তমান, অর্থাৎ মধ্যস্থলের দুপাশে ফিগরগুলি সাজানো, যাতে ডাইনে বাঁয়ে এবং মধ্যের ফিগরগুলিতে ভারসাম্য আসে। এই ধরনের কম্পোজিশন সবচেয়ে বেশি পাই বৌদ্ধ গ্রুপগুলিতে; সেগুলির বিষয় বহু পুরনো, চিরাচরিত; অজন্তা যুগের অনেক আগে থাকতেই তাদের সূত্র স্থির

হয়ে গেছে। মধ্যস্থলের দুপাশে প্রতিসাম্যমূলক কম্পোজিশন রীতি এমন কিছু মূল্যবান নয় ; কারণ বিহার, মঠ, মন্দির সর্বত্রই দেয়ালে এই ধরনের অজস্র ভাস্কর্য দেখা যায়। এই ধরনের কম্পোজিশনে বোধহয় গ্রীক-বৌদ্ধ রীতির ছাপ দেখা যায়। সে রীতিতে প্রতিসাম্য ভাঙা, ভারসাম্যহীনতা কম্পোজিশনের চেয়ে প্রতিসাম্যমূলক কম্পোজিশনেই বেশি প্রশ্রয় পায়। তা সত্ত্বেও কতকগুলি পুরনো বিষয়, যেমন মারের প্রলোভন, অজন্তায় নতুনভাবে, অনেক স্বচ্ছন্দ ছাঁদে আঁকা হয়েছে। যথা, মারের প্রলোভন চিত্রে প্রতিসাম্যের আড়ষ্টতা নেই বলা যায় ; সেখানে ছবির প্রসাদ ঘনবস্তু বা ম্যাসের বিশেষ বিশেষ বিন্যাসে যতটা এসেছে রেখার সংস্থানে ততটা আসেনি।

এই ধরনের সরল পদ্ধতি বা প্রতিসাম্যমূলক কম্পোজিশনের পরে আসে দ্বিতীয় পদ্ধতি, তাতে যে-কোন দৃশ্যের বিভিন্ন গ্রুপগুলি একত্রে যোগ করে গাঁথা। এই রীতির আমরা নাম দিতে পারি যোগসূত্র রচনা বা ইংরেজিতে কনেক্টিং-লিঙ্ক কম্পোজিশন। অজন্তা রীতিতে যোগসূত্র রচনা এত বেশি দেখা যায় যে এই টেকনিকটিকে আমরা অজন্তার একান্ত বৈশিষ্ট্য বলতে পারি। এই ধরনের রচনার কল্যাণে একই আখ্যানের একাধিক দৃশ্য পরের পর একই দেয়ালে সাজানো হয়, তাদের ক্রমান্বয়তার মধ্যে কোন স্পষ্ট বিরাম বা যতিরেখা থাকে না। সাধারণত চিত্রকলায় একটা মস্ত অসুবিধা এই যে তাতে উপন্যাস বা নাটক বা কবিতার মত কালাতিপাত দেখানো যায় না, কিন্তু এই ধরনের কম্পোজিশনের কল্যাণে সময়ের গতি দেখানো সম্ভব হয়, অর্থাৎ ক্রমিক পর্যায়ে ছবিতে গল্প বলা যায়।

এই ধরনের কম্পোজিশন ছিল প্রাচীন ভারতীয় শিল্পের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। এই লক্ষণটি সুদূর প্রাচ্যে অর্থাৎ জাপানের মাকিমোনোর কম্পোজিশনেও দেখা যায়। পাশ্চাত্য শিল্পী চিরকাল যে কোন দৃশ্য বা ছবি একটি স্পষ্ট, বিশিষ্ট ফ্রেমে বাঁধা অবস্থায় দেখতে অভ্যস্ত। তিনি সেটি দেখেন একটি বাঁধাধরা, অনড় স্থান বা বিন্দু থেকে, দেখেন যেন জানালার খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে (লেঅনার্দো দা ভিঞ্চির খড়খড়ি বা ভেন্টিলেটার)। অপর পক্ষে ভারতীয় শিল্পী কোন দৃশ্য শাড়ির পাটের ভাঁজের মত খুলে খুলে দেখতে অভ্যস্ত, ঠিক যেন চলন্ত রেলগাড়ির জানালা দিয়ে দেখা ক্রমান্বয় দৃশ্য বা প্যানোরামা। তার মধ্যে বিভিন্ন আখ্যান ভাগ করতে, সেইসঙ্গে আবার তাদের মধ্যে যোগসূত্র রাখতে, সাঁচির প্রথম স্তূপের যুগ থেকেই ভারতীয় শিল্পী তাঁর ছবিতে লেখায় যতিচিহ্ন বা পাঙ্কচুয়েশন চিহ্নের মত কতকগুলি বিশিষ্ট বিষয়ের অবতারণা করতেন। তাদের কাজই হত দুটি আখ্যানের মধ্যে সীমারেখা নির্ণয় করা। সাধারণত সেগুলি হত নগর তোরণ, অথবা মন্দির দ্বার, চাতাল বা অলিন্দ, গাছ, স্তম্ভ ইত্যাদি। সেইসঙ্গে তিনি আখ্যানটির মুখ্য কেন্দ্রবিন্দুর দিকে আখ্যানসংশ্লিষ্ট সব ফিগরগুলি উপযুক্ত ভঙ্গীতে এঁকে দিতেন, ইংরেজিতে যাকে বলে ওরিয়েন্টেট করে দিতেন। বস্তুত, সাঁচিতেই এই ধরনের কম্পোজিশনের প্রথম স্পষ্ট দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। সাঁচির এই ধরনের কম্পোজিশনে অবশ্য সেখানকার পোর্টিকো, লিন্টেলের প্রলম্বিত আকার সাহায্য করে। এই রীতির বিশেষ উন্নতি হয় অমরাবতীতে। অমরাবতীর আলসে বা ব্যালাসট্রেডের হাতরেলিং ধরে, একের পর এক দৃশ্য ক্রমান্বয়ে অনির্দিষ্টভাবে চলে গেছে, নগর তোরণ, পোর্টিকোর খিলান, চবুতারা থাম ইত্যাদি মধ্যে মধ্যে এসে তাদের স্রোত যা ভেঙে ভেঙে দিয়েছে।

শান্তিনিকেতনে বিভিন্ন ফ্রেস্কোর কাজে বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় এইসব রীতির প্রভূত ব্যবহার করেছেন।

অজন্তা শিল্পীও একই উদ্দেশ্যে তাঁর কাজে অমরাবতীর রীতি গ্রহণ করেছেন। যেমন হয়ত একই আখ্যানের দুটি দৃশ্যের মাঝে আসে কোন নগর তোরণ, কোন দৃশ্যের সবটাই হয়ত কোন অলিন্দের ফ্রেমে আবদ্ধ, পাথর, পাহাড় হয়ত আকাশের বিভিন্ন অংশ ভাগ করে দেয়। কিন্তু অমরাবতীর টেকনিক অজন্তাচিত্রশিল্পী এমন নিপুণভাবে, স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করেন যে দেখে অবাক হতে হয়। উপরন্তু অমরাবতীর স্থাপত্যে নগর তোরণ, পোর্টিকো বা থাম যেমন নিতান্ত আবশ্যিক এবং হাতরেলিং-এর ভাস্কর্য যেমন গৌণ, অজন্তায় তা নয়, বরং উল্টো, অর্থাৎ অজন্তায় চিত্রশিল্পী এসব উপচারকে চোখকে ক্ষণিকের বিশ্রাম দেবার জন্য আনেন. আর ছবির ঠিক এমন এমন জায়গায় তাদের উপস্থাপিত করেন যেখানে লম্বালম্বি এবং কোণাকুণি সরল রেখাগুলি মুহূর্তের জন্য ভীড় করা ফিগরকে সুসংবদ্ধভাবে আটকে রাখে, আর সেইসঙ্গে কম্পোজিশনের ছন্দ বদলে দেয়।

এগুলি যেন ধ্রুপদে তানপুরার ঝঙ্কার, গানের সঙ্গে ঠিক সম্পর্ক নেই, অথচ আলাদাভাবে গানের সঙ্গে বেজে চলেছে, যার মৃদু গুঞ্জনের উপর অপূর্ব মূর্ছনায় ওঠে সুরের কলি। অজন্তায় এইসব সুরের কলি হচ্ছে অতি লাবণ্যময় নানা ভঙ্গীতে আঁকা নরনারীর দল, প্রথম দৃষ্টিতে তাদের এলোমেলো মনে হলেও তারাই দৃশ্যগুলির আসল বিষয়। তাদের হাবভাব, ভঙ্গী, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বক্ররেখা, সব মিলে আমাদের দৃষ্টি এবং মনোযোগ কম্পোজিশনের কেন্দ্রস্থলে ঠেলে দেয়, তার থেকে অবলীলাক্রমে পরের কম্পোজিশনে চালিত করে ; অর্থাৎ ফিগরগুলির নানাবিধ রেখাই হয় আমাদের দৃষ্টির পথপ্রদর্শক। প্রধান গ্রুপগুলির আশেপাশের ফিগরগুলি বিভিন্ন দৃশ্যের মধ্যে যোগসূত্রের কাজ করে, তাদের একপাশ থেকে দেখা ছবি বা প্রোফাইল, ত্রিভঙ্গের বাঁক. তাদের অপসৃত দৃষ্টি, যে গ্রুপের মধ্যে তারা আছে তার দিকে না দেখিয়ে পরের দৃশ্যের দিকে তাদের বাড়ানো হাত, সবই চোখকে পরের দৃশোব দিকে নিয়ে যায়। অর্থাৎ তারা পাশাপাশি আঁকা দৃশ্যের সেতুবন্ধন করে, ঠিক যেমন কোন রঙের ক্রমিক পর্যায় ছবিতে আলো আর ছায়ার মধ্যে সেতুবন্ধন করে।

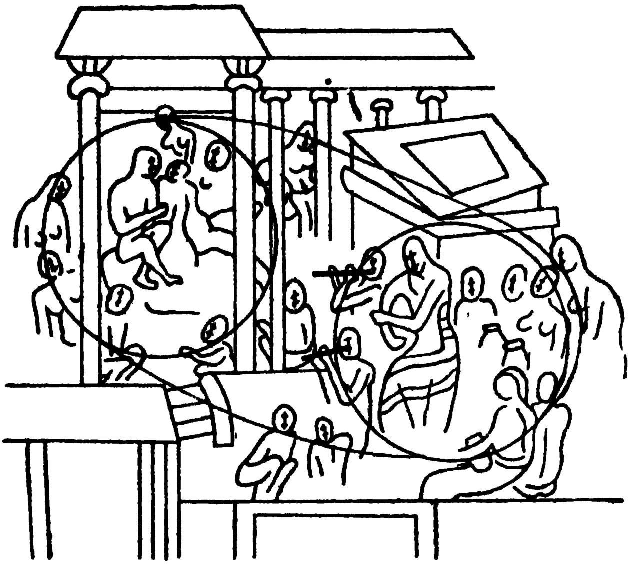
এই পদ্ধতিটি মোটেই অজন্তা চিত্রশিল্পীদের আবিষ্কার নয়, অমরাবতীতে আগে থেকেই চালু ছিল, যদিও এটুকু বলা যায় যে অজন্তাতেই তার চরম উৎকর্ষ হয়। ভারতের বাইরেও যেখানেই শিল্পে ভারতীয় প্রভাব দেখা যায়, বিশেষ করে এশিয়ায়, এই টেকনিক ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু টুনহুয়াঙের ছবি দেখলেই বোঝা যায় যে মধ্য এশিয়ায় এই টেকনিকটি বড় বেশি বাঁধাগতে দাঁড়িয়ে যায় ; সেখানে ফিগরগুলি গতানুগতিকভাবে সাজানো, বৈশিষ্ট্য নেই, কল্পনা নেই ; বিভিন্ন দৃশ্যের মধ্যে যোগসূত্র স্পষ্ট নয়, এলোমেলোভাবে সাজানো। অজন্তায় যেমন প্রতিটি ভঙ্গি, মুদ্রা, শরীরের ছন্দ, অপূর্ব ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করে, টুনহুয়াঙে তা নয় ; সেখানে শরীরের বক্ররেখা, ভাবভঙ্গী নিতান্ত ছকে ফেলা, আড়ষ্ট, নেহাৎ যন্ত্রের মত এক দৃশ্য থেকে আরেক দৃশ্যে দৃষ্টিপথ চালিত করে, তাতে ব্যঞ্জনার কিছু নেই, বৈশিষ্ট্যও নেই।

এতক্ষণ আমরা দু'ধরনের কম্পোজিশনের কথা আলোচনা করেছি ; প্রথমটি সরল অর্থাৎ মধ্যস্থলের ম্যাস বা ফিগরের দুপাশে প্রতিসাম্য রাখা আরও দুটি ম্যাস ; দ্বিতীয়টি

যোগসূত্র রচনা, যাতে দৃশ্যগুলি একাদিক্রমে আসে ; খণ্ড খণ্ড আলাদা আলাদা অসম্পৃক্তভাবে নয়। এরপর আমরা তৃতীয় একধরনের কম্পোজিশন সম্বন্ধে আলোচনা করব। দ্বিতীয় রীতির সঙ্গে এর ক্রিয়াগত ঘনিষ্ঠ যোগ আছে, তাছাড়া আরও মিল আছে এই হিসাবে যে এই রীতিটিও অজন্তা চিত্রশিল্পীর নিজস্ব আবিষ্কার নয়। তৃতীয় ধরনের কম্পোজিশনকে বলা যায় চক্রাকার বা মণ্ডলাকার রচনা।

উদাহরণ দিলে বক্তব্য স্পষ্ট হবে। এক নম্বর গুহার শঙ্খপাল জাতক আখ্যানটি ধরা যাক। সমগ্র চিত্রটিতে দুটি স্পষ্ট ভাগ বা দৃশ্য আছে। ডানদিকে ব্যাধরা নাগরাজ শঙ্খপালকে আক্রমণ করে বন্দী করেছে। বাঁদিকে শ্রেষ্ঠী অলর রাজপুত্র শঙ্খরাজকে নিষাদদের হাত থেকে মুক্ত করে দীক্ষা দিচ্ছেন। রাজপুত্র ভিক্ষুর চীর গ্রহণ করেছেন। পুরো আখ্যানটি দুটি দৃশ্যে ভাগ করা ; প্রতিটি দৃশ্যের গ্রুপ আবার মধ্যবর্তী কেন্দ্রের চারধারে গোল করে সাজানো। ডানদিকের দৃশ্যে ব্যাধদের হাত একঝাঁক কর্ণরেখা বা ডায়াগোনালের সৃষ্টি ক'রে তাদের শিকারের দিকে বাড়ানো ; নাগরাজের শরীরটি আবার লম্বা একটি পাক খেয়ে ব্যাধদের হাতের দিকে আগানো। দৃশ্যটির তলার দিকের যে ফিগরটি আঁকা তার সাহায্যে পরোক্ষভাবে শিল্পী সেই বিন্দুটি লম্বালম্বি দেখাতে চেয়েছেন যেখানে নাকি ব্যাধরা নাগরাজকে ধরে বন্দী করছে। বাঁদিকের দৃশ্যে আছে দুটি শ্রদ্ধার্হ ফিগর, তাদের মধ্যে যেটি মুখ্য, অর্থাৎ ভিক্ষু, সেটি উপরদিকে তুলে আঁকা ; উপর নীচ বা খাড়াই পরিপ্রেক্ষিত, ইংরেজিতে যাকে বলে ভার্টিকল পারস্পেকটিভের, প্রথানুসারে তাতে বোঝায় যে নাগরাজ ভিক্ষু দর্শক থেকে আরও দূরে দাঁড়িয়ে আছেন। ফিগর দুটি অতি ধীরমন্দ ছন্দে পরস্পরের দিকে ঘুরে দাঁড়ায়। ডানদিকের দৃশ্যের দ্রুততালের গতির স্থলে বাঁদিকের ধীর ছন্দ অদ্ভুত এক বৈষম্যের সৃষ্টি করে, ফলে বাঁদিকের দৃশ্যের শান্ত সমাহিত স্তিমিত ভাব আরও বর্ধিত হয়, দীক্ষার গুরুত্ব, সৌম্য সৌন্দর্য ভাল করে ফুটে ওঠে, দর্শকের মনে ভক্তির উদয় হয়, শিল্পীর উদ্দেশ্য সার্থক হয়। মুখ্য চরিত্র দুটির পদতলে একটি স্ত্রীলোক বসে আছে, তার দেহটি ত্রিভুজের আকারে আঁকা। তার স্থাণু ভঙ্গীতে চিত্রটির শান্ত সমাহিত ভাব আরও গভীর হয়, সেইসঙ্গে নারী দেহটি কম্পোজিশনের কেন্দ্রবিন্দুটি চিহ্নিত করে। জাতকটি জানা থাকলে দুটি দৃশ্য যে আলাদা তা বোঝা যায়, কিন্তু প্রথম দেখলে দুটিকে একই দৃশ্য বলে মনে হয়। তার কারণ বাঁদিকের দৃশ্যের দেহরেখার বাঁকগুলির সঙ্গে ডানদিকের নাগরাজের কুণ্ডলীর সর্বদাই যোগাযোগ আছে ; যে গতির বশে দৃশ্য দুটি আলাদা হয়ে যায় তা প্রথমে নজরে পড়ে না ; সে হচ্ছে দুই দৃশ্যের ফিগরগুলির মাথা দুই বিপরীত দিকে ঘোরানো। একাধিক দৃশ্যের যোগ অথবা বিচ্ছেদ সূত্র হিসেবে ফিগরের মাথাগুলিকে এদিক ওদিক ঘুরিয়ে, সুনিপুণ, সূক্ষ্ম কৌশলে খুব সার্থকভাবে আখ্যান চিত্রটি নির্মিত হয়েছে।

এই ধরনের কাজের বহু নমুনা অজন্তায় আছে। এক নম্বর গুহার মহাজনক জাতক আখ্যানটিই ধরা যাক। এই আখ্যানটিতেও দুটি আলাদা অংশ সুস্পষ্টভাবে বর্তমান। রাজপ্রাসাদে ঢাকা বারান্দার চাতালে রাজকুমার রাজকুমারীর সামনে নৃত্য হচ্ছে। রাজপরিবার ঘিরে রয়েছে একটি দল বা গ্রুপ, নর্তকী ও বাদ্যকরদের নিয়ে হয়েছে দ্বিতীয় দল বা গ্রুপ। দুটি দল বা গ্রুপ দুটি কেন্দ্রের চারপাশে বৃত্তাকারে রচিত। শঙ্খপাল জাতক আখ্যানের মতই এখানেও প্রত্যেকটি কম্পোজিশন গোল আকারে আঁকা প্রধান



ফিগরগুলি বৃত্তের মাঝখানে। দেহের ত্রিভঙ্গে, মাথার ভঙ্গিতে ও সংস্থানে, বাহুর বঙ্কিম রেখায়, —সে প্রথম অংশের রাজানুচরীদের দেহেই হোক, অথবা দ্বিতীয় অংশের বাদ্যকর-বাদ্যকরীদের দেহেই হোক, —দর্শকের দৃষ্টি অবলীলাক্রমে অথচ নিতান্ত অনিবার্যভাবে প্রতিটি গ্রুপের মধ্যস্থলের দিকে ধাবিত হয়। অর্থাৎ চারপাশের ফিগরের রেখাগুলি এমনভাবে রচিত যে তারা দর্শকের দৃষ্টিকে আপনা-আপনি অক্লেশে গ্রুপের কেন্দ্রস্থলবর্তী ফিগরের প্রতি চালিত করে। ছবিটির প্রথম অংশ থেকে দ্বিতীয় অংশে যেতে দুটি ফিগর দৃষ্টিকে সাহায্য করে। প্রথমটি দুটি থামের মাঝখানে দাঁড়ানো অবস্থায় একজন স্ত্রীলোক, ফিগরটি রাজপুত্রের গ্রুপের মধ্যে পড়লেও তার দেহ খুব স্পষ্টভাবে নর্তকীদের দলের দিকে ফেরানো। দ্বিতীয় ফিগরটি হচ্ছে এই নারীরই পায়ের তলায় জড়োসড়ো, উপুড় অবস্থায় পড়া আরেকটি ফিগর ; স্ত্রীলোকটির মত এও যদিও স্পষ্টত রাজপুত্রের গ্রুপে পড়ে, তবুও দ্বিতীয় গ্রুপের দিকে মাথা ফেরানো থাকার দরুন সেটি দ্বিতীয় গ্রুপের সঙ্গেই দৃঢ়ভাবে জড়িত। এছাড়াও দুই গ্রুপের মধ্যে আরও দূর পরোক্ষ যোগসূত্র আছে, যার মূল্য অত সহজে বা পরিষ্কারভাবে নিরূপণ করা যায় না ; সে হচ্ছে প্রথম গ্রুপের নর্তকীর দেহের বঙ্কিম ছন্দের মিল ; এই দুটি বাঁকা দেহরেখা যেন এক কল্পিত কর্ণরেখা বা ডায়াগোনালের দুটি প্রান্ত, যে কর্ণরেখাটি রাজকুমারীর ডান পা থেকে শুরু করে উপুড় অবস্থায় পড়া ফিগরের বাহুরেখাটি ধরে দ্বিতীয় গ্রুপের বাঁদিকের বাদ্যকরদের বাঁশিগুলির বরাবর চলে গেছে।

এই ধরনের জোড়া-কম্পোজিশন শুধুমাত্র রেখায় দেখাতে হলে একটি খুব লম্বা সরু ডিম তেরছা বা কোণাকুণি করে কাগজে আঁকতে হবে। এই ডিমের সীমারেখার চারদিকে এমন করে চিহ্ন দিয়ে যেতে হবে যাতে আরেকটি বড় ডিমের আকারের সঙ্গে

তাদের সম্বন্ধ থাকে। এই দুটি ডিমের বিপরীত প্রান্তদ্বয়ের ঠিক ভিতরে আবার থাকবে দুটি গোল বা বৃত্ত ; প্রতিটি বৃত্তের কেন্দ্রকে কেন্দ্র করে সেই বৃত্তের মধ্যে আবার একটি করে গ্রুপ আবদ্ধ থাকবে।

হুবহু ঠিক এই প্যাটার্নটি পাওয়া যায় বাঘের বিখ্যাত হল্লীসক ফ্রেস্কোয়। সেখানেও পাশাপাশি দুটি বৃত্তের কেন্দ্রে থাকে দুটি নর্তকী, সেখানেও কম্পোজিশনের মোটামুটি আকারটি হচ্ছে দেয়ালে কোণাকুণিভাবে ন্যস্ত একটি সরু ডিম। এমনকি অজন্তার কোন কোন চিত্রের কম্পোজিশন অনেক সময়ে অত স্পষ্টাপষ্টি বৃত্তাকারে না হলেও তাদের মধ্যে সর্বদাই বেশ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাব থাকে, সেগুলি স্পষ্টত কোন মুখ্য ফিগরকে কেন্দ্র করে রচিত হয় ; ঠিক যেন গোল বাটির আকারে হেলানো ফুলের পাপড়ির সারি, যাদের বাঁকগুলি চোখকে প্রায় একরকম ঠেলে ঠেলে মধ্যের ফিগরের দিকে নিয়ে যায়।

এখানেও অজন্তাশিল্পী কোন নতুন আবিষ্কারের দাবী করতে পারেন না। অর্থাৎ মৌলিক ডিজাইন সৃষ্টির সম্মান তাঁর প্রাপ্য নয়। ভারুতে বরাবর গোল বা বৃত্তাকার কম্পোজিশনের চেষ্টা দেখা যায় ; বস্তুত ভারুতের পর থেকে গোল কম্পোজিশন প্রায়ই ঘুরেফিরে আসে। তাতে অবশ্য স্থাপত্যের তাগিদ খুব সাহায্য করে, কারণ ছাতের আলসের একঘেয়ে একটানা সোজা রেখা ভাঙতে গিয়ে এসেছে ব্যালাসট্রেডের গোল পদক বা মেড্যালিয়ন : প্রয়োজন হয়েছে সেই মেড্যালিয়নকে ভাস্কর্য-খচিত করার। এই ধরনের কম্পোজিশন অবশ্য অমবাবতীতেই বেশি দেখা যায়। অজন্তাতেও গোল কম্পোজিশন করা একটি মেড্যালিয়ন পাওযা গেছে (এটি এখন মাদ্রাজ মিউজিয়মে আছে), তার বিষয় হচ্ছে এক রাজা উপঢৌকন গ্রহণ করছেন। দৃশ্যটিতে ফিগরগুলির মাথা যেভাবে সাজানো তাতে স্পষ্টই বোঝা যায় শিল্পী বৃত্তাকার কম্পোজিশন নিখুঁতভাবে আনতে চেয়েছেন। কিন্তু এই ধরনের ফর্মে চূড়ান্ত সৌন্দর্য এসেছে অমরাবতীর আর একটি মেড্যালিয়নে। এটিব বিষয হচ্ছে দেবগণ বুদ্ধের ভিক্ষাপাত্র উর্ধবলোকে বযে নিয়ে যাচ্ছেন। এখানে সমস্যা ছিল কি করে দর্শকের চোখ অবলীলাক্রমে বৃত্তের উপরদিকের অংশে অর্থাৎ ভিক্ষাপাত্রের দিকে চালিত করা যায়। সেই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ম্যাসগুলিকে এমনভাবে সাজানো হয়েছে, তাদের চারদিকের রেখাগুলিকে এমন দৃঢ় অথচ লাবণ্যময় ছন্দে একরোখা করা হয়েছে, যে তাদের অপ্রতিহত নির্দেশে চোখ স্বতই ভিক্ষাপাত্রের দিকে যায়।

এটা নিশ্চিত যে এই ধরনের বৃত্তাকার কম্পোজিশনের প্রতি পক্ষপাত নিছক আকস্মিক নয় ; এর মধ্যে গভীর তাৎপর্য আছে। এইসব রচনায় মণ্ডলস্থ গূঢ় তত্ত্বের কথা মনে পড়ে, যে মণ্ডলে থাকে কতকগুলি এককেন্দ্রিক বৃত্ত অথবা চৌখুপী কাটা প্রকোষ্ঠ, যার রহস্যময় মধ্যস্থলে থাকেন স্বয়ং ঈশ্বর বা ধ্যানের দেবতা। এই মধ্যস্থলে যেতে হলে চাই ধ্যান ও আরাধনা, প্রতিটি মণ্ডলের অধিষ্ঠাত্রী দেবগণ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান। এইভাবে স্তরে স্তরে মণ্ডল ভেদ করে সবশেষে সাধকের হয় চরম ব্রহ্মাস্বাদ, ঈশ্বরের সঙ্গে মরমী মিলন, যে ঈশ্বর ভ্রূণস্থিত বীজের মত বিশ্বের অন্তঃস্থলবর্তী কেন্দ্রে সদাই অপ্রকাশিত থাকেন।

এটা সম্ভবত ঠিক যে অজন্তা শিল্পীরা শুধুমাত্র ঐতিহ্যের খাতিরে, অথবা অলঙ্কারের নেশায় বৃত্তাকার রচনা প্রয়োগ করেননি ; তাঁদের চোখে বৃত্তের নিশ্চয় গূঢ় রহস্যময়, মরমী গুণও ছিল। ঠিক এই গুণ, এই তাগিদই নিশ্চয় ছিল অমরাবতীর গোল পদকে বা

মেড্যালিয়নে। আবার ঠিক এই গুণ, এই তাগিদই বরাবর এসেছে ভারত চিত্রকলার কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক রাসমণ্ডল চিত্রাবলীতে। রাসমণ্ডল চিত্রের সবচেয়ে সার্থক নিদর্শন আছে জয়পুরের মহারাজার সংগ্রহে। এই মিনিয়েচরটির মণ্ডলবৃত্তগুলি গোপিনীদেহ দিয়ে তৈরি, তাদের কেন্দ্রস্থলে বিরাজ করেন চরম আরাধনার বস্তু, কৃষ্ণ-রাধা। এই মেড্যালিয়ন সবচেয়ে বেশি দেখা যায় বাংলার ইঁটের মন্দিরে। পাল ও সেন যুগের শত বা সহস্রদল পদ্ম অথবা মুসলমান আমলের মরমী গোলাপও টেরাকাটা মন্দিরে দেখা যায়, তারই পাশে দেখা যায় সারা দেশময় অজস্র ছোট বড় পোড়ামাটিতে মেড্যালিযন আকারে খোদাই অপূর্ব রাসমণ্ডল ভাস্কর্য, যার সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্ববৃহৎ নিদর্শন আছে বিষ্ণুপুরের পঞ্চরত্ন মন্দিরে, বংশবাটীর বাসুদেব মন্দিরে, গুপ্তিপাড়ার রামচন্দ্র মন্দিরে। কলকাতার আশুতোষ মিউজিয়মে হাওড়ার জগৎবল্লভপুর থেকে আনীত পোড়ামাটিতে খোদাই দুটি মেড্যালিয়ন আকারেব রাসমণ্ডলও উল্লেখযোগ্য।

অজন্তাশিল্পী কি অদ্ভুত কৌশলে প্রচলিত কম্পোজিশন রীতি ব্যবহার করেছেন দেখে বিস্মিত হতে হয় ; আরও অবাক হতে হয় কেমন অবলীলাক্রমে তিনি এই রীতিকে যোগসূত্র কম্পোজিশনে প্রয়োগ করেন তাই দেখে, নানা বিচিত্র রূপ এনে তার মর্যাদা যে কত বৃদ্ধি করেন তার যেন ইয়ত্তা নেই।

পারস্পেক্‌টিভের সমস্যা নিরাকরণ ব্যাপারেও অজন্তা শিল্পীরা ঠিক এই ধরনের সুষমা, সঙ্গতি, সংযম, ঐতিহ্যের প্রতি অনুরাগ দেখিয়েছেন। একদিকে কম্পোজিশনের প্রাচীন আইনকানুন তাঁরা যেমন মেনেছেন, তেমনি দুর্লভ কৌশল প্রয়োগে তাঁদের মর্যাদাও তাঁরা বাড়িয়েছেন। তাই তাঁদের কীর্তি ভাল করে বুঝতে হলে প্রাচীন ভারতীয় শিল্পী কী চোখে এই সমস্যাগুলিকে দেখতেন তা জানা দরকার।

ভারুতের নতোন্নত ভাস্কর্য বা রিলিফের মত অত প্রাচীন কাজেও পরবর্তী যুগের ভারতীয় কীর্তির সবকটি লক্ষণ প্রায় বর্তমান। আখ্যানের প্রতি বিশেষ পক্ষপাত থাকায় (গুপ্তযুগের অজন্তাচিত্রেও এই লক্ষণটি সবিশেষ প্রবল) ভারুত শিল্পীরা পাণ্ডিত্যের প্রমাণ যত না দিয়েছেন তত দিয়েছেন পবিচ্ছন্ন যুক্তির। তাঁরা দৃশ্যমান জগতের বিবিধ লক্ষণকে বড় বেশি সরল করেছেন ; সেই সরলীকরণের মধ্যে শুধুমাত্র নৈপুণ্যের অভাব ঢাকা ছাড়া অন্য উদ্দেশ্যও বোধহয় ছিল। ঘনবস্তুর গভীরত্ব ফুটিয়ে তোলার আইনকানুনের প্রতি বিন্দুমাত্র উৎসাহ না দেখিয়ে তাঁরা বস্তুকে সমগ্রভাবে, পুরোপুরিভাবে দেখালেন, তাদের নিজস্ব বিশিষ্ট ভঙ্গির পরিচয় দিলেন, উপরন্তু যেসব ভঙ্গি সবচেয়ে সহজে প্রতিফলিত করা যায় সেগুলি দিলেন। কিন্তু ভারুত শিল্পীকে চট করে অপটু বা মূর্খ ভাবাও হঠকারিতা হবে। তাঁরা নিজেদের কাজ বিলক্ষণ জানতেন, ক্ষমতাও ছিল যথেষ্ট ; প্রয়োজনমত তাঁরা কিছু কিছু লক্ষণ খুব ভালভাবেই চাপা দিতে পারতেন, কিন্তু তা যে স্বেচ্ছায় করতেন তা নয়, কেন যে করতেন তার কারণও তাঁদের কাজে তাই পাওয়া যায়। প্রথমত তখনও তাঁরা প্রতিমার যাদুকরী শক্তিতে বিশ্বাস করতেন, অর্থাৎ তাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠার কথা ভাবতেন, তাঁরা প্রকৃতির নকল অর্থাৎ ফোটোগ্রাফিক প্রতিচ্ছবি করতেন না, অন্তরের মানস প্রতিমাকে রূপ দিতেন। প্রতিমার যাদুকরী শক্তির অর্থই হচ্ছে যে তাতে এমন শক্তি থাকবে যার কৃপায় মঙ্গল বা অমঙ্গল ঘটতে পারে। ফলে প্রতিমা যদি অসম্পূর্ণ হয় তবে তাতে না থাকবে তার পরিপূর্ণ কারিকাশক্তি, না থাকবে তাতে প্রতিমার নিখুঁত গুণাগুণ। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই

যে ঠিক এই কারণেই প্রাচীন যুগের শিল্পে কোন প্রাণীর পাশ থেকে দেখা ছবিতেও অর্থাৎ প্রোফাইলে শিল্পী তার দুটি চোখ, দুটি কান, দুটি শিংই গোটাগুটি স্পষ্ট করে দেখাতেন। এর অনেক পরে, পশ্চিম ভারতের মিনিয়েচর চিত্রশিল্পীরা সদাসর্বদা একপাশ করা প্রোফাইলে ফিগর আঁকলেও তাতে দুটি চোখই গোটা গোটা করে এঁকে দিতেন, ফলে কোটর থেকে দূরের চোখটি বেরিয়ে গিয়ে ছবির জমিতে পড়ত। এই রীতিটি বাংলার পটুয়াদের পটে বিশেষ প্রচলিত, আর প্রচলিত বাংলা কাঁথায় ; তাছাড়া সবচেয়ে বেশি প্রচলিত ছোট ছেলেদের আঁকা ছবিতে, যাদের দৃষ্টির নিষ্কলুষতা এখনও অক্ষুণ্ণ, যাদের জগতে ম্যাজিক এবং রিয়ালিটির ভেদসূত্র অস্পষ্ট। প্রাচীন ভারতশিল্পে প্রোফাইলের ব্যবহার যদিও বিরল, তবুও অনেক ক্ষেত্রেই প্রতিমা যেভাবে আঁকা বা খোদাই হয়েছে তাতে সাধারণত যে অঙ্গগুলি শুধুচোখে একপাশ থেকে দেখা সম্ভব নয়, সেগুলিও আঁকা বা খোদাই করা হত। তাতে চক্ষুবিজ্ঞানের আইনকানুন ভাঙা হত বটে কিন্তু চিত্রে অসম্পূর্ণতা দোষ থাকত না। ঠিক এইখানে ভারতীয় এবং পাশ্চাত্য শিল্পীর মধ্যে প্রভেদ শুরু হল : এইখানেই স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে ভারতীয় শিল্পী চোখে যেমনটি দেখছি তেমনটি, অর্থাৎ প্রতিচ্ছবিমূলক চিত্র আঁকার চেষ্টা করেননি, অর্থাৎ ফোটোগ্রাফের গুণ আনার চেষ্টা করেননি, বরং তাঁদের মানসে যেসব প্রতিমা তাদের বিশিষ্ট মৌলিক গুণে প্রতিভাত হত তাই আঁকবার চেষ্টা করতেন।

এবং যেহেতু প্রথম যুগের শিল্পীরা এই আদর্শে কাজ করে যান, সেহেতু উত্তরগামীরাও তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন, অতীব যত্নসহকাবে সেই পদ্ধতিকে বাঁচিয়ে রাখেন, বিধিবদ্ধ করেন, ঐতিহ্য ভাণ্ডারে সসম্মানে স্থান দেন।

খ্রীষ্টযুগের তিনশতকে শিল্পের ষড়ঙ্গ নামে যে শাস্ত্র লেখা হয় এবং পরবর্তী যুগে ষড়ঙ্গের যেসব ব্যাখ্যা এবং টীকা তৈরি হয় তার থেকে এইটুকু প্রমাণ হয় যে নতোন্নত ভাস্কর্য অথবা প্রাচীন চিত্রকলার যে ব্যাখ্যা এখানে উপস্থাপিত হল তা আদৌ ভুল বা কষ্টকল্পিত নয়। যথা ষড়ঙ্গে রূপভেদ বা রূপের অর্থই হচ্ছে মানস প্রতিমার অন্বেষণ, বাস্তবের সত্যরূপ অথবা রিয়ালিটির প্রতিভাস, ঔপন্যাসিক মার্সেল প্রুস্তের মত সব কিছুকে মনের মধ্যে নতুন করে দেখে, সেই জগতের সঙ্গে মিলিয়ে পুনর্সৃষ্টি করা। মরমিয়া সাধক ধ্যানের বলে সমাধিলাভ করেন ; তদ্‌গত ধ্যানের ফলে শিল্পীরও চেতনায় যখন অনুরূপ শূন্যভাব সহজ হয়ে আসে তখন যে রূপটি তিনি ফুটিয়ে তুলতে চান সেটি ক্রমে ক্রমে তাঁর চেতনায় প্রবেশ করে প্রতিভাত হয়, দানা বাঁধে। এইভাবে যা কিছু সৃষ্ট হয় তাই হচ্ছে প্রকৃত রূপ, ইংরেজিতে যাকে বলে ফর্মসৃষ্টি।

প্রাচীন শিল্পীরা যেহেতু মানসপ্রতিমাকেই ছবিতে রূপ দেবার চেষ্টা করতেন, সেহেতু লেঅনার্দো দা ভিঞ্চির পরে পাশ্চাত্য চিত্রকলায় যা হল ভারতবর্ষে তা হয়নি, অর্থাৎ চোখের চেনা জানা মত ছবি না হলেই শিল্পীকে অপটুত্ব বা অজ্ঞতার বদনাম কিনতে হত না। সুতরাং একই কম্পোজিশনে, একই ফিগর, বস্তু বা ঘরবাড়িকে বারবার নানা কোণ থেকে দেখাতে তাঁদের বাঁধত না। আর তাই দেখাতে গিয়ে প্রতিবারই তাঁরা প্রতিটি ফিগর, বস্তু বা ঘরবাড়ির সবচেয়ে বিশিষ্ট রূপটি দেখাতেন। ফলে তাঁরা একই কম্পোজিশনে একই ফিগরের সমুখ থেকে আঁকা ছবি, পাশ থেকে আঁকা প্রোফাইল, অথবা অর্ধেকের বেশী দেখা যায় এমন কোণ থেকে আঁকা ছবি, ইংরেজিতে যাকে বলে প্ল্যানে-ফেলা ছবি, পাশাপাশি এঁকে দেখাতে একটুও দ্বিধা করতেন না, সে ধরনের

কাজের অসঙ্গতি নিয়ে তাঁরা বিন্দুমাত্র ভাবিত হতেন না। এবং হতেন না বলেই তাঁদের ছবি দেখে মনে হয় যেন দর্শকের দৃষ্টিকোণ ক্রমাগত বদলে যাচ্ছে। ব্যাপারটির তাৎপর্য যে কত গভীর তা অজন্তা নিয়ে সামান্য আলোচনা করলেই বোঝা যাবে।

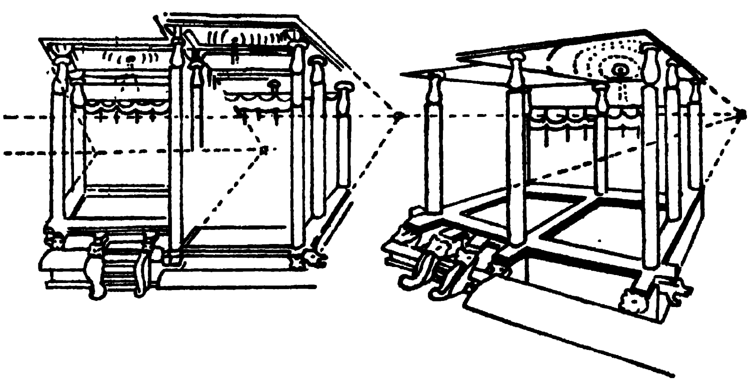
এত গেল ফিগরের কথা ; জড়বস্তুর চিত্রণেও অজন্তাশিল্পীরা অনবরত একই বস্তুর প্ল্যানে-দেখা আর প্রোফাইলে—দেখা রূপ একসঙ্গে পাশাপাশি চিত্রিত করতেন, তাতে সমচতুর্ভুজ অথবা লম্বাটে অসমচতুর্ভুজ বা রেক্ট্যাঙ্গলকে একাধিকভাবে দেখানো সম্ভব হত। যেমন বসবার আসন বা সিংহাসনগুলিকে পায়ার থেকে উপরদিকে লম্বায় বাড়িয়ে দেওয়া হত, যাতে ভাল করে নজরে পড়ে ; তেমনি কোন দৃশ্যের পশ্চাৎপট, মধ্যপট এবং সম্মুখপট একের পর এক আরোপ করে, গভীরত্ব বা ডীপ স্পেসের অনুমান না এনে, এক সারের তলায় আরেক সার, তার তলায় আরেক সার, এইভাবে থাক থাক করে আঁকা হত (ঈজিপশন রীতির সঙ্গে এ বিষয়ে যথেষ্ট মিল আছে)। যেগুলি লমবালম্বি খাড়াই অর্থাৎ ভার্টিকাল, সেগুলি প্রোফাইলে আঁকা হত, যেগুলি আড়াআড়ি বা হরিজনটল সেগুলি খাড়াই বা ভার্টিকল করে প্ল্যানে-দেখা করে আঁকা হত ; গাছের মাথাগুলি চোখের সমান সমান করে, অর্থাৎ ইংরেজিতে আই-লেভল্-এ আঁকা হত ; কিন্তু সরোবর, নদী এবং অন্যান্য নিসর্গচিহ্ন যা নাকি মাটির সঙ্গে সমান, তা এমনভাবে ছড়িয়ে আঁকা হত যেন সেগুলি আকাশ থেকে দেখে আঁকা হয়েছে। এই বইয়ের সূচনায় উল্লেখ করেছি ক্লোদ মনে' এই রীতির চূড়ান্ত ব্যবহার তাঁর জীবনের শেষার্ধে করেছেন।

প্রাচীন যুগে, যথা ভারুতে, আমরা যাকে প্রাচ্য পরিপ্রেক্ষিত বা পারস্পেকটিভ বলি তাই প্রয়োগ করা হত। সকলেই জানেন প্রাচ্য পারস্পেকটিভের নিয়মকানুন পাশ্চাত্য পারস্পেকটিভের একেবারে বিপরীত এমন কি পরিপন্থী। ব্রুনেলেস্‌কো এবং পিয়েরো দেলা ফ্রাঞ্চেস্‌কার পর লেঅনার্দো দা ভিঞ্চি পাশ্চাত্য পারস্পেকটিভের আইনকানুন স্পষ্ট ও প্রায় চূড়ান্তভাবে বিধিবদ্ধ করেন। লেঅনার্দো-প্রণীত আইন মতে, দৃষ্টির কর্ণরেখা বা ডায়াগোনালগুলি আমাদের চোখ থেকে বেরিয়ে এক কল্পিত রেখা, যাকে আমরা দিকরেখা বলি, তারই এক দূর বিন্দুতে মেশে ; তাকে বলে বিলীয়মান বিন্দু, ইংরেজিতে ভ্যানিশিং পইন্ট। পাশ্চাত্য পারস্পেকটিভ এই বিলীয়মান বিন্দুর যথাযথ নির্ধারণের উপর একান্তভাবে নির্ভর করে। কিন্তু প্রাচ্য পারস্পেকটিভে কর্ণরেখা বা ডায়াগোনালগুলি দৃশ্যবস্তু থেকে বেরিয়ে আমাদের চোখে এসে মেশে ; অতএব কর্ণরেখা বা ডায়াগোনালগুলির কাজ এই দুই রীতিতে ঠিক উল্টো। যথা, প্রাচ্য পারস্পেকটিভ অনুযায়ী চৌকি বা পালঙ্কের যে ধারটি আমাদের থেকে সবচেয়ে দূরে সেটিই ছবিতে সবচেয়ে চওড়া দেখানো হবে, যে ধারটি সবচেয়ে কাছে সেটি হবে সবচেয়ে সরু। অপরপক্ষে পাশ্চাত্য পারস্পেকটিভ অনুযায়ী যে ধারটি আমাদের সবচেয়ে কাছে সেটিই সবচেয়ে চওড়া দেখাবে, আর সব চেয়ে দূরেরটি সবচেয়ে সরু দেখাবে। কিন্তু এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে অজন্তায় এবং সমসাময়িক ভাস্কর্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় পারস্পেকটিভ রীতিই পাশাপাশি প্রয়োগ করা হয়েছে। একদিকে যেমন উপর থেকে নীচে, থাকে থাকে, পশ্চাৎপট ও সম্মুখপট আঁকার রীতি আস্তে আস্তে চলে গিয়ে ছবিতে গভীরত্ব বা ডীপ স্পেসের আভাসের সূত্রপাত হল, অন্যদিকে তেমনি ঘরবাড়ি আঁকার ব্যাপারেও পাশ্চাত্য পারস্পেকটিভ প্রায় পুরোপুরিভাবে এল। অপরপক্ষে আবার চোখের স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী যেমন

কাছের ফিগর বড় দেখায়, দূরের ফিগর ছোট দেখায়, এবং সেই চাক্ষুষ অনুমানের উপর ভিত্তি করে, আকার ছোট বড় করে, শিল্পী সাধারণত যেমন দুই বা ততোধিক ফিগরের পারস্পরিক সম্বন্ধ এবং দূরত্ব দেখান, প্রাচীন ভারতীয় শিল্পী কিন্তু অনুরূপ টেকনিকের সাহায্যে তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ, দূরে-কাছে দেখাবার কোন চেষ্টাই করেননি। পাশ্চাত্য রীতি অনুযায়ী দূরের জিনিস অস্পষ্ট দেখানো হয়, খুঁটিনাটি দেখা যায় না, রঙ আস্তে আস্তে ম্লান, অপরিস্ফুট করা হয়, যার ফলে দূরত্ব সম্বন্ধে ধারণা জন্মায় ; অজন্তায় কিন্তু এভাবে দূরত্ব দেখানর কোন প্রয়াস নেই। ঈজিপশন পদ্ধতির মত প্রাচীন ভারতীয় শিল্পেও যে ফিগর যত মুখ্য সে ফিগর স্বাধিকার বলে ছবিতেও তত বড় করে আঁকা, অর্থাৎ বড় বড় ঠাকুরের বড় বড় বপু। এবং ঠিক এই জন্যই মুখ্য চরিত্রগুলির দেহ অন্যান্য ফিগরের চেয়ে সর্বদাই বড় করে আঁকা বা খোদাই করা।

অজন্তাশিল্পী এইসব প্রচলিত প্রথার কোনটাই ত্যাগ করেননি, বরং পূর্বগামীদের চেয়ে তাঁরা সেগুলি অনেক বেশী নিপুণভাবে ব্যবহার করেন, যার দরুন প্রথম দৃষ্টিতে তাঁদের কাজে পাশ্চাত্য পারস্পেকটিভের মানদণ্ডের কোন ত্রুটি সহজে ধরা পড়ে না, অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলে তবে তাদের মধ্যে পারস্পেকটিভের গোলযোগ বা দৃষ্টিবিজ্ঞানবিরুদ্ধ কিছু কিছু বৈলক্ষণ্য ধরা পড়ে।

এক আধটি দৃষ্টান্ত দিলে কথাটি পরিষ্কার হবে। আপাতদৃষ্টিতে সবচেয়ে বেশী পাশ্চাত্যরীতি অনুযায়ী আঁকা একটি স্তম্ভশোভিত ঢাকা বারান্দার মত প্যাভিলিয়ন নেওয়া যাক। এর যে সব রেখা দিক্‌রেখার দিকে গেছে সেগুলি যদি পিছন দিকে আরও বাড়িয়ে দেয়া যায় তাহলে দেখব ভিন্ন ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতের বিলীয়মান স্তরগুলি (ইংরেজিতে বলে ভ্যানিশিং ট্রেস) দিকচক্রবালের কয়েকস্থানে মিশেছে। এদিকে অট্টালিকার সম্মুখের আড়াআড়ি (হরিজণ্টাল) সমান্তরাল রেখাগুলি কর্ণরেখা বা ডায়াগোনালে রূপান্তরিত হবে, দুপাশের তেরছা রেখাগুলি আরও সুস্পষ্ট হবে, বাড়িটি আরও গভীর, অর্থাৎ ভিতরদিকে অনেক বেশী বিস্তৃত দেখাবে। উপরন্তু পিছিয়ে যাওয়া রেখাগুলি যে সব বিন্দুতে মিশেছে সেগুলি ধরে দর্শক ঠিক কোথায় দাঁড়িয়ে আছেন তা অনায়াসে বার করা সম্ভব হয়। কিন্তু যে উদাহরণটি আমরা নিয়েছি সেখানে যদিও

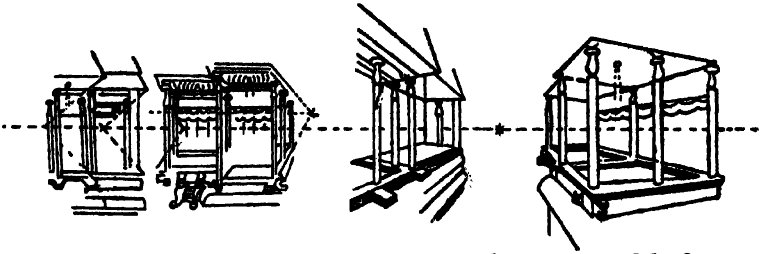


পাশ্চাত্য পরিপ্রেক্ষিতের আইন মোটামুটি মানা হয়েছে, তবুও নানা রকম মজার কাণ্ড আছে। যেমন প্যাভিলিয়নের সম্মুখপট বা ফাসাডটি সমুখো-সমুখি দেখানো হয়েছে, যেন দর্শক সমুখের ঠিক মাঝখানে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দেখছেন ; অথচ সঙ্গে সঙ্গে অট্টালিকার যে ধারটি পিছন দিকে চলে গেছে সেটি দেখে মনে হয় দর্শক যেন প্যাভিলিয়নের কোণাকুণি দাঁড়িয়ে দেখছেন। এই বিভ্রমটি ঘটেছে তার কারণ শিল্পী সত্যকারের কোন বাড়ি দেখে আঁকেননি বা নকল করেননি ; বাড়ির রূপটি মানস চক্ষে দেখে তার প্রতিটি খুঁটিনাটি সম্পূর্ণভাবে উপস্থাপিত করার চেষ্টা করেছেন মাত্র।

কিন্তু অজন্তা শিল্পীর রীতিকে শিশু বা আদিম শিল্পীর সরল, অশিক্ষিতপটু রীতির শামিল মনে করা খুবই ভুল হবে। শিশু বা আদিম শিল্পী আড়াআড়ি অর্থাৎ হরিজণ্টলভাবে সমুখো-সমুখি দেখা ফাসাড এবং একপাশ থেকে থেকে দেখা প্রোফাইলের জগাখিচুড়ি করেই খুশি হয়। কিন্তু অজন্তা শিল্পীর সৃষ্টি হচ্ছে বস্তুকে নিজের মত করে দেখার অভিজ্ঞতার ফল, তার নিজস্ব প্রজ্ঞার উপর প্রতিষ্ঠিত ; চারুশাস্ত্রের বহুমুখী দৃষ্টি বা ইংরেজিতে যাকে বলে মাল্টিপ্‌ল্ ভিশনের টেকনিকের সঙ্গে অজন্তা শিল্পীর টেকনিকের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে।

পাশ্চাত্য চিত্রকলায় খ্রীষ্টীয় চোদ্দ শতকের পর বহুমুখী দৃষ্টি বা মাল্টিপ্‌ল্ ভিশনের টেকনিকে কাজ আর হয়নি বলা যায়। এই টেকনিকেব কল্যাণে দর্শক একই ছবি যেন একাধিক স্থান থেকে দাঁড়িয়ে দেখার সুযোগ পান, অর্থাৎ একই ছবির বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিত বিন্দু থেকে আঁকা, সুতরাং একই ছবিতে একাধিক পারস্পেকটিভ পইণ্ট থাকায় ছবিতে অসম্ভব গতি আসে, স্থাণু বা অনড়ভাব কেটে যায়। অর্থাৎ দর্শক যেন ঘুরে ঘুরে দৃশ্যটি দেখবার সুযোগ পান। ভারতীয় শিল্পে এই টেকনিকটি প্রায় আবহমানকাল থেকে আছে। বস্তুতপক্ষে পাশ্চাত্য ক্লাসিকাল ঐতিহ্যে দর্শক সব সময়ে একটি নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়িয়ে ছবির দৃশ্যটি দেখবেন ; সেই স্থান বা বিন্দুটি একেবারে মাপজোপ করে ঠিক করা, তার নড়চড় হবার নয় ; সুতরাং দর্শক ও দৃশ্য উভয়েই যে যার স্থানে চিত্রার্পিতবৎ স্তব্ধ হয়ে থাকবে, ঠিক যেন চলন্ত দৃশ্যের একটি খণ্ডমুহূর্তের ফোটোগ্রাফ, যেখানে দর্শক এবং দৃশ্য দুই-ই মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে, যে যেখানে আছে জমে যায়। কিন্তু অজন্তায় ঠিক বিপরীতটি ঘটে, সেখানে দর্শককে একেবারে ছবির মধ্যে প্রবেশ করানো হয়, দর্শকের স্থান হয় ছবির মধ্যে ; ছবিতে ঢুকে তিনি ইচ্ছামত ঘুরে ফিরে বেড়ান, আস্তে আস্তে দৃশ্যের পর দৃশ্য যখন উন্মোচিত হয় তখন তিনি নিজের মত করে ঘুরে ঘুরে দেখবার জন্যে আমন্ত্রিত হন ; ফলে দৃশ্যের যত কিছু জটিল ঘটনার মধ্যে তিনি মিশে যান, দৃশ্যের বাইরে দর্শক হিসেবে অস্তিত্ব তাঁর আর থাকে না।

ব্যাপারটি একবার তলিয়ে বুঝলে পাশ্চাত্য-রীতির কথা মন থেকে বাদ দিয়ে ভারতীয় রীতিটি আমরা আরও খুঁটিয়ে দেখতে পারি। আরেকটি দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। এক নম্বর গুহার ভিতর দিকের দেয়ালে যেখানে দুটি প্যাভিলিয়ন পাশাপাশি চিত্রিত আছে সে দুটি ধরা যাক। দৃশ্যটির একটি অংশে আছে রাজ অন্তঃপুরে রাজপুত্র মহাজনকের অভিষেক ; দ্বিতীয় অংশে বৌদ্ধবিহারে তাঁর তপস্যা। প্যাভিলিয়ন দুটির যে-রেখাগুলি পিছনের দিকে গেছে সেগুলি যদি আরও পিছনের দিকে বাড়ানো যায় তাহলে তার ফল এইরকম দাঁড়াবে ; বাড়ি দুটির রেখাগুলি সমানভাবে দুই দিকে বেরিয়ে দুটি বিপরীত বিলীয়মান বিন্দুর দিকে ধাবিত হয়েছে। তার থেকে এই সিদ্ধান্ত করতে হয় যে দর্শকের



স্থান প্যাভিলিয়ন দুটির ফাঁকে গলির মত জায়গার মুখে ঠিক নয়, বরং যেন তিনি দুটি বাড়ির মাঝ বরাবর ভিতর দিকে ঢুকে দাঁড়িয়ে আছেন, যার জন্য বাড়ি দুটি ভাল করে দেখতে গিয়ে তাঁকে একবার বাঁ দিকে ঘুরে দেখতে হচ্ছে, সেটি দেখা হয়ে গেলে আবার ডানদিকে ঘুরে দ্বিতীয়টিকে দেখতে হচ্ছে। এই পারস্পেকটিভ পদ্ধতিটি খুবই প্রাচীন, একে বলে প্রদক্ষিণ পরিপ্রেক্ষিত বা ইংরেজিতে রোটেশন পারস্পেটিভ। অসিরিয়ান এবং ব্যাবিলোনিয়ান চিত্রে এবং ভাস্কর্যে এর যথেষ্ট প্রচলন ছিল। এক নম্বর গুহার চিত্রটি থেকে বোঝা যায় ভারতীয় শিল্পী এই টেকনিকটিকে কত সূক্ষ্ম ও অদ্ভুতভাবে ব্যবহার করেছেন ; আরও বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে অজন্তা শিল্পী যদি এই টেকনিকে আরও অগ্রসর হতেন তাহলে আধুনিক যুগে মাল্টিপল্ ভিশন টেকনিকে যে সমস্ত কাজ হয়েছে তার সঙ্গে অজন্তা চিত্রের খুব নিকট সম্বন্ধ দেখা যেত।

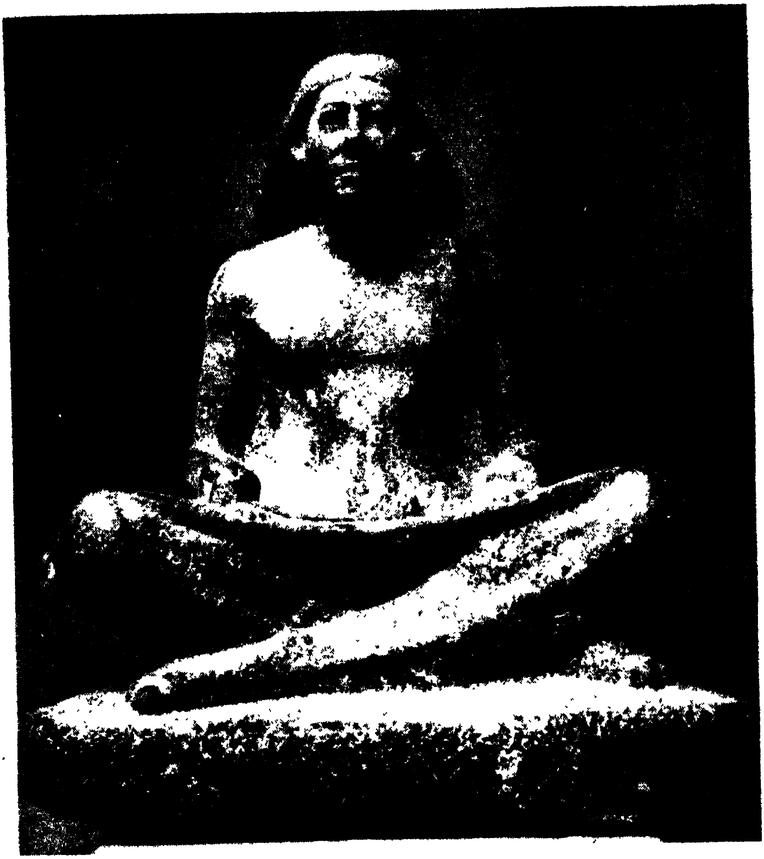
এইভাবে বিচার করলে গুপ্তযুগে অজন্তা শিল্পী কয়েকটি বিষয়ে যে চরম কাজ করে গেছেন তা স্বীকার করতেই হয়। অতীতের উত্তরাধিকারকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করে ঐতিহ্য ও প্রথাসিদ্ধনীতির যথাযোগ্য সংশ্লেষণ করে অজন্তা শিল্পী অতি অদ্ভুত নৈপুণ্যে প্রাচীরচিত্রের কাজে তাঁর শিক্ষাদীক্ষা প্রয়োগ করেন। অজন্তা শিল্পী একই সঙ্গে সমানতালে একদিকে মধ্যবর্তী পিণ্ডের দুপাশে প্রতিসাম্যমূলক সরল কম্পোজিশন, অন্যদিকে বৃত্তাকারে সাজিয়ে যোগসূত্র রচনা বা কনেক্টিং লিঙ্ক-কম্পোজিশন প্রবর্তন করেন। দুই অংশের মাঝখানে যোগসূত্র হিসাবে কোন ফিগর এঁকে এক আখ্যান থেকে আরেক আখ্যানে অবলীলাক্রমে পাড়ি দেন ; অন্যদিকে আবার স্থাপত্য নিদর্শনের যথাযোগ্য যোজনায় একই কম্পোজিশনের বিভিন্ন অংশের মধ্যে এমন স্পষ্ট ভাগ করে দেন যাতে চোখের বিশ্রাম হয়, ছবিতে যতিপাত হয়। শেষে আবার একই দৃশ্যে একাধিক পরিপ্রেক্ষিত বিন্দুর অবতারণার দ্বারা অজন্তাশিল্পী ত ছবিকে বেগমুখর করেন, উপরন্তু দর্শককে চিত্রের মধ্যস্থলে উপস্থাপিত করেন ও চিত্রের ঘটনায় তাঁকে অংশ গ্রহণ করান। এই ধরনের টেকনিক ভারতীয় মিনিয়েচারে প্রতি যুগে সর্বদা বহতা ঐতিহ্য হিসাবে পাই।

এইসব কথা একে একে আলোচনা করলে অজন্তাচিত্র এবং প্রাচীন ভারতীয় রঙ্গমঞ্চের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আবিষ্কার করা যায়। ভারতীয় রঙ্গমঞ্চেও ক্রমান্বয়ে একের পর এক দৃশ্য আসে, দুই দৃশ্যের মধ্যে কোন ফাঁক বা যতি পড়ে না, সেখানেও নটনটীর ছন্দ হয় মৃদুমন্দ ; অথচ মুখের সাবলীল হাবভাবের চেয়ে মাথা হাতের সঞ্চালনেই ভঙ্গী প্রকাশ হয় বেশী। তাই ভারতীয় রঙ্গমঞ্চের রীতির সঙ্গে অজন্তাচিত্রের যোগসূত্র কম্পোজিশনের টেকনিকের এত মিল।

ভেবে দেখলে এই মিলে কিছু আশ্চর্য হবার নেই, কারণ ভারতের যাবতীয় রসশাস্ত্রেরই মূলসূত্র হচ্ছে এক ; ইওরোপের মত এখানে ভিন্ন ভিন্ন শিল্প যোগাযোগহীন বিচ্ছিন্ন জগতের মধ্যে আবদ্ধ নয়। ভারতীয় রসশাস্ত্রের মূল উৎস হচ্ছে ম্যাজিকে অর্থাৎ যা নয় তাই মনে করা এবং সেইমত মূল্য আরোপ করার মধ্যে। মনের গভীরে থাকলেও ভারতীয় শিল্পী একথাটি কখনও ভোলেন না। শব্দশাস্ত্র ও মুদ্রাশাস্ত্রের মত, চারুকলাতেও শিল্পী সর্বদা দেবাসুরসুলভ গুণাগুণ ফুটিয়ে তোলার জন্য ব্যস্ত ; চারুশিল্প হচ্ছে তাঁর সাধনার আধার। ঠিক এই কারণে তিনি খণ্ডিতচিত্রে কখনও সন্তুষ্ট থাকতে পারেন না, এবং তার জন্যই তিনি বহুমুখী দৃষ্টি বা মাল্টিপ্‌ল্ ভিশনের আশ্রয় নেন। চারুশিল্পের সূত্রানুযায়ী শিল্পী ঐশীশক্তির বাহনমাত্র, তাঁর মধ্যে দিয়েই দেবলোকের গুণাগুণ মর্ত্যে প্রতিভাত হয়, তাঁর মধ্যে দিয়েই অর্থাৎ তাঁর সৃষ্টির মাধ্যমেই ঈশ্বরের বৈভব দর্শকে সঞ্চারিত হয়। সুতরাং শিল্পী এবং নট উভয়ে সমতূল্য। নটের মতই শিল্পী জ্ঞাত বস্তুর উপর ভিত্তি করে কাজ আরম্ভ করেন, 'দৃষ্ট' বস্তুর উপর নয় ; অর্থাৎ তাঁর হাতিয়ার দর্শন নয়, জ্ঞান। তাই তিনি চোখের-চেনা-জানাটুকু প্রতিফলিত করার জন্য মোটেই ব্যস্ত হন না, তিনি ছোটেন বাস্তবের সত্যরূপটুকু ফুটিয়ে তুলতে। সে উদ্দেশ্যে উপায় উপকরণ, ভাষার ঝুলি তিনি ইচ্ছা করেই সংক্ষিপ্ত করে নেন, যা নাকি সকলেই সহজে বুঝবে, এমন কতগুলি ভঙ্গী ও রূপ বেছে নেন যা চিরপ্রচলিত, সকলের জ্ঞাত, তাদের বৈশিষ্ট্যগুলিকে তিনি ইচ্ছামত কমান, বাড়ান। নটের মত চিত্রশিল্পীরও উদ্দেশ্য হল দর্শকের মনে এমন এক ভাব বা স্বাদের সঞ্চার করা যাকে শিল্পশাস্ত্রে বলে রস। এর মূলে কিন্তু আছে বাহ্য জগতের অন্তঃস্থিত গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটনের প্রয়াস, দর্শকের স্নায়ুতে এমন এক ঐতিহ্যসিদ্ধ মানস-প্রতিমার সঞ্চার যার কৃপায় দর্শকের মনে একান্ত ব্যক্তিগত ভাব বা রসের উদ্রেক হয়। নটের মত শিল্পীরও উদ্দেশ্য হল দর্শকের মনে এমন কতকগুলি ভাবের সঞ্চার করা যা শুধু মনেরই ব্যাপার, বাস্তবে যার অস্তিত্ব নেই, অথচ মনে সঞ্চারিত হয়ে যা চিত্তশুদ্ধি ঘটাবে। অতএব রঙ্গমঞ্চের মত চিত্রেও যাবতীয় উপাদান এমনভাবে ব্যবহার করতে হবে যাতে প্রকৃত অকৃত্রিম রসটির সঞ্চার হয়। সম্ভবত এই ধরনের নিতান্ত আবশ্যিক কারণেই অজন্তা শিল্পী বৃত্তাকার রচনার প্রতি আকৃষ্ট হন। নৃত্যশাস্ত্রের মত চারুকলাতেও বৃত্ত বা মণ্ডলের আছে মরমী আবেগ এবং ব্যঞ্জনা, নৃত্যের ছন্দে যেমন বিশ্বসৃষ্টি হয়, তেমনি মণ্ডলের ছন্দেই হয় শিল্পীর সৃষ্টি। সুতরাং অজন্তাচিত্রে যে ধরনের কম্পোজিশন ও পারস্পেকটিভ প্রয়োগ হয়েছে তা প্রতিভাসে রূপান্তরিত করা যায় এবং সেই প্রয়াসই হচ্ছে ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

['ভারতীয় চিত্রে রচনা ও পরিপ্রেক্ষিত' বিষয়ে কিছু কিছু আলোচনা প্রসঙ্গক্রমে মূল গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ে আগেও করেছি।]

চিত্রসূচী [কালানুক্রমিক]



চিত্র ৪। ঈজিপশন ভাস্কর্য : লেখক (খ্রীঃ পূঃ ২৭০০)



চিত্র ১। অজন্তা : মহাজনক জাতক (খ্রীঃ পূঃ ২য় শতক)



চিত্র ২৪। জত্তো : দেবদূতগণের সঙ্গে সিংহাসনাসীনা ম্যাডোনা (১৩১০)



চিত্র ২৪(ক)। জত্তো : সেণ্ট ফ্রান্সিসের মৃত্যু (১৩২৫)



চিত্র ১১। ওয়াং মেং : পাইনবন, প্রস্রবণ, পাহাড় (১৩৬৭)



চিত্র ২৭। মাজাচ্চো : করসমর্পণ (১৪২৭)



চিত্র ২৫ ! ফ্রা এঞ্জেলিকো : মেরীর গর্ভাধান ঘোষণা (১৪৪০-৪৭)



চিত্র ২৮। পিয়েরো দেলা ফ্রান্সেসকা : খ্রীষ্টের অভিষেক (১৪৪৫-৫০)



চিত্র ২৬। পাওলো উচ্চেল্লো : সান রোমানোর পরাজয় (১৪৫২-৫৭)



চিত্র ২৯। মান্তেনিয়া : গঞ্জাগা পরিবার [অংশ] (১৪৭৪)



চিত্র ২১। লেওনার্দো দা ভিঞ্চি : দা ভার্জিন অভ্ দি রকস (১৪৮৩)



চিত্র ৩০। বত্তিচেল্লি : ভিনাসের জন্ম (১৪৮৬)



চিত্র ২৩। র‍্যাফায়েল : কুমারী মেরীর বিবাহ (১৫০৪)



চিত্র ৩১। জোভানি বেলিনি : সেন্ট পরিবৃতা সিংহাসনাসীনা ম্যাডোনা [অংশ] (১৫০৫)



চিত্র ২২। জর্জোনে : খোলা মাঠে কনসার্ট (১৫১০)



চিত্র ৭। মিকেলাঞ্জেলো : মোজেস্ (১৫১৩-১৬)



চিত্র ৩৩। তিশান : দস্তানা হাতে লোক (১৫২০-২২)



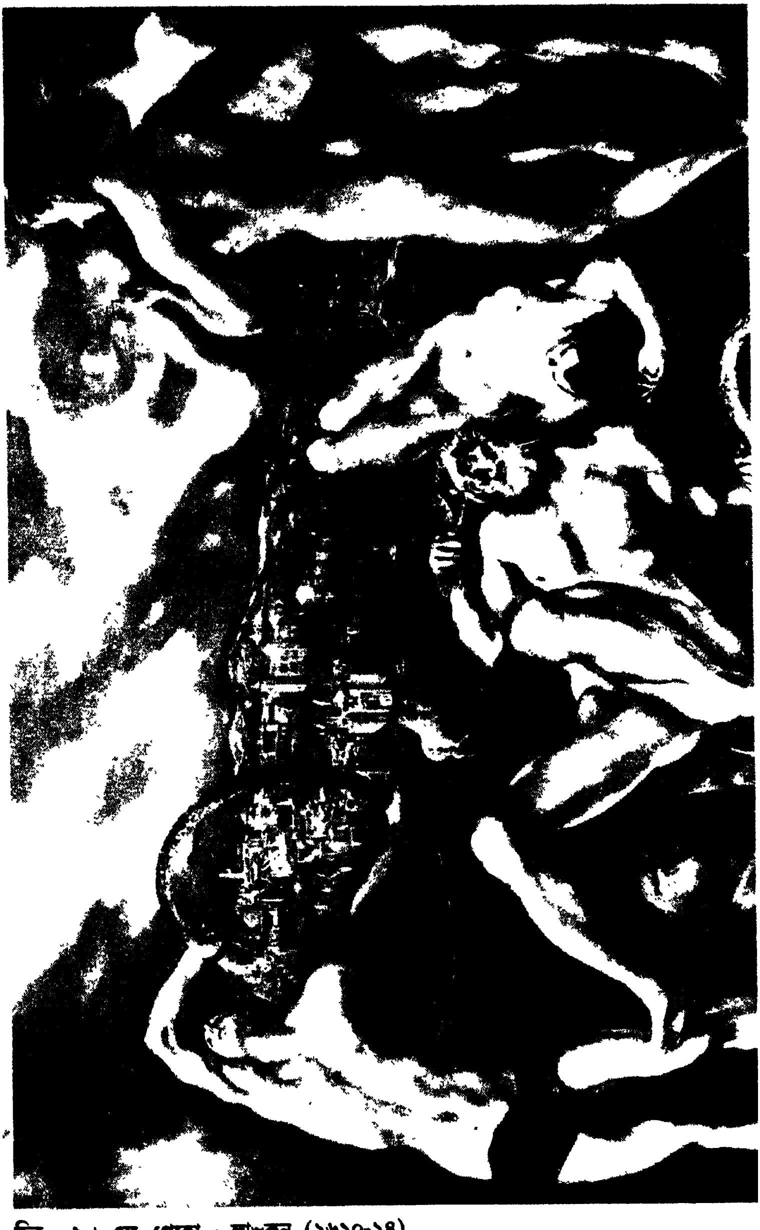
চিত্র ৪৭। করেজ্জো : ডানায়ে (১৫৩০)



চিত্র ৮। তিন্তোরেত্তো : সেণ্ট মার্কের অলৌকিক ক্রিয়া (১৫৪৮)



চিত্র ৩৪। তিশান : সমাধিপাত্রে সমর্পণ (১৫৫৯)



চিত্র ২। এল্‌ গ্রেকো : লাওকুন (১৬১০-১৪)



চিত্র ৩২। গিদো রেণি : নবীন ব্যাকাস [অংশ] (১৬২০)



চিত্র ৪৬। রেমব্রাণ্ট : ক্রস থেকে অবতরণ (১৬৩৩)



চিত্র ৯। শাজাহান যুগ : শাজাহানের দরবার (১৬৪৫)



চিত্র ১৫। পুস্যাঁ : ডায়োজিনিস (১৬৪৮)



চিত্র ১০। ভেলাস্কেথ : রাজকুমারীর সহচরীগণ (১৬৫৬)



চিত্র ৬। রেমব্রান্ট : আত্মপ্রতিকৃতি (১৬৫৮)



চিত্র ১৪। ক্লোদ ল লোরেন : ইউরোপা (১৬৬৭)



চিত্র ৩৫। কাংড়া কলম : রাধার অনুযোগ (আঁনুঃ ১৭৭৫)



চিত্র ১৮। গোইয়া : পঞ্চম চার্লসের পরিবার (১৮০০)



চিত্র ৪৫। জাক দাভিদ : নেপোলিয়ন ও জোসেফিনের অভিষেক [অংশ] (১৮০৭)



চিত্র ২০। অ্যাঙ্গ্র : স্নানরতা (১৮০৮)



চিত্র ১৭। দেলাক্রোয়া : লিবার্টি জনতার নেতৃত্ব করছেন (১৮৩০)



চিত্র ৪৪। গুস্তাভ কুর্বে : আত্মপ্রতিকৃতি : কোলে কুকুর (১৮৪২)



চিত্র ৪৩। এডুয়ার মানে' : ক্রোকে পার্টি (তারিখ ?)



চিত্র ৫। দ্যমিয়ে : রেলের তৃতীয় শ্রেণীর কামরা (১৮৬২ ?)



চিত্র ১৯। রেণোয়ার : কালো পোষাকে অল্পবয়স্ক মেয়েরা (১৮৮০)



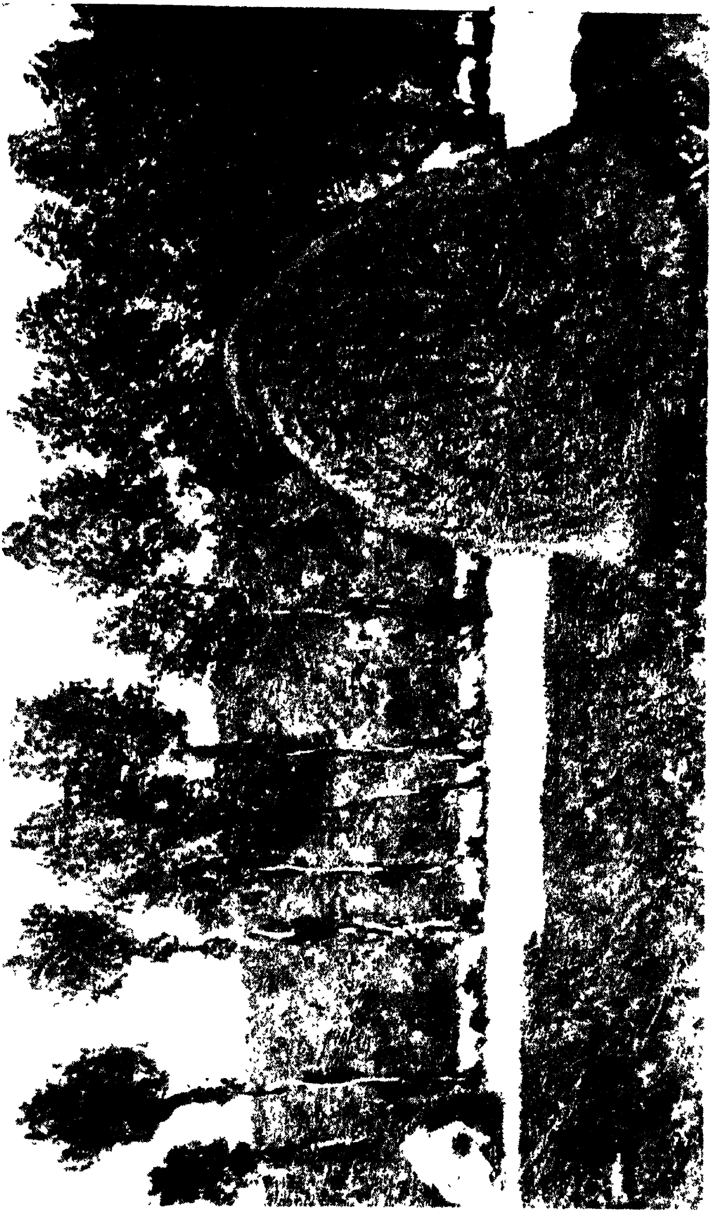
চিত্র ৩৯। ভান গখ : চষা খেত (১৮৯০)



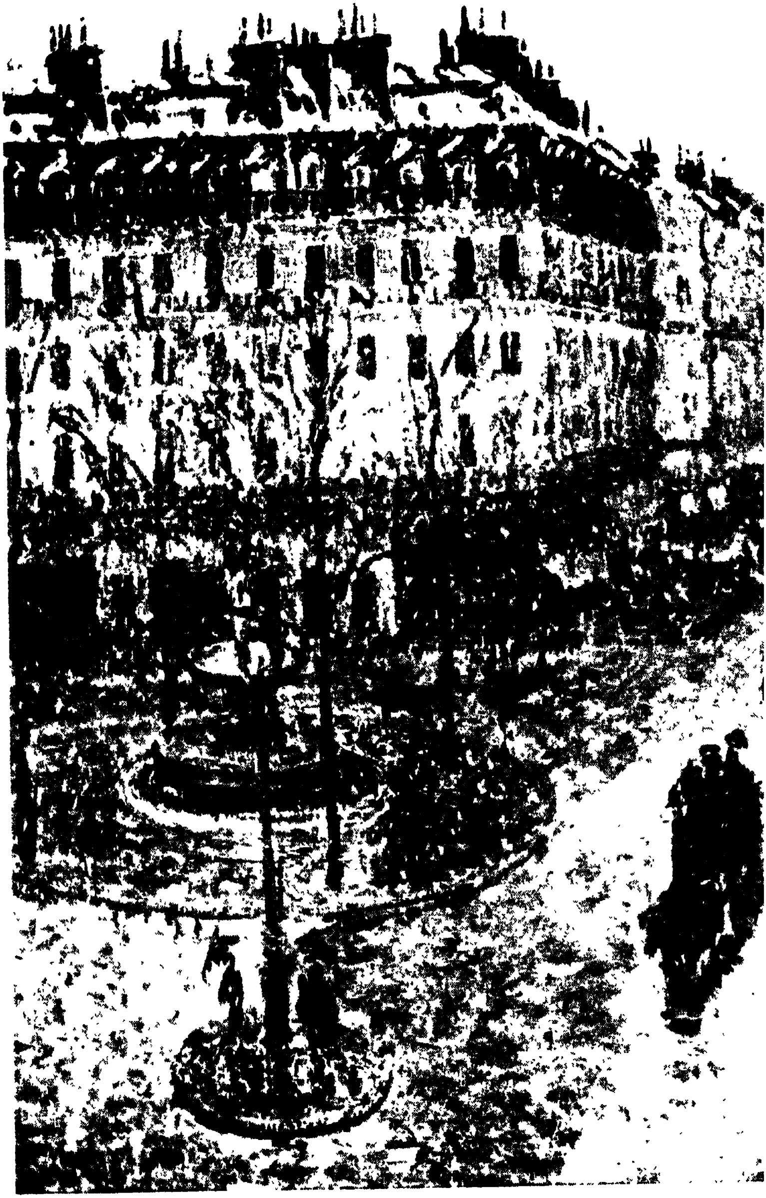
চিত্র ১২। সেজান : সাঁৎ ভিক্তোয়ার ও একুইডাক্ট (১৮৯০)



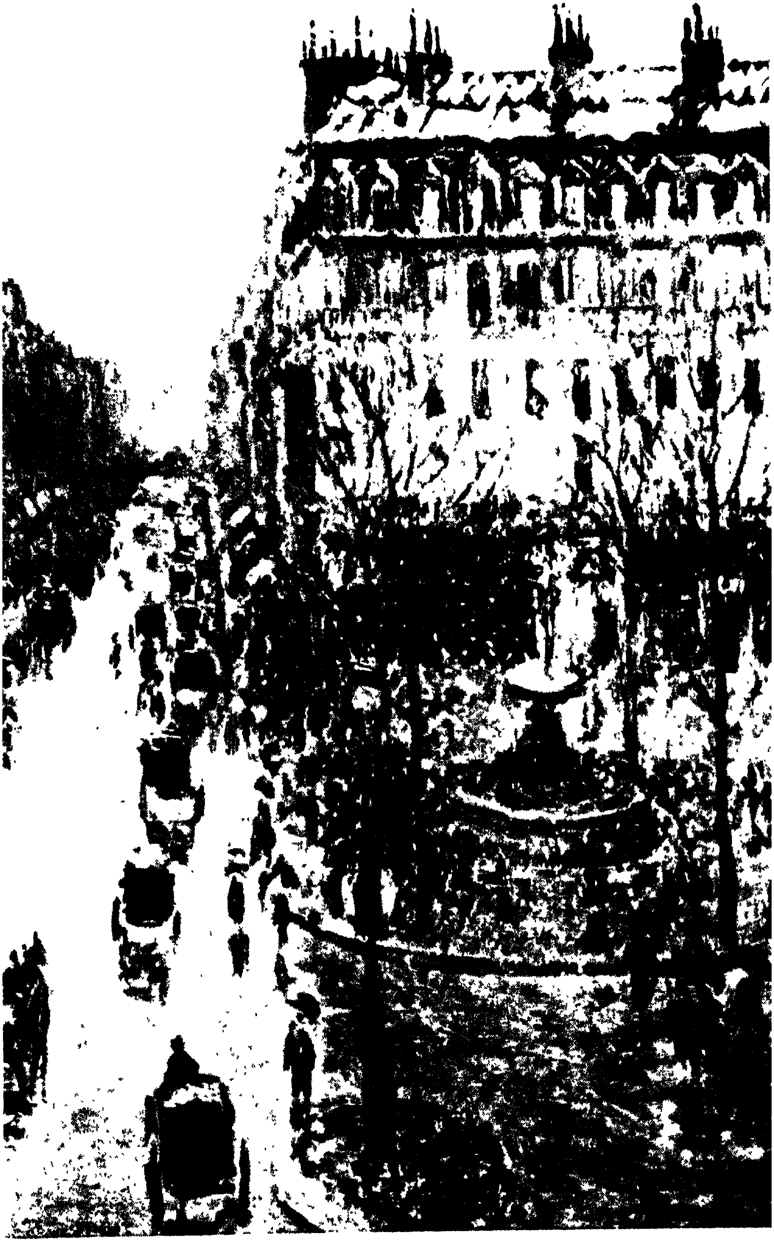
চিত্র ৪০। গোগ্যাঁ : ফল হাতে টাহিটীয় রমণী (১৮৯৩)

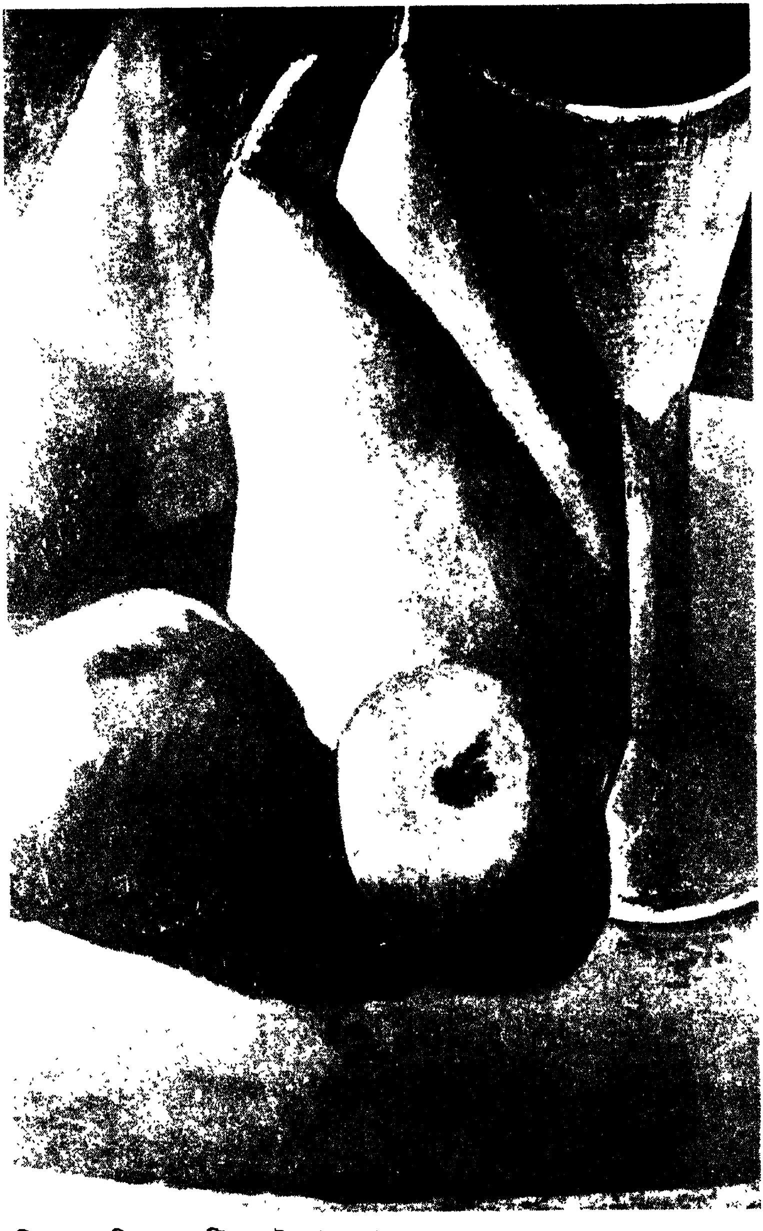


চিত্র ৪১। ক্লোদ মনে' : জিভের্নিতে খেত ও পালুই (১৮৯৯)



চিত্র ১৬। পিসারো : অ্যাভেন্যু দে লোপেরা (১৮৯৯)





চিত্র ৩। পিকাসো : স্টিল লাইফ (১৯০৮)



চিত্র ৩৮। মাতিস : পারিবারিক দৃশ্য (১৯১০)



চিত্র ১৩। দেরায়াঁ : পাইনবন (১৯১২)



চিত্র ৪২। মাতিস : ওড়নামুখে নারী (১৯৪২)



চিত্র ৩৭। বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় : মধ্যযুগের সন্তগণ (১৯৪৭)



চিত্র ৩৬। যামিনী রায় · মেরী ও খ্রীষ্ট (তারিখ ?)

চতুর্থ ভাগ : চিত্রপরিচয়

চিত্রমালার সংক্ষিপ্ত টীকা

'দেশ' পত্রিকায় 'ছবি কাকে বলে' যখন ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল তখন কোন কোন সহৃদয় পাঠকপাঠিকা আমায় বিশেষভাবে লিখেছিলেন, প্রতিটি ছবি সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করলে তাঁদের বুঝতে সুবিধা হত। মন্তব্যের যৌক্তিকতা স্বীকার করে এই অধ্যায়টি যোগ করা সমীচীন মনে করেছি। এক্ষেত্রেও পাঠককে আমার পুনরায় বলা প্রয়োজন যে আমার বিশ্লেষণ আমার সামান্য জ্ঞান দ্বারা সীমিত, এবং কখনই একমাত্র বিশ্লেষণ হতে পারে না। দর্শকের জ্ঞান যত গভীর ও ব্যাপক হবে তাঁর বিশ্লেষণ ততই সম্পূর্ণ এবং মননগ্রাহী হবে।

এই রচনায় যে-সব ছবি মুদ্রিত হয়েছে, সেগুলি কিভাবে গড়া হয়েছে, অর্থাৎ একটুকরো চট, কাঠ, কাগজ বা দেয়ালে অঙ্কিত জমিটি বা একখণ্ড পাথর শিল্পী কিভাবে আস্তে আস্তে রূপান্বিত করেছেন, এবং তাঁর যুগের দর্শনরীতির উপর কিভাবে নির্ভর করে সেই দর্শনরীতি, হয় সমৃদ্ধ, না হয় বদলে, তিনি নতুন পথে এগিয়ে দিয়েছেন, সেই বিষয়ে একের পর এক বিশ্লেষণ ও আলোচনার চেষ্টা করব। অনেক বিশ্লেষক, অনেক পণ্ডিতদের কথা উদ্ধৃত ক'রে, আলোচনাকে অযথা ভারাক্রান্ত করেন, এমন কি পাঠককে বিভ্রান্তও করেন। আমি ধরেই নিচ্ছি পাঠক ইতিমধ্যে হয় অনেক কিছু পড়েছেন, না হয় পড়বেন। আমার ভুলভ্রান্তি, অসম্পূর্ণতাগুলি তিনি যখন আমার ছাত্রছাত্রীর মত ধরতে পেরে নিজের রসবোধকে দৃঢ় করবেন, তখনই আমি পুরস্কৃত বোধ করব।

ইওরোপীয় চিত্রশিল্প, দর্শন ও নন্দনতত্ত্ব সম্বন্ধে এত প্রামাণ্য রচনা আছে যা গুণে শেষ করা শক্ত। ভারতীয় বা নেপালী বা চীনে, কোরীয় এবং জাপানী শিল্প, দর্শন ও নন্দনতত্ত্ব সম্বন্ধেও একই কথা বলা যায়। তবে যাঁরা বিভিন্ন দেশের ছবির দর্শন ও নন্দনতত্ত্বের মূল কথার সঙ্গে পরিচিত হতে চান তাঁদের জন্য মাত্র কয়েকটি বইয়ের উল্লেখ করব।

ইওরোপীয় শিল্প ও চিত্রকলার মূল বুঝতে গেলে পড়তে হবে প্লেটোর বই টিমায়ুস (TIMAEUS)। এটি পার্থিব জগৎ সৃষ্টি ও বিশ্বরচনার বিষয়ে লেখা। রাফায়েল ১৫০৮-১১ সালে একটি ছবি আঁকেন, নাম 'স্কুল অভ অ্যাথেন্স'। সেই ছবিতে দেখি, গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে সিঁড়িতে বসে আছেন প্লেটো, বগলে একটি বই, নাম টিমায়ুস। ইওরোপীয় শিল্পালোচনায় টিমায়ুসের গুরুত্ব এত বেশী যে আমি প্লেটোর অনুবাদক বেঞ্জামিন জোয়েট (বা জাওয়েট) থেকে তাঁর কৃত সংক্ষিপ্তসারটি তুলে দিচ্ছি। বইটি সর্বদা হাতের কাছে পাওয়া যায় না। কিন্তু আমি মনে করি উদ্ধৃতিটি বহু ব্যাপারে পাঠকের কাজে লাগবে, এমন কি কিউবিজ্‌ম বা অ্যানালিটিক্যাল কিউবিজ্‌ম বা অ্যাবস্ট্রাক্ট এক্সপ্রেশনিজ্‌ম বোঝা পর্যন্ত। এমন কি প্রাচ্য শিল্পসৃষ্টি বোঝার ব্যাপারেও।

Space, on taking the form of the elements, was filled with dissimilar forces, which swayed her to and fro. Thus earth, air, fire and water were sifted to their proper places, while they were yet in a rudimentary state, before God perfected them by form and number. The manner of their generation was as follows. The four

elements are solid bodies and all solids are made up of plane surfaces, and all plane surfaces of triangles. All triangles are ultimately of two kinds—i.e. the rectangular isosceles (equal sided), and rectangular scalene (unequal sided with no two sides equal). The rectangular isosceles, which has but one form, and that one of the many forms of scalene which is half of an equilateral triangle were chosen for making the elements. Three of them are generated out of the latter, the fourth alone from the former. Therefore only three can pass into each other. The first and simplest solid, the pyramid, has four equilateral triangular surfaces, each formed by the union of six rectangular scalene triangles. The second species, the octahedron, has eight such surfaces, and the third, the icosahedron, twenty. The fourth, the cube, has six square surfaces, each formed of four rectangular isosceles triangles. There is also a fifth species. Although there are but fair elementary solids, there is but one world.

প্লেটোর পঞ্চমটি হচ্ছে সেজানের ভাষায় সিলিণ্ডার। সেজান জোর দেন তিনটি আকারের উপর : পিরামিড বা কোন (cone), কিউব এবং সিলিণ্ডার। প্লেটো যে ঘনকগুলি বর্ণনা করেছেন, কল্পনা করুন আপনি একটুকরো বড় কাগজ কেটে কেটে তৈরি করলেন। সেই কাটা আকারগুলি যদি গায়ে গায়ে মিলিয়ে ঘনক করেন, তবে প্লেটোর সব ঘনকই করতে পারবেন, এমন কি গোলক বা স্ফিয়ার পর্যন্ত। আবার সেগুলি সব চ্যাপটা করে, টেবিলের উপর রেখে, যদি মেলে ধরেন, তা হলে সেগুলি টেবিলের অনেকখানি নানা আকারের কাগজে গায়ে গায়ে জুড়ে থাকবে। অধিকাংশ ইওরোপীয় বা যে-কোন দেশের চিত্রের জমি যদি বিশ্লেষণ করেন, তবে দেখবেন সারা ছবির জমিটি এই ভাবে নানা আকারের টুকরো মিলে চকমেলানো সৃষ্টি হয়েছে। ঠিক এইখানে প্লেটোর তাৎপর্য এবং গুরুত্ব।

প্লেটোর প্রতিপাদ্যগুলি ইওরোপীয় রণেসাঁসযুগের চিত্রে প্রথম সচেতনভাবে ব্যবহার করেন, যাঁর নাম পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনার সময়ে উল্লেখ করেছি, ফিলিপ্পো ব্রুনেলেস্কি (১৩৭৯-১৪৪৬)। তিনি যুগপৎ স্থাপত্যে ও নকশায় এই রীতি ব্যবহার করেন। কিন্তু চিত্রে যিনি প্রথম প্রায় চূড়ান্তভাবে প্লেটোকে ব্যবহার করেন তিনি পাওলো উচ্চেল্লো (১৩৯৭-১৪৭৫)। লণ্ডনের ন্যাশন্যাল গ্যালারিতে রক্ষিত তাঁর ছবি দা রাউট অভ সান রোমানো (১৪৫২-৫৭) প্লেটোবর্ণিত আকারগুলির চিত্রসিদ্ধ সন্ন্যাসের অপূর্ব নিদর্শন বললে অত্যুক্তি হয় না।

টিমায়ুস থেকে আরেকটি ছোট উদ্ধৃতি দেব। এটি আলো অর্থাৎ চিত্রের সর্বপ্রধান উপজীব্য সম্বন্ধে। প্লেটো বলছেন :

There is a fourth class of sensible things, having many intricate varieties, which must now be distinguished. They are called by the general name of colours, and are a flame which emanates from every sort of body, and has particles corresponding to the sense of sight...in this place it will be natural and suitable to give a rational theory of colours. Of the particles coming from other bodies which fall upon the sight, some are smaller and some are larger, and some are equal to the parts of the sight itself. Those which are equal are imperceptible, and we call them transparent. Simple colours are:

(a) transparent, (b) white, (c) black, (d) bright, (e) red. The compound colours are (a) auburn, (b) purple, (c) umber, (d) flame-colour, (e) dun, (f) pale yellow, (g) dark blue, (h) light blue, (i) leek green.

এতেও পাঠক বুঝতে পারবেন ইম্প্রেশনিস্টদের আগে পর্যন্ত ইওরোপীয় শিল্পীদের প্যালেট, অর্থাৎ রঙের থালি, বিশেষত ক্লাসিকাল যুগে, কেন এখনকার তুলনায় স্বল্প পরিসর ছিল। এবং কেন ইমপ্রেশনিস্টদের কাজ, এমনকি যেসব শিল্পীরা নানা রঙের বিন্দুবিন্দু রঙ দিয়ে ছবি সৃষ্টি করেন, যেমন পোঁয়াতিলিস্টরা (Pointillists), যাঁদের মহান হোতা হচ্ছেন জর্জ সোরা (Seurat), তাঁরাও প্লেটোকেই অনুসরণ করেছেন।

এ গেল একটুকরো চটে, কাঠে বা দেয়ালের জমিতে দৃশ্যমান জগতের আকারগুলি কিভাবে ন্যস্ত করতে হবে, এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ কিভাবে স্থাপিত হবে তার কথা।

এখন কিভাবে দৃশ্যমান জগৎকে দেখে তাকে চিত্রে প্রতিফলিত করতে হবে, অর্থাৎ দেখা এবং দেখান'র ধর্ম কি হবে, তার সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা প্রাসঙ্গিক হবে। এখানে এসে পড়ে ইওরোপীয় পরিপ্রেক্ষিত রীতির কথা, যে বিষয়ে পূর্বের একটি অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। তার কথা অন্যরকমভাবে আবার উপস্থাপিত করা প্রয়োজন।

সমস্যাটি প্রথম দেখা দেয় ঈজিপশান চিত্রে ও নিনেভে'র ভাস্কর্যে। নিনেভে'র জগদ্বিখ্যাত মানুষের মাথাওলা ডানাওলা ষাঁড়টি (খ্রীঃ পূঃ ৭০০) হচ্ছে প্রায় পূর্ণ, সুডৌল ভাস্কর্য (Sculpture in the round)। ছবির চাইতে ভাস্কর্য আলোচনা করলে বুঝতে সুবিধা হবে বলে নিনেভে'র ষাঁড়ের আলোচনা প্রথমেই করছি। যদি ষাঁড়টি সমুখ থেকে বা পাশ থেকে দেখা যায়, তাহলে খুবই স্বাভাবিক দেখায়। কিন্তু কোণাকুণি, অর্থাৎ তিনচতুর্থাংশ কোণ থেকে দেখলে দেখবেন ষাঁড়টির পাঁচটি পা খোদাই হয়েছে। এটা কি ভুল? মোটেই নয়। নিনেভে ভাস্কর্য বা ঈজিপশন ছবিতে দর্শননীতি ছিল অন্যরকম। কোন জীব বা সৃষ্ট বস্তুকে পুরোপুরি দেখাতে হলে, তাঁদের ধারণা ছিল, কল্পনার উপর যত কম নির্ভর করা যায় ততই ভাল। যদি আমরা কোন প্রাচীন ঈজিপশন ছবি দেখি, দেখব সেটা দু'মাত্রিক এবং আমাদের মতে অসঙ্গত। যেমন, মাথা থাকবে প্রোফাইলে (অর্থাৎ একপাশ থেকে), কারণ মাথাই প্রধান গৌরবের ও পরিচয়ের বিষয়। কিন্তু চোখ সামনা-সামনি দেখা, মাথা কাঁধের উপর এমনভাবে ঘোরানো, মনে হয় যেন সর্বদা ঘাড় বেঁকিয়ে আড়পাশে দেখছে, তার কারণ বুক সামনাসামনি দেখাতে হবে, যেহেতু বুকই হচ্ছে নরনারীর গৌরব। অন্যপক্ষে হাত পা পূর্ণভাবে দেখাবার জন্য সেগুলি শরীরের অনুপাতে পুরো রাইট অ্যাঙ্গল্ করে, মাথার মত পাশ করে দেখানো। এবং শরীরের এই মোচড় লুকোবার জন্য থাকে কোমরে কোমরবন্ধ এবং পরিধেয়। অথচ পায়ের পাতা আবার পাশ থেকে দেখা, কারণ পায়ের আকারেই শক্তির পরিচয়। প্রাচীন গ্রীক পটারি চিত্রেও এরকম দেখা যায়। ইওরোপীয় শিল্পীরা নিজেদের পদ্ধতিতে অভ্যস্ত হওয়ার দরুন একে নাম দিলেন অশিক্ষিত দৃষ্টি (naive)। কিন্তু এ ধরনের কাজের দর্শন সম্বন্ধে ধারণা থাকলে একে অশিক্ষিত বলা অন্যায় হবে। পিকাসো তাঁর অনেক চিত্রে এই দর্শনরীতি প্রয়োগ করেছেন।

এই উপলক্ষ্যে ঈজিপ্শন চিত্রে দৃশ্যমান বস্তুর সাইজ সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। ঈজিপ্শন চিত্রে সংস্থান বা দূরত্ব অনুসারে আকারের পরিমাণ (সাইজ) নির্ণীত হত না।

হত সৃষ্টিজগতে অথবা সামাজিক ব্যবস্থায় বস্তুটির বা বিষয়টির গুরুত্ব হিসাবে। যেমন অনেক সময়ে মানুষকে দেখান হ'ত গাছ বা আবাসগৃহ থেকে বড় করে এঁকে। রাজা দেবতার সাইজের, তাঁর রানী বা মেয়েরা তার অর্ধেক অথবা সিকি সাইজের। অজন্তায় ভিক্ষাব্রতী বুদ্ধের ছবি ভিক্ষাদানরতা মা ও ছেলের থেকে বহু সাইজের বড় করে আঁকা হয়েছে। ভারতীয় মিনিয়েচারে রাজারাজড়ার ছবিতে হামেশা এরকম সাইজের তারতম্য দেখা যায়।

কিন্তু ইতিমধ্যে ঈজিপশন ভাস্কর্যে চারিদিক খোদাই সুডৌল মূর্তির চূড়ান্ত উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে (চিত্র ১), এবং ঈজিপ্‌শন ভাস্কর্যের নানা সমস্যাই যে গ্রীক ভাস্কর্যের উপজীব্য হল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। যেমন গ্রীক ভাস্কর্যের কৌরস (নরমূর্তি) বা কৌরে (নারীমূর্তি) যে ঈজিপ্‌শন রীতির বিবর্তনের ফল এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

কিভাবে দৃশ্যমান জগৎ দেখতে হবে এবং দেখাতে হবে তাই হল পারস্পেকটিভ বা পরিপ্রেক্ষিত চিন্তার উপজীব্য।

পারস্পেক্‌টিভের মানে হ'ল স্বচ্ছভাবে দেখা। পারস্পেকটিভ সম্বন্ধে বলতে গেলেই মনে আসে সমান্তরাল রেল লাইনের কথা, যা দূরে গিয়ে মিশে গেছে মনে হয়। এর মধ্যে আছে দর্শন এবং গণিতের তত্ত্ব। চিত্রকরের সমস্যা হল কি করে দু'মাত্রিক একটুকরো চটে দৃশ্যমান জগতের তিনমাত্রিক আকারগুলি এবং তাদের পারস্পরিক সন্নিবেশ ও সম্বন্ধ এমনভাবে দেখাবেন যাতে দর্শকের সবকিছু স্বাভাবিক মনে হয়।

অধিকাংশ দর্শনভাষা এবং সৃষ্টির মূলে আছে গণিত। চিত্র, সঙ্গীত, স্থাপত্য বা ভাস্কর্যে ত বটেই। কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিশেষ কয়েক ধরনের সংখ্যাবিন্যাসকে আবার সবিশেষ উৎকৃষ্ট বলে ধরা হয়। এরই মধ্যে একটি বিশেষ বিন্যাসের কথা ধরা যাক, যাকে সাধারণত বলা হয় আদর্শ বা গোল্ডেন মীন (golden mean)। এটি একটি অনুপাত বা রেশিও (ratio) যার বীজগণিতের সমীকরণ হল :

$$\frac{\text{ক}}{\text{খ}} = \frac{\text{খ}}{\text{ক+খ}}$$

এটি বীজগণিতে এক্সপোনেনশিয়াল রূপ নেয়। এই আদর্শ বা গোল্ডেন মীনের সাহায্য সবচেয়ে বেশী নেন পিয়েরো দেল্লা ফ্রাঞ্চেসকা এবং তাঁর পরে লেঅনার্দো দা ভিঞ্চি।

এমনও বলা যায় রণেসাঁসের প্রথম যুগে ইওরোপীয় পরিপ্রেক্ষিত প্রায় যন্ত্রবৎ অঙ্কের নিয়মকে মেনে চলে, যার সাহায্যে দু'মাত্রিক জমির উপর তিনমাত্রিক বস্তুর আকার ও স্থূলত্ব এবং ঘনত্ব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়। আগেই বলেছি একটুকরো চটের জমিতে দৃশ্যমান জগতের এবং বায়ুর গভীরত্ব এবং দূরে বিলীয়মান হয়ে যাবার ভ্রম প্রথম সার্থকভাবে সাধন করলেন ব্রুনেলেস্কি। সঙ্গে সঙ্গে আরো কয়েকজন দিকপাল এই সমস্যা নিরাকরণে মেতে গেলেন। তাঁদের মধ্যে প্রধান হচ্ছেন অ্যালবার্টি, উচ্চেল্লো, মাজাচ্চো, পিয়েরো দেল্লা ফ্রাঞ্চেস্‌কা, এবং বেনজ্জো গজ্জোলি।

রৈখিক, সরল বা লিনিয়ার পারস্পেকটিভ হচ্ছে এক ধরনের করাস্থি-সম্ভূত বা রেডিয়াল প্রোজেক্‌শন (radial projection) যা দৃষ্টি-কোনের (cone of vision) পথের অন্তঃস্থলে থাকে। কোন বস্তুর আকার এবং দৃষ্টিগ্রাহ্য সাইজ দেখানর জন্য এই

পারস্পেকটিভের ব্যবহার হয়। যে-কোন বস্তুর গা থেকে যতগুলি আলোর কিরণ এসে চোখের মধ্যে বিন্দু হয়ে ঢোকে তারা একটি cone সৃষ্টি করে। এই সোজা সোজা radial বা করগুলির সমান্তরালে আরো বহু রেখা, যেগুলি প্রসারিত হয়ে দৃষ্টির মধ্যস্থলে ভীড় করে, তাকে বলে ভ্যানিশিং পইণ্ট। ছবির চটের গা-ই হচ্ছে ছবির জমি। অনেক সময়ে নির্ভুল গণিতসম্মত পারস্পেকটিভে উল্টো ফল হয়, চোখে দেখার সঙ্গে মেলে না। সেইজন্য অ্যাথেন্সের পার্থেনন মন্দিরে ছাদের পাড়ের এবং থামের সারির রেখা একটু ইচ্ছা করে ধনুকের আকারে বাঁকা করা যাতে চোখে সঠিক সোজা মনে হয়। বড় বড় দৃশ্য বা কাছের থেকে দেখা বড় জিনিস বা ঘর, যেগুলি নাকি দৃষ্টির কোনের ভিতরে সবখানি একসঙ্গে পড়ে না, সেগুলি বিকৃত হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। সেই বিকৃতিগুলি শুদ্ধ করতে হলে একাধিক ভ্যানিশিং পইন্টের সাহায্য নিতে হয়। উচ্চেল্লো সেই সাহায্য নেন, এবং ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে এর প্রয়োগ প্রায়ই দেখা যায়। একে বলা যায় ভ্রাম্যমান বা রোটেটিং পারস্পেক্‌টিভ। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাই ভ্যান আইকের জোভান্নি আর্ণলফিনি ও তাঁর স্ত্রীর (১৪৩৪) প্রতিকৃতিতে। সরু লম্বা ঘরে স্বামী-স্ত্রী পাশাপাশি, কিন্তু পরস্পরকে ছেড়ে, দাঁড়িযে। ছবিটি দেখলেই বুঝতে দেরি লাগে না যে চিত্রকর কোন বিশেষ একটি বিন্দুতে দাঁড়িয়ে দেখছেন না এবং আঁকছেন না। নড়ে চড়ে একবার এ বিন্দু আবার ও বিন্দুতে সরে দাঁড়িয়ে বারবার দেখে আঁকছেন।

এরিয়ল (aerial) বা বায়বীয় পরিপ্রেক্ষিত শুধুমাত্র অঙ্কের উপর নির্ভর করে দাঁড়াতে পারে না। তার জন্য চাই নানান রঙ এবং রঙের তেজীমন্দি। ফিকে এবং শীতল রঙ লাগানো হয় দূর বোঝানোর জন্য, সেই রঙগুলি আবার দূর থেকে নিকটে আসার সময়ে চড়া ও কড়া বা উত্তপ্ত হয়।

এক কথায় বলতে গেলে এই লিনিয়ার পারস্পেক্‌টিভ ছিল পনেরো শতক থেকে উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত ইওরোপীয় চিত্রের একচ্ছত্র অধিপতি। প্রথমে কুর্বে, তারপর ইম্‌প্রেশনিস্টরা, পরে সেজান, একে ভাঙলেন। তাঁদের পরে যাঁরা এলেন, তাঁরা প্রাচ্য পারস্পেকটিভ এবং মাল্টিপল্ ভিশন (বহুমুখী দৃষ্টি) নিয়েই যেন বেশী ব্যাপৃত হলেন, যেমন মনে'। রণেসাঁস পরিপ্রেক্ষিত এখন শুধু অ্যাকাডেমিক কাজেই ব্যবহার হয়।

আরেকটি বিষয়ে সামান্য দু' কথা বলে ভূমিকা শেষ করব। বহু ইওরোপীয় চিত্র ঘরের মধ্যে লোকজন কি করছে বা ঘরের ভিতরের পোর্ট্রেট আঁকা নিয়ে ব্যাপৃত। ভ্যান আইকের কথা বলেছি। তাছাড়া আছেন ভেলাস্কেথ, গ্রেকো, তিশান, ভের্মেয়ার, পিটর ডি হুখ প্রভৃতি আরো অনেকে। রেমব্রান্ট ত আছেনই। এই পরিবেশে শিল্পীর সমস্যা হল দূর দিগ্‌মণ্ডল থেকে যাঁকে আঁকা হচ্ছে তাঁর পা পর্যন্ত যে-সব রেখা এবং সমতল আসছে তাদের একত্র করে গাঁথা। বাস্তব জীবনে আমরা সবটা দেখতে পাই না। উপর নীচে চোখ উঠিয়ে নামিয়ে দেখতে হয়। ধরুন কাঠের মেঝে, যা সমান্তরাল কাঠের পাটাতন দিয়ে বাঁধানো। দূরে সেগুলি ঘন ঘন দেখায়, কাছে এলে ফাঁক ফাঁক, আলাদা আলাদা। মেঝে থেকে শূন্যে উঠে যদি দেখি তবে দেখবো সেগুলি সমান্তরাল। চটের উপর সেভাবে আঁকতে গেলে মেঝের তক্তাগুলি মনে হবে খাড়া খাড়া পাঁচিলের তক্তা। পোর্ট্রেট চিত্রকরের পক্ষে এ এক বিষম সমস্যা। এক সময়ে তিনি মাথা দেখছেন, অন্য

মুহূর্তে দৃষ্টি নামিয়ে পা। যা দেখছেন তাই যদি হুবহু আঁকেন তবে তাঁর ছবির নায়ককে পায়ের আঙ্গুলের উপর ভর দিয়ে, ব্যালে নর্তকের মত অবস্থায় আছেন, দেখাতে হবে। এই ভাবেই প্রথম খ্রীষ্টীয় যুগের বা রোমানেস্ক শিল্পীরা (বা এই রচনায় মাতিসকৃত পারিবারিক দৃশ্য ছবির চরিত্রগুলির মত) তাঁদের নায়কদের দেখাতেন। সর্বপ্রথম এই সমস্যার সমাধান করলেন ভেলাস্কেথ, একটি 'ধাপ্পার' সাহায্যে। তিনি মেঝে এবং দেয়ালের পৃথককারী রেখা দিলেন উড়িয়ে। ফলে তাঁর দাঁড়িয়ে থাকা নায়ক কোনও বিশেষ তল বা প্লেনের উপর দাঁড়াল না, অথচ দাঁড়িয়ে রইল। এই সামান্য সরল ফন্দিটি হল আধুনিক চিত্রকলার জমি-ভাঙ্গার মূল সূত্র। শিল্পী যেন তাঁর দৃশ্যের মধ্যস্থলে শূন্যে দাঁড়িয়ে আঁকছেন। প্রাচ্য চিত্রকলায় এটি বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। ঠিক যেমন ভ্যান আইক ঘরের ভিতরের ব্যাপারে করলেন, সেজান তেমন করলেন তাঁর বহির্জগৎ এবং স্টিল-লাইফে। নিজের চোখ বরাবর লেভোলে সব ভ্যানিশিং পইন্টগুলি বার বার রকমফের করে বদলালেন। যেমন তাঁর স্টিল-লাইফে টেবিলের সমান্তরাল পাশ দুটি দূরে মিশে যাবার চেষ্টা না করে দূরে যেন তফাৎ হয়ে গেল। অভারতীয় মিনিয়েচারের মত। আকারকেও বদলে দিলেন। ঘনবস্তুর মধ্যে দিয়ে দৃষ্টিরেখা চালালেন না, সেগুলি নিয়ে গেলেন তার চারপাশ দিয়ে, ফলে হরিজন্টাল প্লেন বা তলগুলি সবসময়ে এক জায়গায় মিশলো না, খানিকটা যেন ভূগর্ভের জিওলজিক্যাল fault -এর মত ছাড়া ছাড়া হয়ে রইল।

ইওরোপীয় তত্ত্ব সম্বন্ধে ভূমিকা আর বাড়াবো না। চীনে, কোরীয় ও জাপানী চিত্রদর্শন সম্বন্ধেও বহু বই আছে। ভারতীয় তত্ত্ব সম্বন্ধে বহুমূল্য সংস্কৃত মূল ত আছেই। তবে আমার কাছে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাগীশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী (রূপা, কলকাতা, ১৯৬২) এবং বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের চিত্রকর (অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা) বিশেষ মূল্যবান মনে হয়। তাছাড়া আছে নন্দলাল বসুর শিল্পকথা (বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ নং ৩২, ১৯৪৪)।

ছবিগুলি কালানুক্রমে সাজানো হয়েছে, যাতে কিসের পর কি কেমন ভাবে এল বুঝতে সুবিধা হয়।

চিত্র ৪। ঈজিপশন ভাস্কর্য : লেখক (খ্রীঃ পূঃ ২৭০০)

ঈজিপশন চিত্র যে ভাবে নির্মিত হত যার বর্ণনা এই অধ্যায়ের ভূমিকায় দিয়েছি, ঈজিপশন ভাস্কর্যে তার সম্পূর্ণ বিপরীত হত। চারদিকে খোদাই সুডৌল ভাস্কর্যের সমস্ত অনুপাত সম্বন্ধগুলি ঈজিপশন রীতিতে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত হত। চৌখুপী করা কাগজে ভাস্কর সব দিকগুলি একে একে আঁকতেন, প্রতিটি শাস্ত্রীয় নিয়ম মেনে। তারপর পাথর খোদাইকর বড় একটি পাথর বেছে পাথর চেঁচে চেঁচে প্রতিটি মাপ মত মূর্তিটি বের করতেন। ঈজিপশন মূর্তিতে যেমন এই মূর্তিটিতে, ব্যক্তিগত চরিত্র বা অভিব্যক্তি খুব ফুটে উঠত, যদিও মুখের ভাব হত অচঞ্চল, স্থির। দেখলেই মনে হবে কোন বিশেষ ব্যক্তিকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের সঙ্গে খোদাই করা হয়েছে, অথচ শরীরে

বা ভাবে চাঞ্চল্য নেই। এই ভাস্কর্যটির আকার একটি চওড়া কিন্তু বেঁটে cone।

চিত্র ১। অজন্তা : মহাজনক জাতক (খ্রীঃ পূঃ ২ শতক) প্রাচ্য গল্পবলা ছবি। দ্রঃ পরিশিষ্ট : ১. এবং অন্যান্য অধ্যায়।

চিত্র ২৪। জত্তো : দেবদূতগণের সঙ্গে সিংহাসনাসীনা ম্যাডোনা (১৩১০)

রেণেসাঁস যুগের আগে বাইজান্টাইন এবং রোমানেস্ক চিত্রকলায় স্থাপত্য এবং প্রাকৃতিক দৃশ্যপটের বিশেষ স্থান ও কাজ ছিল, ঠিক যেমন ভারতীয় মিনিয়েচারে ছিল। এবং সে-মূল্য বা স্থান প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হত। গথিক যুগেও সে-ঐতিহ্য চলে আসে। জত্তোর গুরু চীমাবুয়েও মোটামুটি এই নীতি অনুসরণ করেন। জত্তো কিন্তু তাঁর ছবিতে স্থাপত্য, প্রকৃতি, পাহাড় ইত্যাদিকে নতুন ধরনের কাজে ব্যবহার করলেন। তাঁর চিত্রে প্রকৃতি এল বিশেষ পরিবেশ হিসাবে, এবং স্থাপত্য ব্যবহৃত হল প্রধান বিষয়ের আশেপাশের অপ্রয়োজনীয় জমি ভর্তি করার তাগিদে। জত্তোর প্রতিটি ছবিতে পরিবেশ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, এবং এই পরিবেশই ছবির মূড বা ভাব সৃষ্টির জন্য বিশেষভাবে দায়ী। ভারতীয় মিনিয়েচারেও ঠিক এই উদ্দেশ্যে পরিবেশ আঁকা হয়। এই পরিবেশের সাহায্যে প্রতিটি মূর্তির চরিত্র ফুটে বেরোয়। সেই চরিত্র চিত্রণের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায় প্রতিটি অংশের পার্থিব এবং অপার্থিব ভাব। এ বিষয়ে জত্তোর ছবি এবং দান্তের কাব্যের মধ্যে অদ্ভুত মিল আছে। এই ছবিটিতে ম্যাডোনার সিংহাসন, উপরের ছত্রী এবং সিঁড়ির ধাপ ব্যবহৃত হয়েছে সমস্ত অপ্রয়োজনীয় জমি ভর্তি করে একটি 'স্টেজ' সৃষ্টি করতে। সেই সঙ্গে সৃষ্টি হয়েছে দেবতার উপবেশনের স্থান। দেবদূতগণ চারপাশে প্রার্থনা, স্তব এবং ঐশী মহিমার পরিবেশ সৃষ্টি করলেন। তাঁদের মাথার পিছনের মহিমা বা হেলাগুলি নানাবিধ প্ল্যাস্টিক তল বা প্লেনের সৃষ্টি করেছে। সিংহাসনের প্রতি পাশে ছয়জন সেন্ট এবং দেবদূত এক ধরনের ঘন ঐক্যের সৃষ্টি করেছেন। চারদিকের শরীর এবং মাথা থেকে অদৃশ্য রেখাগুলি ডায়াগোনালের সৃষ্টি করে ম্যাডোনা এবং যীশুর উপর নিবদ্ধ। ম্যাডোনার দেহ, বিশেষ করে কোমর থেকে পা পর্যন্ত, এত বড় করে আঁকা যে, তাঁর একক মহিমা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

চিত্র ২৪ (ক)। জত্তো : সেন্ট ফ্রান্সিসের মৃত্যু (১৩২৫)

ছবিটিতে সবকিছু অপ্রয়োজনীয় জমি স্থাপত্যে ভর্তি করা হয়েছে। দুটি শোয়ানো ডিম্বাকৃতি (elliptical) আকারের মণ্ডলের সৃষ্টি করা হয়েছে। মাথার উপরে ছোট আরেকটি মণ্ডল, দেবদূতগণ সেন্ট ফ্রান্সিসকে স্বর্গে নিয়ে যাচ্ছেন। নিচে বড় ডিম্বাকৃতি মণ্ডলের মধ্যে ভিতরকার মণ্ডল। ভিতরের মণ্ডলটি সেন্ট ফ্রান্সিসের মৃতদেহ ঘিরে। সকলের চোখ মাথা, দেহ, পরিধেয়র পাট দর্শকের চোখকে সেন্ট ফ্রান্সিসের মুখের দিকের চালিত করে। ঠিক যেমন অমরাবতী মেড্যালিয়নে ভিক্ষুগণ বুদ্ধের ভিক্ষাপাত্র ঊর্ধ্বলোকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। স্থাপত্যের দেয়ালগুলি শোকসন্তপ্ত সন্তদের ধীরে আগমনের ধীরত্ব ও শান্তভাব যেন বেশী করে ফুটিয়ে তুলছে। ছবির প্রধান অ্যাক্সিস (axis) সেন্ট ফ্রান্সিসের স্বর্গগামী আত্মা থেকে নেমে, ছবির মধ্যস্থলে বড় গ্রুপটির মাঝ বরাবর পা পর্যন্ত নেমেছে। অন্যদিকে সেন্ট ফ্রান্সিসের মাথা দ্বিতীয় কেন্দ্র সৃষ্টি করেছে। প্রধান অ্যাক্সিস এবং দ্বিতীয় কেন্দ্রের দুটি আলাদা আলাদা সংস্থানের ফলে ছবিতে অদ্ভুত, সংহত, শোকাবহ টান বা টেনশনের সৃষ্টি হয়েছে। সকল বাহুল্য বর্জিত শোকে তদগত এবং আপ্লুত এই ছবিটি কালের নিশ্চল স্তব্ধভাব এনেছে।

চিত্র ১১। ওয়াং মেং : পাইন বন, প্রস্রবণ, পাহাড় (১৩৬৭)

ওয়াং মেং (১৩০৯-১৩৮৫) ছিলেন চারজন উযান (বিরাট) শিল্পীদের একজন। অন্য তিনজন ছিলেন হুয়াং কুং ওয়াঙ (১২৬৯-১৩৫৪), উ-চেন (১২৮০-১৩৫৪), নি-সান (১৩০১-৭৪)। একনিষ্ঠ শিল্পী ছিলেন। নানা ফর্ম এবং প্রকৃতির নতুন নতুন আকার খুঁজে বেড়াতেন। সেগুলি ফোটানর জন্য নিজস্ব রীতি বা টেকনিক আবিষ্কার করতেন। ছবিতে ফুটে উঠত বাঁকাচোরা, পাকখাওয়া, নানান আকার। তাতেই তাঁর অন্বেষক অশান্ত মনের হদিশ পাওয়া যেত। অনেকটা সেজানের মত।

চিত্র ২৭। মাজাচ্চো : কর সমর্পণ (১৪২৭)

চিত্র ২৫। ফ্রা এঞ্জেলিকো : মেরীর গর্ভাধান ঘোষণা (১৪৪০-৪৭)

চিত্র ২৮। পিয়েরো দেল্লা ফ্রাঞ্চেসকা : খ্রীষ্টের অভিষেক (১৪৪৫-৫০)

চিত্র ২৬। পাওলো উচ্চেল্লো : সান রোমানোর পরাজয় (১৪৫২-৫৭)

চারটি ছবি একসঙ্গে আলোচনার যোগ্য। ফ্রা এঞ্জেলিকোর ছবিটিতে স্পষ্ট বোঝা যায় তিনি কেমন একদিকে জত্তোর রীতি এবং অন্যদিকে রণেসাঁসের গণিতসিদ্ধ পরিপ্রেক্ষিত রীতির মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে। জত্তোর মতই ফ্রা এঞ্জেলিকো স্থাপত্য, অর্থাৎ ঘরবাড়িকে এবং গাছপালাকে ছবির অপ্রয়োজনীয় জমি ভরাবার জন্য ব্যবহার করেছেন। অন্যপক্ষে বাড়ীর স্তম্ভ, ছাতের খিলান, এবং বারান্দার পাথর বাঁধানো পাড় আঁকার সময়ে স্পষ্টত ব্রুনেলেস্কির পরিপ্রেক্ষিত ব্যবহার করেছেন। ব্রুনেলেস্কির অতি সুযোগ্য শিষ্য মাজাচ্চোও এই ব্যাপারটি অতি সূক্ষ্মভাবে তাঁর 'কর সমর্পণ' ছবিতে দেখিয়েছেন। সেই হিসাবে মাজাচ্চো এবং ফ্রা এঞ্জেলিকো সগোত্র। কিন্তু ভেলাস্কেথের সমস্যা সমাধানের হদিস ফ্রা এঞ্জেলিকো পাননি যদিও তিনি এ বিষয়ে বিশেষ অবহিত ছিলেন, এবং ঠিক সেই কারণে বাড়ীর মেঝে এবং দেয়ালের মধ্যের রেখাগুলি খানিকটা অস্পষ্ট রেখেছেন। তবুও দেখুন মেরী যে-টুলে বসে আছেন তার পা দুটি শূন্যে বা মেঝের উপর বসান কিনা সঠিক বোঝা যাচ্ছে না। শূন্যে পা ঝুলিয়ে বসা, অথবা পায়ের আঙুলের উপর টিপ দিয়ে বসার পারস্পেকটিভ-বিরোধী অস্বাভাবিকত্ব ফ্রা-এঞ্জেলিকো সমাধান করেছেন সব পাগুলি কাপড় দিয়ে ঢেকে।

মাজাচ্চো দেখেই মনে হয় তিনি এঞ্জেলিকোর চেয়ে নতুন পরিপ্রেক্ষিত অনেক বেশী আগ্রহে বরণ করে নতুন দিকে এগিয়েছেন। কিন্তু মাজাচ্চো এবং পিয়েরো, উভয়েই জত্তোর আদর্শ—ঐক্য, আধ্যাত্মিক ভাব যা স্তব্ধ শীতল রঙে এবং স্থাপত্যের স্থাণুত্ব এবং ঘনত্বের সাহায্যে ফুটে ওঠে— তা কখনই পরিত্যাগ করতে চাননি।

উচ্চেল্লোর ছবিতে দেখি, পিয়েরো যা গণিত দিয়ে, দর্শনের ব্যাখ্যা দিয়ে প্রতিপন্ন ও প্রতিষ্ঠিত করলেন, তা উচ্চেল্লো হাতেকলমে ব্যবহার করে দেখিয়ে দিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত মানুষ, জন্তু, অস্ত্রশস্ত্র, যা মাটিতে পড়ে আছে, যেমন ভাঙা বল্লম, ঢাল, তরোয়াল, শিরস্ত্রাণ, সবগুলি তিনি সযত্নে সমান্তরাল নির্দেশের সাহায্যে একাধিক ভ্যানিশিং পইন্ট, বা বিলীয়মান বিন্দুর, দিকে চালিয়ে দিলেন। যুদ্ধরত নাইট এবং তাদের ঘোড়াগুলিকে জ্যামিতিক ইউক্লিডের ঘনকে পরিণত করলেন, যেন তারা নানা আকারের প্লেটোক্ত সলিড। ঘোড়ার পেটগুলি ব্যারেল বা পিপে। এমন কি হ্রেষারত ঘোড়ার নাসারন্ধ্র এবং খুরগুলিও তাদের বাঁক বরাবর ভ্যানিশিং পইন্টগুলির প্রতি ধাবমান। যুদ্ধরত সেনাদল যুদ্ধ করবে কি, তাদের যেন মন্ত্রবলে পরাস্ত এবং কয়েদ করেছে জ্যামিতির অমোঘ

আইন ও শৃঙ্খলা, যা নাকি যুদ্ধক্ষেত্রের রক্ত, ধুলো, হট্টগোল, ধস্তাধস্তির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। 'কী সুন্দর এই পরিপ্রেক্ষিত', উচ্চেল্লো সোল্লাসে লাফিয়ে উঠে ঘোষণা করলেন। পিয়েরোও তাঁর সঙ্গে একমত। তাঁর গণিত বিষয়ে লেখায় পিয়েরো দেখালেন কি করে জমির উপরে অর্থাৎ স্পেসে সব ধরনের জটিল আকার নির্মাণ করা যায়, অথচ সে সবেরই মূলে থাকে গোলক, সিলিণ্ডার এবং কিউব। পিয়েরোর কাছে পরিপ্রেক্ষিত এবং আনুপাতিক সম্বন্ধ এবং সামঞ্জস্য একই ব্যাপার। উচ্চেল্লো এবং বতিচেল্লির মত তাঁর চিত্রজগৎ স্পষ্ট, আলোকোজ্জ্বল, হালকা যেন হাওয়ায় ভাসছে, সে অঙ্কিত দৃশ্য যতই কষ্টের বা ভয়াবহ হোক না কেন। পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, সরল, অমিত আশাবাদে ভরা তাঁদের জগৎ। মানুষের অসাধ্য কিছু নেই। সমস্ত দৃশ্যমান আকারই সামঞ্জস্যের অধীন। আকার মডল করার সময়ে ছায়ার অবতারণা নামমাত্র করা হত। যেমন রিলিফ ভাস্কর্যে হয়। তাঁদের জগতে স্পেস একটি, সময়ও একটি। সব কিছু চিরন্তন, নিশ্চিত। বিভ্রমের কিছু নেই। এই হল রণেসাঁসের প্রথম যুগের দর্শন : মানুষ সবই পারে, সবই তার করায়ত্ব। শিল্পী তাঁর কারুশিল্পের অনামীত্ব হারিয়ে হলেন মহান, ব্যক্তিত্বপূর্ণ, সমাজের, দর্শনের, বিদ্যার নেতা, পৃষ্ঠপোষক রাজারাজড়ার সমকক্ষ, তাঁদের নিতান্ত আজ্ঞাবহ আর নন। মুখের উপর বলে দিতে পারেন কি সম্ভব, কি সম্ভব নয়। উপরন্তু তিনি যা করবেন তাই মেনে নিতে হবে। ফলে এল লেঅনার্দো, মিকেলাঞ্জেলোর যুগ। শিল্পীর হাঁটুগাড়া বশ্যতার পরিবর্তে রাজরাজড়া পৃষ্ঠপোষকরা শিখলেন নিজেরা শিল্পীর কাছে হাঁটু গাড়তে। রণেসাঁসের দ্বিতীয় যুগে অবশ্য এল শিল্পীর অস্থির অন্বেষণ, অতৃপ্তি, অধরাকে ধরার আকুল প্রয়াস। যা ছিল এতদিন নিশ্চিত, সবই হল অনিশ্চিত। লেঅনার্দোর গবেষণার ফলে আকার, সরল, স্বচ্ছ, আলোময় থেকে হতে লাগল ছায়াচ্ছন্ন, ঘন, রহস্যময়। প্রান্তদেশের আকার আর স্পষ্ট রইল না। মিকেলাঞ্জেলোর ছবিতে স্পষ্ট এল মহান হতাশা এবং মোহমুক্তি। সারা সৃষ্টিতে স্থিরতা বলে আর কিছু রইল না।

চিত্র ২৯। মান্তেনিয়া : গঞ্জাগা পরিবার [অংশ] (১৪৭৪)

১৪৬০ সালে মাণ্টুয়াতে মান্তেনিয়া গঞ্জাগা পরিবারে চাকরি নেন। তার আগে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন গ্রীক শিল্পের সমঝদার ও অধিকারী স্কোয়ার সিউনের (squorcione) কাছে। তাঁর প্রায় প্রতিটি প্রতিকৃতিতে গ্রীক ভাস্কর্যের মডলিং-এর প্রতি পক্ষপাতিত্ব লক্ষণীয়। এই ছবিতেও সেই প্রভাব লক্ষ্য করার বিষয়।

চিত্র ২১। লেঅনার্দো দা ভিঞ্চি : দা ভার্জিন অভ দা রক্‌স্ (১৪৮৩)

লেঅনার্দোকে গত পঁচিশ বছরের ইউরোপীয় চিত্রকলার এক প্রধান স্তম্ভ বলা যায়। ইউরোপীয় পরিপ্রেক্ষিতের প্রধান রূপকার। যে-কোন প্রাণীর কঙ্কাল-সংস্থান তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আয়ত্ত করেন। আলোর স্বরূপ, ছায়াতপ সম্বন্ধে গবেষণা করেন। তার সঙ্গে আসে আধ্যাত্মিকতা। এই ছবিটি কি ভাবে আঁকা হয়েছিল বর্ণনা করলে, ইউরোপীয় চিত্রাঙ্কণ পদ্ধতির বর্ণনা পূর্ণ হবে।

কুমারী মেরীর কল্পিত মাথা প্রথমে লালচে-ব্রাউন ওয়াশে আঁকা হয়। মডলিং শেষ হলে রঙের টোন দেওয়া হয়। টোনগুলি অবশ্য তখন থাকে অতিরঞ্জিত। ছায়া অংশগুলি বেশ অস্পষ্ট, অন্ধকার, এমন কি আলোর জায়গাগুলিতেও এগিয়ে গেছে। ড্রয়িং কিন্তু খুব সযত্নে করা।

প্রথম আস্তর শুকিয়ে গেলে দ্বিতীয় আস্তর দেওয়া হয়। এই আস্তরে থাকে আগে থেকে তৈরি ফিকে হলদে গোলাপী ত্বকের রঙ (ফ্রেশ-টোন)। তাতে যথেষ্ট সাদা মিশিয়ে মোটা করা। ঠিক ততটুকু তেল আর টার্পিন থাকে যাতে বুরুশ সরে। গোলাপী, উষ্ণ, ফ্রেশ-টোন বেশ গাঢ় করে মাথার হাল্কা আলোর অংশে লাগানো হয়, যথা কপালে গালে। এই আস্তরটি, তলার ব্রাউন আস্তরের উপর ছায়াভরা হাফটোন অংশগুলিতে বুরুশ দিয়ে চারিয়ে দেয়া হয়। অনেক সময়ে বুরুশের বদলে হাতের বুড়ো আঙুলের টিপ বা হাতের পাশ লাগিয়ে চারিয়ে দেওয়া হয়।

যেখানে যেখানে এই আস্তরটি হাল্কা হয়ে নিচের ছায়ার আস্তরের উপর পাতলা পর্দা হয়ে পড়ে, সেখানটিতে ঠাণ্ডা, নীলাভ রঙ হয়, টেবিলে দুধ পড়লে যে রকম দেখায়। তলার ব্রাউন আস্তরটি হলদে লাল আলোর কিরণগুলি শুষে নেয়। ফলে সেগুলি আর প্রতিফলিত হয়ে অর্থাৎ ঠিকরে বেরোয় না। ফলে উপরের আস্তরের রঙের দানাগুলি নীলরঙ ছড়িয়ে দেয়, প্রতিফলিত করে।

সব শেষে খুঁটিনাটি বিষয়গুলি, যেমন ঠাণ্ডা, সাদা উজানো রঙ (হাইলাইট) যথাস্থানগুলিতে লাগানো হয়। তারপর যোগ করা হয় সূক্ষ্ম রেখাগুলি, যেমন চুল, চোখের পাতা, চোখের মণি, ঠোঁট, চুলের বিনুনী ইত্যাদি। এগুলি হয় অনেক সময়ে টেম্পেরায়, তেলরঙে নয়। টেম্পেরা হচ্ছে তেল এবং ডিমের কুসুমের সংমিশ্রণ ; প্রায় খাবার মেয়নেজের মত। ইচ্ছামত তরল করার জন্য এতে জলমেশানো যায়।

এই ধরনের রঙের ব্যবহার প্রায় প্রকৃতির যথাযথ অনুকরণের শামিল হয়। সারা ছবির জমির নানা অংশে প্রয়োজন মত রঙ পুরু পাতলা করা হয়, এবং সেই অনুপাতে সেগুলি আলো শুষে নেয় অথবা ঠিকরিয়ে দেয়। ঠিক যেমন প্রকৃতিতে হয়। কারণ আলোকিত তল মানেই তা আলো প্রতিফলিত করছে আর ছায়ার অংশগুলির কাজ আলো শুষে নেওয়া।

এই দুই আস্তরের রঙের জন্য কিন্তু প্রয়োজন হয় ড্রয়িং-এ সবিশেষ দক্ষতা। কারণ একবার ছবি শুরু করলে আর বদলানো যাবে না। এই দুই আস্তরের উপর আবার রঙ চড়াতে গেলে ছবি ম্যাড়মেড়ে হয়ে যাবে, তার জহরৎসুলভ ঔজ্জ্বল্য বা দ্যুতি খর্ব হবে। একমাত্র রেমব্রান্টই অদ্ভুত কৌশলে তৃতীয় আস্তর দিয়ে ছবির ভাস্বর ভাব বাড়াতে পারতেন, যার বিবরণের জন্য চিত্র ৬ দ্রষ্টব্য।

চিত্র ৩০। বতিচেল্লি : ভিনাসের জন্ম (১৪৮৬)

ছবিটি সৌন্দর্য, মায়া, রহস্য, রূপকথার চিরন্তন প্রকাশ। কখনও পুরনো হবার নয়। অত্যন্ত শাশ্বত ও সরল কম্পোজিশন : মধ্যে একটি দাঁড়ানো কনিক্যাল ম্যাস, দুপাশে দুটি দু দিক থেকে ঝুঁকে পড়া ফিগরের ম্যাস। টীকা লিখে এর গুণাগুণ বর্ণনা করা অনর্থক। গ্রীক কবি হেসিয়ডের মতে ভিনাস বা অ্যাফ্রোডিটির জন্ম সমুদ্রের ফেনা থেকে। গ্রীক পুরাণে অ্যাফ্রোডিটি মধ্যবয়সী মহিলা, বেশ কড়া, বিবাহিত জীবন সংরক্ষণে ব্যাপৃত। রোমান পুরাণে তিনি হলেন চিরপ্রেয়সী, একটু চটুল, কামপ্রবণা, লাস্যময়ী, স্বল্পবসনা তরুণী। মধ্যযুগে হঠাৎ তিনি ধর্মোপাসনার বেদীর গায়ে দেখা দিলেন। শেষমেশ দেখা দিলেন বতিচেল্লিতে শাশ্বত সৌন্দর্য ও কামনার প্রতীক হিসাবে সারা দেহ, মন, মুখ, দৃষ্টিতে সরল বিস্ময় ও বিশ্বাসের অনিন্দ্য মূর্তি হয়ে। একমাত্র কালিদাসের কুমারসম্ভবে উমার বিবরণই এর সঙ্গে তাল রাখতে পারে।

চিত্র ২৩। রাফায়েল : কুমারী মেরীর বিবাহ (১৫০৪)

আমার মতে রাফায়েল ছিলেন অতি সুদক্ষ শিল্পী এবং চিত্রশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, তাঁর পূর্বে এবং সমসাময়িক কালে কি ঘটেছে সব কিছু বিষয়ে ওয়াকবহাল। যা কিছুতে হাত দিতেন তাতেই যেন সোনা ফলত। কিন্তু লেওনার্দো, মিকেলাঞ্জেলো, জর্জোনে, তিশান, বেলিনি বা পিয়েরো আমাকে যেমন নাড়া দেন তেমন গভীরভাবে রাফায়েল দেন না। তাঁরা যেন প্রত্যেকে একেকটি বিরাট অশান্ত সমুদ্র, এবং রাফায়েল অপার্থিব মনোরম হ্রদ। অন্যে যা করতে পারত তিনি তা সবই করতে পারতেন, হয়ত আরো নিখুঁতভাবে, কিন্তু আমার মতে বড় বেশী নিখুঁত আর সুন্দরভাবে। যা আঁকতেন তাতেই থাকত ইংরেজিতে যাকে বলে গ্রেস (grace), সংস্কৃতে যাকে বলে মুক্তাফলের দ্যুতির মত লাবণ্য। পেরুজীনোর ছাত্র হিসাবে আরম্ভ করেন। পেরুজীনো নিজে আবার পিয়েরোর কাছে জ্যামিতি, স্পেস্, এবং মাপজোক শেখেন। কিন্তু পেরুজীনো নিজস্ব রঙ আনলেন এবং ছাত্র রাফায়েলকে তাই শেখালেন। এই সব শিক্ষা আরো ধনাঢ্য করে রাফায়েল হন হাই রণেসাঁসের প্রবর্তক। স্কুল অভ অ্যাথেন্স ছবির উল্লেখ করেছি। এতে রাফায়েলে স্পেস, গভীর স্পেস, পরিপ্রেক্ষিতের নিখুঁত প্রয়োগ করেন। আরো করেন সিলিণ্ডার, কোন এবং রেক্টাঙ্গলের ব্যবহার, এবং ভারসাম্যরক্ষাকারী সিমেট্রির প্রয়োগ। তাঁর ছবিতে জ্যামিতির প্রয়োগ অনবদ্য, যেমন এই ছবিতে। সব কিছুই শান্ত প্রোজ্জ্বল, গ্রেসে পূর্ণ।

চিত্র ৩১। জোভানি বেলিনি : সেন্ট পরিবৃতা সিংহাসনাসীনা ম্যাডোনা [অংশ] (১৫০৫)

জোভানি বেলিনির পিতা জ্যাকোপো বেলিনি মান্তেনিয়ার রীতি ও রুচি দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হন। জ্যাকোপো মান্তেনিয়ার সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিবাহ দেন। ফলে জোভানি মান্তেনিয়ার শ্যালক হন। জোভানি মান্তেনিয়ার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হলেও যেমন তাঁর ফিগরগুলি প্রায় শেষ পর্যন্ত মান্তেনিয়ার মতই গ্রীক ভাস্কর্যের রীতি ঘেঁষা ছিল—শেষ পর্যন্ত তিনি রঙের নেশা এবং অন্বেষায় ভিনিশান চিত্ররীতির দিকে ঝুঁকলেন। এই ছবিটিতে আছে ভাস্কর্যসুলভ প্রতিকৃতি সংস্থান, কিন্তু ভিনিশান রঙ।

চিত্র ২২। জর্জোনে : খোলা মাঠে কনসার্ট (১৫১০)

জর্জোনে ইউরোপীয় চিত্রজগতে এমন এক ক্ষণজন্মা স্বল্পায়ু দিকপাল যিনি তাঁর স্বল্প কাজের দক্ষতায়, কল্পনার সাহসে, এবং মনের ঐশ্বর্যে সারা শিল্পগণ উদ্ভাসিত করে যান : তাঁর সমস্ত ছবিতেই এমন এক রহস্য, রোমাণ্টিক মূড এবং অবচেতন মনের প্রতীকের সৃষ্টি করেন যা তাঁর আগে কেউ করেনি, পরেও খুব কম শিল্পীই তাঁর কবিমনের কাছাকাছি গেছেন। এই ছবিটি এবং তাঁর আরেকটি ছবি টেম্পেস্টা (ঝঞ্ঝা) দেখে বোঝা যায় ক্লোদ লোরেন তাঁর কাছে কত ঋণী।

চিত্র ৭। মিকেলাঞ্জেলো : মোজেস (১৫১৩-১৬)

রচনার এই স্থানটি পড়ে মনে হতে পারে লেখক সম্ভবত মিকেলাঞ্জেলোকে হেয় করেছেন। লেখকদের কাছে তার থেকে অনভিপ্রেত কিছু হতে পারে না। চিত্রকর, ভাস্কর ও স্থপতিদের মধ্যে যদি কেউ স্বর্গ, মর্ত্য ও নরকের গহনে কী আছে, কী দৈন্যে মানুষ দীন এবং কী ঐশ্বর্যে মানুষ মহৎ, কী দ্বিধায় এবং অসহায়তায় মানুষের সবকিছু থেকেও কিছু নেই, সব জ্ঞান থেকেও কোন জ্ঞান নেই, সেই বোধে অবশেষে এই বিরাট

সৃষ্টির সৃষ্টিকর্তা বলে যদি কেউ থাকেন তাঁর কাছে মানুষকে আত্ম সমর্পণ করতে হয় : এ সকল বিষয়ে যদি কেউ বলে থাকেন, এবং সৃষ্টির ঐশ্বর্য, মাধুর্য, সৌন্দর্য, শৌর্য, যন্ত্রণা যদি কেউ তুলে ধরতে সমর্থ হন তাহলে তাঁদের মধ্যে নিশ্চয়ই মিকেলাঞ্জেলো এবং রেমব্রাণ্টের আসন সর্বপ্রথম পঙ্‌ক্তিতে। কিন্তু ঠিক যেমন বিশ্বের অপূর্ব সৃষ্টিতে এমন অনেক বস্তু দেখি যা মনে হয় অতিরঞ্জিত বা অতিপ্রকট। তেমনি মিকেলাঞ্জেলোর বিরাট বিশ্বসৃষ্টি মহিমার মধ্যে মোজেস কিছুটা অতিরঞ্জিত, অতি প্রকট। জটাজুট, পেশী, ঐশী মহিমায় যেন একটু বেশী ভারাক্রান্ত, অন্তত তাঁর ডেভিড বা ব্যাকাসের তুলনায়। কিন্তু যে সব ক্ষেত্রে তাঁর ভাস্কর্য মানুষের শক্তির চরম সীমায় উঠেছে তা হচ্ছে ভ্যাটিকানে রাখা তাঁর পিয়েটা, যা প্রায় নিরাভরণ অথচ চিরন্তন মহিমান্বিত মাতৃশোকের প্রতীক। অথবা তাঁর মিলানে কাস্তেলো স্ফোর্জেসকোতে রক্ষিত দ্বিতীয় পিয়েটা, যা ততোধিক নিরাভরণ, এমন কি অসম্পূর্ণ, কিছুটা অব্যক্ত বলা যায়।

চিত্র ৩৩। তিশান : দস্তানা হাতে লোক (১৫২০-২২)

পোর্ট্রেট জগতে এই ছবিটা সর্বকালের প্রায় শীর্ষে থাকবে, অন্তরাত্মা চিত্রণে যত না হোক অঙ্কন ও রঙ মাহাত্ম্যে। এই ছবির আগে পর্যন্ত, এমনকি জর্জোনেতেও, পোর্ট্রেটে বুকের কাছাকাছি প্যারাপেট বা ভর দেবার আসবাব ধরনের কিছু থাকত। এই প্রথম তিশান পেটের নিচে পর্যন্ত এঁকে এক নতুন রেওয়াজের সৃষ্টি করলেন। আসবাব বা প্যারাপেটের বদলে এল আলো অন্ধকারের সজ্ঞান খেলা। অন্ধকার জমির মধ্যে পরিষ্কার করে গুছিয়ে, য'.। নির্দিষ্ট স্থানে স্থানে সতেজ, মুচমুচে, আলোর ক্ষেত্র পরিস্ফুট করলেন। আলো যতই কম জায়গায় কেন্দ্রীভূত হল ততই তা সন্ধানী হল। প্রথমে মাথা। তাকে তুলে ধরেছে সরু হয়ে নামা শার্ট আর হাত এবং হাতের আস্তিন। তিশান এদের পূর্ণ প্রকাশভঙ্গি দেখাতে মেতে গেলেন। লোকটির অভিব্যক্তি ফুটে উঠল তার মুখে। তিশান মুখ আঁকলেন সামান্য ঘোরানো, একপাশে তাকিয়ে চেয়ে আছে। তার সঙ্গে এল আশ্চর্য অভিব্যক্তিপূর্ণ হাত, ত্বক এবং দস্তানা, হাতের কব্জির লেস। প্যারাপেটের পরিবর্তে হাত হল সমুখজমি। পুরো শরীরটা—কেতাদুরস্ত পোষাক অথচ মোটেই জমকালো নয়—বেশ বোঝা যায় ; যদিও তা ছায়ায় প্রায় অবলুপ্ত (রবীন্দ্রনাথের নারীচিত্রগুলি এই রকম)। সারা ছবির জমি জুড়ে থাকে শরীরের ভঙ্গীর পরিপূরক হিসাবে পোষাকের ভাঁজ। রঙ অত্যন্ত কম—মূলত কালো, সাদা, লাল, এবং মিশ্র ধূসর ও ব্রাউন। যথাসম্ভব স্বল্পভাষে তিশান সবচেয়ে বেশী বলবেন, এই ছিল উদ্দেশ্য। শার্টের উপর লাল নেকলেসের যেমন সম্বন্ধ তেমন সম্বন্ধ এসেছে মুখের সঙ্গে ঠোঁটের। সমান জমিতে শার্ট, কলার, আস্তিনের লেস, দস্তানা, বুরুশের লম্বা লম্বা টানে সোচ্চার। অন্যদিকে বুরুশের ছোট ছোট টানের বৈচিত্র্য বেশ সূক্ষ্ম দৃষ্টির পরিচয় দেয়। এই ধরনের বড় ও ছোট উপাদানের সাহায্যে ছবিটি আমাদের ধরে রাখে। ভঙ্গী আর ছায়া দর্শক আর বিষয়ের মধ্যে দূরত্ব আর সম্ভ্রম আনে। শরীরের যেটুকু দেখা যায় তাতে ত্বকের স্পর্শগ্রাহ্যতা বাড়ে। একটু ঘুরোনো মাথা এবং ভঙ্গী, অন্ধকারে মগ্ন শরীরের রেখা সবই দর্শককে যেন আহ্বান করে ছায়ার ভিতরে প্রবেশ করে মানুষটিকে খুঁজে বার করতে।

চিত্র ৪৭। করেজ্জো : ডানায়ে (১৫৩১)

আলোর রাজা করেজ্জো আলোকে ব্যবহার করেন হর্ষের, আনন্দের, কামনার, প্রেমের উল্লাসময় ব্যঞ্জনার উপকরণ হিসাবে। ব্যক্তিগত সুগভীর শারীরিক ও মানসিক

আবেগকে তিনি এক নতুন পর্যায়ে নিয়ে গেলেন যা পরের শতকে চূড়ান্ত, কিন্তু কিছুটা স্থূল, রূপ গ্রহণ করল। রেমব্রান্টকৃত আরেকটি ডানায়ে আছে। করেজ্জোর ডানায়ের দেহ যেন আলো দিয়ে গড়া। রেমব্রান্টের ডানায়ে নিতান্ত পার্থিব পৃথিবীর ভার এবং কামনার প্রতীক।

চিত্র ৮। তিন্তোরেত্তো : সেন্ট মার্কের অলৌকিক ক্রিয়া (১৫৪৮)

তিন্তোরেত্তো তাঁর তুলিতে আশ্চর্য রকম তিনমাত্রিক ম্যাস ও ঘনত্বের বোধ আনতে পারতেন। সেই গুণে তাঁর সব ছবি সচল, সজীব, চঞ্চল হয়ে উঠত। এই গুণের উত্তরাধিকারী হন গোইয়া। উপরন্তু গতি আনার জন্য, যেমন এই ছবিতে, তিন্তোরেত্তো ইলিপ্স্ এবং স্পাইবালের অবতারণা করেন। শুধু বৃত্তাংশ বা বৃত্তে তিনি সন্তুষ্ট রইলেন না, ফলে ছবিতে গতির অনুভূতি সুদৃঢ় হল।

চিত্র ৩৪। তিশান : সমাধিপাত্রে সমর্পণ (এনটুমমেন্ট) (১৫৫৯)

ছবিটির পূর্বের একটি সংস্করণ আছে, ১৫২৫ সালে করা। ১৫২৫-এরটি আছে প্যারিসের লুভরে, :১৫৫৯-এরটি · ম্যাড্রিডের প্রাডোয়। ছবিটির কাঠামোটি ঋজু, বিষয়ের উপযুক্ত। সোজা ক্রসের চারটি অংশে ছবিটি ভাগ করা। উপর থেকে যে-রেখাটি সোজা হয়ে নেমে এসেছে তা পাত্রেব কোণা বরাবর জমি পর্যন্ত নেমে গেছে। পাত্রের উপরের পাড়ের সমান্তরাল রেখা ভার্টিক্যাল রেখার সঙ্গে কাটাকাটি করেছে। এইভাবে সৃষ্ট চারটি ভাগের উত্তর-পূর্ব ভাগে দেখি মেরী ম্যাগডালেনের ছুটে আসা ভারশূন্য দেহ, আকাশ ও প্রকৃতি। দক্ষিণ-পূর্ব ভাগে দেখি আধারটি এবং তার উপর উপুড় হয়ে পড়া নিকোডেমাসের শরীর। পশ্চিম বা বাঁয়ের অর্ধে সমস্তভার যেন উপর থেকে নিচে নামছে। এই অর্ধেকেই ছবির সমস্ত ওজন। পূর্ব বা দক্ষিণের অর্ধেক সেই অনুপাতে অশরীরী, ওজনহীন। পশ্চিম বা বাম অর্ধে শোকসন্তপ্তদের দেহের ওজন, সর্বোপরি খ্রীষ্টের শরীর, তাঁর সমস্ত ভার নিয়ে নামছে। তাঁর উপরে দেখা যায় জোসেফ, মাতা মেরী, এবং আরেকটি ফিগর। এদের উপর পড়েছে ম্যাগডালেনের এবং নিকোডেমাসের শরীরের ঝুঁকি। এইভাবে সমস্তটি এঁকে তিশান সবকিছুকে সংহতি দিয়েছেন তাঁর বুরুশের কাজে। বাঁ দিকে সমস্ত জায়গা জুড়ে দেখি ভারী, মোটা, বুরুশের কাজ এবং চাপ চাপ রঙ। ডানদিকে দেখি ম্যাগডালেনের দেহে, পোষাকে, আকাশে, বাতাসে, মেঘে, বুরুশের সূক্ষ্ম কাজ এবং হাল্কা রঙ। মধ্যে যোগসৃষ্টি করেছে নিকোডেমাসের লাল পোষাক। পায়ের ডানদিকের গায়ে দেখি স্পষ্ট ভাস্কর্য। এব্রাহামের হাতে আইজাকের বলিদান (ওলড্ টেস্টামেন্টে খ্রীষ্টের বলিদানের প্রতীক) এবং এবেলকে কেনের হত্যা। আজ্ঞাবহ আইজাকের মূর্তির অব্যবহিত পাশে একটি ফলকে তিশানের নাম, তাতে তাঁর নাইট পদবীর উল্লেখও আছে। ফলকটি এভাবে রাখা নিতান্ত আকস্মিক নিশ্চয় নয়। কারণ, উপরে কোণাকুণিভাবে হেলানো খ্রীষ্টের মাথার ঠিক উপরেই খ্রীষ্টকে ধরে থাকা অবস্থায় জোসেফ অ্যারিমেথিয়ার শরীর ও মাথা, এবং সেটি তিশানের আত্মপ্রতিকৃতি। সবগুলি ফিগরের বাইরের রেখা বেয়ে একটি সংহত ডিম্বাকৃতি ইলিপ্সের সৃষ্টি হয়েছে, যার মধ্যমণি হচ্ছেন যীশু। তাঁর নিচের দিকের শরীর এমন ভাবে দোমড়ানো মনে হয় যেন ভেঙ্গে গেছে।

চিত্র ২। এল্ গ্রেকো : লাওকুন (১৬১০-১৪) পাশ্চাত্য গল্পবলা ছবি

গল্পটি হল, গ্রীকদেবতা এপোলোর পুরোহিতদের অকৃতদার থাকার রীতি। পুরোহিত

লাওকুন সে-রীতি অমান্য করেন, এবং তার সঙ্গে গ্রীকদের সাবধান করে দেন যেন তাঁরা ট্রয়-নগরে বিশ্বাসঘাতকতা করে কাঠের ঘোড়া না ঢোকান। প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে এপোলো দুটি বিরাট সামুদ্রিক সাপকে সমুদ্রদেবতা পোসাইডনের পূজার বেদীতে পাঠান। সেখানে লাওকুন ও তাঁর দুই ছেলে দেবপূজায় ব্যস্ত ছিলেন। ল্যাটিন কবি ভার্জিল তাঁর ইলিয়াড কাব্যের দ্বিতীয় ভাগে বর্ণনা করেছেন, সাপদুটি কিভাবে লাওকুন আর তাঁর ছেলে দুটিকে নাগপাশে জড়িয়ে অবর্ণনীয় যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করে। ভ্যাটিক্যানে রক্ষিত লাওকুন ভাস্কর্য-গ্রুপটি টাইটাসের হাত থেকে ১৫০৬ সালে উদ্ধার করা হয়। প্লিনিতে লেখা আছে তিনজন রোড্‌স্‌ দ্বীপের ভাস্কর—পলিডোরাস, আগেসাণ্ডার এবং আথেনোডোরাস—ঐ গ্রুপটি করেন।

ছবিটি করার সময়ে এল গ্রেকো সম্ভবত পাওলো উচ্চেল্লোর রাউট অভ সান রোমানো দ্বারা প্রভাবিত হ'ন। প্রথমেই দেখুন তিনটি সোজা দাঁড়ানো সিলিণ্ডার রূপী তিনটি পুরুষ, মধ্যে পিতা লাওকুনের দেহ, বৃত্তাকারে ন্যস্ত। আরেকটি সিলিণ্ডার আড়াআড়িভাবে শোয়ানো। মোটামুটি তিনটি ভাগ থেকে তিনটি ভ্যানিশিং পইন্ট বেরিয়ে দূরে মেঘের আকারগুলির মধ্যে মিলিয়েছে। এই ভ্যানিশিং পইন্টগুলির এদিক ওদিক যাওয়া, উপরন্তু সাপ দুটির বেড় বৃত্তাকারে প্রচণ্ড আলোড়ন ও যন্ত্রণার সৃষ্টি করেছে। সেই কারণে পশ্চাদ্‌ভূমির বিস্তারও অত বড় করা সম্ভব হয়েছে। গ্রেকোর স্বভাব সিদ্ধমতে প্রতিটি দেহ দীর্ঘায়িত করা, যাতে মানুষী দেহেও অতিমানবীয় আধ্যাত্মিক রূপ ফুটে ওঠে। ফোর শর্টনিং করা নেই। সমুখের পাথরগুলিও রেক্টাঙ্গল আকারের। সমুখের জমি এবং দূরের টোলেডো শহরের ম্যাস পরস্পরের পরিপূরণ করেছে। নরনারীর ব্রাউন ও হাল্‌কা ত্বক সমুখের ব্রাউনের সঙ্গে বৈষম্য এনে ছবিকে বর্ণাঢ্য করেছে। মধ্যস্থলে ট্রোজান ঘোড়া। উপরে নীল সাদা মেঘে সৃষ্টির প্রশান্তি সব যন্ত্রণার ঊর্ধ্বে।

এল্‌গ্রেকো টোলেডো শহরে আজীবন কাটান। প্রতিটি বাড়ি, রাস্তা, গলি তিনি জানতেন। টোলেডোর পত্তন এবং প্রসার বিষয়ে অনেক ছবি এঁকেছেন। অথচ এই ছবি আঁকতে গিয়ে তিনি প্রাসাদ গীর্জা প্রভৃতির সংস্থান, এমন কি টেগাস নদীর বাঁকও ছবির রচনার তাগিদে বদলে দেন (শাজাহানের দরবার চিত্রের মন্তব্য দ্রষ্টব্য।) যেমন টোলেডোর দুটি প্রধান চিহ্ন — কেথিড্রাল এবং প্রাসাদ আল্‌কাজার — এ দুটির আসল পারস্পরিক সংস্থান ছবিতে বদলে দেওয়া হয়েছে।

চিত্র ৩২। গিদো রেণি : নবীন ব্যাকাস [অংশ] (১৬২০)

ছবিটির সঙ্গে তিশানের ব্যাকাস-অ্যারিয়াডনির (১৫২০-২৩) বা দি ব্যাকানাল অভ দি অ্যাণ্ড্রিয়ান্‌স ছবি দুটি দেখলেই আমার বক্তব্য পরিষ্কার হবে।

চিত্র ৪৬। রেমব্রান্ট : ক্রস থেকে অবতরণ (১৬৩৩)

এই ছবিতে রেমব্রান্টের আলোক সত্যই অতি নাটকীয় ও অতিরঞ্জিত হয়েছে। ঠিক যেন অবতরণের প্রাকৃত দৃশ্য মঞ্চস্থ করে কেউ আধুনিক রঙীন ফ্লাডলাইট দিয়ে একটি কোনের সৃষ্টি করেছে।

চিত্র ৯। শাজাহান যুগ : শাজাহানের দরবার (১৬৪৫)

এখানে উল্লেখযোগ্য ছবির রচনা। শাজাহান চিত্রের উত্তর-পূর্ব কোণে তাঁর আসনে আসীন। সমুখে দরবার। উপবিষ্ট ও দণ্ডায়মান দরবারীর মাথার সারি বেয়ে একটি

ডায়াগোনাল শাজাহানের সিংহাসনে পৌঁছেছে। দরবারের বাইরের ও ভিতরের স্তম্ভগুলির মূল ধরে একেকটি লাইন ভাবলে সেগুলিও ডায়াগোনাল করে সিংহাসেনে পৌঁছয়। হাতীর শুঁড়, মধ্যভূমিতে দাঁড়ানো ওমরাহ এবং একেবারে কাছে আর্জি পেশ করা ওমরাহ আরেকটি ডায়াগোনালের সৃষ্টি করেছে। সবকিছুই যেন দর্শকের চোখকে সম্রাটের আসনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

চিত্র ১৫। পুস্যাঁ : ডায়োজিনিস (১৬৪৮)

ক্লোদের সমসাময়িক পুস্যাঁ অধিকাংশ সময় ইটালিতে কাটান। ক্লোদেব সঙ্গে তফাৎ এই যে পুস্যাঁ ছিলেন গ্রীক ক্লাসিসিজমের একনিষ্ঠ ভক্ত। আরম্ভ করেন ভেনেশীয় আলো ও রঙ সম্বন্ধে উৎসাহ নিয়ে, কিন্তু ক্রমশ ঝোঁকেন স্পষ্টতা, ঋজুতা, বাহুল্যবর্জিত. বিদ্যাবুদ্ধি সম্ভূত যাথাযথ্যের প্রতি। সেইজন্য ক্লোদের কল্পনাজড়ানো মায়ার পরিবর্তে তাঁর ছবিতে আমরা বেশি পাই স্পষ্টতা, ঋজুতা, ও সুশৃঙ্খলার বিন্যাস। সেই হিসাবে তিনি সেজানেব গুরু। সতর্ক না থাকলে অনেক সময়ে পুস্যাঁ ও ক্লোদে গোল লেগে যেতে পারে।

চিত্র ১০। ভেলাস্কেথ . রাজকুমারীর সহচরীরা (১৬৫৬)

ছবিটি ইওরোপীয় চিত্রজগতের একটি বড রকমের ধাঁধা বা হেঁয়ালি বলা যেতে পারে। ভূমিকায় উল্লেখ করেছি, ঘরের মধ্যে দাঁড়ানো লোককে কিভাবে আঁকা যায় ভেলাস্কেথ সে-সমস্যার সমাধান করেন। ভেলাস্কেথ এবং রেমব্রান্ট ইওরোপের বারোক যুগের মধ্যমণি। ছবিটির স্প্যানিশ নাম লাস মেনিনাস। ছবির বাঁ দিকে ইজেলের সামনে দাঁড়িয়ে আঁকছেন ভেলাস্কেথ। রাজারানী ঘরে এসে পড়ায় রাজকুমারী চোখ ফিরিয়ে দেখছেন। ছবি আঁকাতে বাধা পড়ে গেল। রাজকুমারীর সহচরীরা রাজারানীর দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছেন। রাজারানী ছবির বাইরে। তাঁদের ছবি দূবে আয়নায় প্রতিফলিত। রাজান্তঃপুরের এরকম নিভৃত দৃশ্য বিরল। কিন্তু ছবিটি অঙ্কনরীতির নানা সমস্যায় কণ্টকিত। সবকিছু ভাল করে ব্যাখ্যা করা যায় না। অথচ জলজ্যান্ত এবং জ্বলজ্বলে। স্বভাবতই মনে হয় ছবির দর্শকের স্থান ছবিব বাইরে, রাজারানী যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন তার কাছাকাছি। সমুখপট থেকে কোন(cone)হয়ে ভ্যানিশিং পইন্ট দূরে দরজার বাইরে (যেখানে একটি লোক দাঁড়িয়ে আছেন) যাচ্ছে। চিত্রকর বেশ আত্মাভিমানী ব্যক্তি, অথচ বোঝা যায় বাজপরিবাবে তাঁর সামাজিক স্থান রাজকুমারীর সহচরী বা বামনদের চেয়েও নিচে। এমন কি কুকুরটি পর্যন্ত রাজপরিবারের অন্তর্ভুক্ত, যা তিনি নন। সম্ভবত চিত্রকরের সামাজিক স্থান পিছনের যাজক ও সন্ন্যাসিনীর সমান পর্যায়ে। ছবিতে এই ধরনের সামাজিক পার্থক্য ও ধাঁধার উপরে আবার আছে চিত্রাঙ্কনের ধাঁধা। চিত্রাঙ্কন পদ্ধতি এখানে অত্যন্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। কারাভাজ্জোর ছায়াতপ, আলো অন্ধকার তিনি আয়ত্ত করেন। প্রথম থেকেই ভেলাস্কেথের প্রতিভায় দুটি দিক দেখতে পাই। একটি মানবিক অর্থাৎ নরনারী তাঁকে কিভাবে নাড়া দেয় এবং তাদের তিনি কিভাবে আঁকেন। সেইজন্য মুখ এবং ঠোঁটের চারপাশের উপর জোর দিতেন। নিজে ছিলেন স্প্যানিশ, নির্লিপ্ত, গর্বিত, দূরত্ববজায়রাখা লোক। এই গেল তাঁর মানবিক দিক। দ্বিতীয় দিক হল তাঁর রঙ লাগান'র নিজস্ব পদ্ধতি। তাঁর কাজে রঙের পোঁচড় মায়া বা ভ্রম সৃষ্টিতে সাহায্য করত। আকার যত না ব্যক্ত করত তার চেয়ে তার উপর যেন পাতলা ওড়না দিত। ফলে তাঁর রঙের পোঁচড়ের উপর স্বভাবতই দৃষ্টি পড়ে। পোষাক যেভাবে

চিকচিক করে তা পোষাকের গুণে নয়, রঙের গুণে। অনেকটা গোইয়া এবং রেম্‌ব্রান্টের মত।

চিত্র ৬। রেম্‌ব্রান্ট : আত্মপ্রতিকৃতি (১৬৫৮)

প্রতিকৃতি চিত্রণে, বিশেষত আত্মপ্রতিকৃতি চিত্রণে রেম্‌ব্রান্ট এমন এক তীব্র ভাব এবং অনুভূতি প্রকাশ করেন, যা আর কেউ করেছেন কিনা সন্দেহ। একমাত্র বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি নারী প্রতিকৃতিতে করেছেন, আরো সরল পদ্ধতিতে। প্রতিকৃতি আঁকায় রেম্‌ব্রান্ট আলো এমনভাবে ব্যবহার করেছেন, মনে হয় যেন দেহের ভিতর থেকে বিচ্ছুরিত হয়ে অন্তরতম চরিত্রকে উদ্ভাসিত করছে। যত বয়স হতে লাগল ততই তাঁর দৃষ্টি অন্তর্মুখী হ'ল, যেন যা সমুখে আছে তাতে উৎসাহ নেই, মনের গহন কোণে কি আছে তা উদ্ধার করাই তাঁর সমস্যা। প্রতিকৃতি অঙ্কনে লেঅনার্দো যে দুইপ্রস্থ রঙ একের পর এক চড়ানোর রীতির প্রবর্তন করলেন, তার চূড়ান্ত সদ্ব্যবহার করেন জর্জোনে, তিশান এবং তিন্তোরেত্তো। পরে রুবেন্স। কিন্তু রুবেন্স ছিলেন রাজারাজড়ার শিল্পী, বহু শিল্পীকে সহকারী হিসাবে নিতেন। রেমব্রান্ট ছিলেন প্রায় সংসারত্যাগী একাকী। তাই লেগে গেলেন একেবারে নিতান্ত একা হাতে। লেঅনার্দো, তিশান বা রুবেন্সের রং দেওয়ার পদ্ধতি যেভাবে বর্ণনা করা যায়, রেম্‌ব্রান্টের পদ্ধতি সে-ভাবে বর্ণনা করলে সম্পূর্ণটি বলা হয় না। প্রায়ই দেখা যায়, তিনি লেঅনার্দোর দু প্রস্থ রঙ একই ছবিতে বার বার চড়াচ্ছেন, শুধু আগের প্রস্থটিকে শুকোতে সময় দিতেন। ফলে শেষের দিকের কাজে, যেমন এ চিত্রটিতে, মনে হয় যেন পৃথিবীর নানা ভূস্তর একের পর এক চাপানো। বারবার একই জায়গা একের পর এক রঙের হাফটোনে গড়তেন। এবং একেবারে শেষে অতি পাতলা রঙের গ্লেজগুলি দিতেন। তাঁর তুলির আঁচড় ছিল তিশান বা রুবেন্সের থেকে ভিন্ন। তাঁদের আঁচড় হত আকারের চারদিক বেষ্টন করে। রেম্‌ব্রান্টের তুলির আঁচড় যেত আকারকে আড়াআড়ি ব্যেপে, এমন কি কখনও আকার রেখার বিরুদ্ধে। কিন্তু আশ্চর্য, যা কিছু করতেন তাতেই ভাস্বরতা বেড়ে যেত। এই আঁকার পদ্ধতির ভাস্বরতা বা ল্যুমিনসিটিই আসল। মনে হয় যেন রেমব্রান্ট অন্ধকার এবং আলোমাখানো তুলি ব্যবহার করেছেন। ভীষণ শৌখীন লোক ছিলেন। প্রতিকৃতিতে তিনি বোধ হয় দেখতে চান পোযাকের ঐশ্বর্যের চেয়ে তাঁর চোখের, মুখের রেখার এবং মনের ঐশ্বর্য, যা ছবির মধ্যে থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসছে, তা কত বেশী।

চিত্র ১৪। ক্লোদ ল লোরেন : ইওরোপা (১৬৬৭)

ক্লো...কে আধুনিক নিসর্গচিত্রের জনক বলা যায়। একাধারে গাছপালা, পাতা, ফলফুল, জ...মি, জল, সমুদ্রের নিখুঁত নিরীক্ষণ এবং তার প্রতিচ্ছবি। অন্যদিকে এক আদর্শভাব, এম...ন কি আর্কেডিয়ান বা স্বর্গীয় নন্দনকাননধর্মী বলা যায়। ক্লোদ এবং পুস্যাঁ অধিকাংশ ছবি আঁকেন ইটালিতে, কাম্পানিয়াতে। কতকগুলি কনভেনশন, প্রথা বা রেওয়াজের সৃষ্টি করেন। রকমফের ...ত, কিন্তু খুব বেশি নয়। সমুখভূমি হবে মোটামুটি সমতল বা জল, হয়ত একটি নদী। একদিকে, সাধারণত সারা ক্যানভাস বেয়ে উঠবে একটি গাছ বা গাছের গুচ্ছ, ডালপাতা ছড়িয়ে। দেখাবে খানিকটা ছায়াচ্ছন্ন, আকাশে সিলুয়েট করা। অন্যগুলি উজ্জ্বল। অন্যদিকে, আরো দূরে, দ্বিতীয় গাছের গ্রুপ, প্রথমটির ভারসাম্য রেখে। কখনও এই দ্বিতীয় গ্রুপে থাকবে উঁচু জমির উপর একটি পুরনো স্থাপত্যের নিদর্শন। দূরের পশ্চাদ্‌ভূমি হবে সমতল জমি। জল বা সমুদ্র।

দিকচক্রবালে পাহাড় বা সমুদ্র। এক্ষেত্রে জাহাজ। আরো দুটি উপকরণ হচ্ছে সমুখ ভূমিতে নরনারী বা প্রাণী। সাধারণত বাইবেল বা গ্রীক পুরাণের কোন উপাখ্যান। উপরন্তু সবকিছু পরিব্যাপ্ত করে এক অদ্ভুত, উজ্জ্বল আলো। এই আলোই হচ্ছে ক্লোদের সমস্ত ছবির চাবিকাটি। আলোর এই ধরনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রয়োগ ইমপ্রেশনিস্টদের আগে আর কেউ করেনি। এই আলোই দেয় ক্লোদের রচনায় জাদু এবং তীব্র আনন্দ।

চিত্র ৩৫। কাংড়া কলম : রাধার অনুযোগ [গীতগোবিন্দ] (১৭৭৫)

দ্রঃ পরিশিষ্ট : ১। ছবিতে স্থাপত্যে এবং গাছপালার ব্যবহার রোমানেস্ক বা জত্তোর ছবির কথা মনে করিয়ে দেয়

চিত্র ১৮। গোইয়া : পঞ্চম চার্লসের পরিবার (১৮০০)

স্প্যানিশ চিত্রেতিহাসে ছয়জন দিকপাল : এল গ্রেকো, রিবেরা, যুরবারান, ভেলাস্কেথ, গোইয়া এবং পিকাসো। তার মধ্যে গোইয়া তাঁর চারজন পূর্বসূরীর সব কাজ আয়ত্ত করেন। সব থেকে উল্লেখযোগ্য তাঁর তুলির কাজ। বক্তব্যেও তিনি বিরাট পুরুষ মানবনীতি, এবং ন্যায়বোধের গুরু। স্বদেশাভিমান থেকে ওঠে তাঁর ঘৃণা। তরা মে ১৮০৮ এর হত্যাকাণ্ড এবং 'যুদ্ধের ভয়াবহতা' চিত্ররাজিতে তিনি ফুটিয়ে তোলেন যুদ্ধের অমানুষিক বর্বরতা। আরেকটি চিত্ররাজিতে — Los Caprichos-বদ খামখেয়াল — তিনি দেখান মানুষের দুর্মতি, নৃশংসতা, কুসংস্কার—সঙ্গে সঙ্গে যুক্তি ও সত্যের প্রতি আবেদন। তাঁর সঙ্গে থাকে অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রতি শ্লেষ, যেমন মুদ্রিত ছবিটি। সঙ্গে সঙ্গে আসে মানুষের বিরুদ্ধে ও সপক্ষে স্বপ্ন, মনোরঞ্জন চিত্রাদি, যেমন 'নগ্নদেহ মায়া', আবেগ, সাধারণ এবং কুশ্রী জিনিসে নিহিত সৌন্দর্য, ইমপ্রেশনিস্ট নীতির পূর্বাভাষ। প্রতিটি কাজে পরিস্ফুট তাঁর মানবিকতা, পিকাসোর মত। তিনিই প্রথম বিরাট শিল্পী যিনি সমসাময়িক বর্বরতা ও ভয়াবহতাকে শিল্পের উপকরণ হিসাবে নেন। তাঁর খুব কম চিত্রেই কোন 'বরেণ্য নায়ক' থাকত। অধিকাংশ চিত্রেই নায়ক হত সাধারণ জনগণ, শহীদ হত নিতান্ত পার্থিব মানুষ। উদ্ভট ও হাস্যোদ্রেককারী অবস্থার তিনি ছিলেন চরম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রকর।

চিত্র ৪৫। জাক দাভিদ : নেপোলিয়ন ও জোসেফিনের অভিষেক (১৮০৭)

দ্রঃ 'চিত্রে রসবিচার' ও অন্যান্য অধ্যায়।

চিত্র ২০। অ্যাঙ্গর : স্নানরতা (১৮০৮)

আঠারো শতকের শেষে, উনিশ শতকের প্রারম্ভে, নিও-ক্লাসিসিজিসমের হোতা অ্যাঙ্গর। দাভিদের শিষ্য। কিন্তু মূলত পুস্যাঁ ও রুবেন্সের কাছে ঋণী। অ্যাঙ্গরের মতে ড্রয়িং হচ্ছে সব কিছুর মূলে, ড্রয়িংই সব। যদি ড্রয়িং ভাল হয় তবে পেন্টিংও ভাল হবে। তার মতে রঙ হচ্ছে চিত্রের জান্তব অংশ।'রঙকে আস্কারা দিলে বিপদ ঘটতে পারে, ফর্মের নিরলস সাধনার বিঘ্ন ঘটাতে পারে'। রাফায়েলের যুগের পর ড্রইং আউটলাইনে পর্যবসিত হয়েছিল, অ্যাঙ্গরে তা হয়নি। একান্ত নিষ্ঠায় সে-ড্রয়িং প্রতিটি বস্তুর পরিপূর্ণ সুডৌল রূপটি তুলে ধরত। সাধারণত ড্রয়িং বলতে যা বুঝি তা অতিক্রম করে অ্যাঙ্গরের ড্রইং অতি সুচারুরূপ নিল। প্রতিটি বস্তু এবং শরীরের স্পর্শগ্রাহ্যতা বর্ধিত হল।

চিত্র ১৭। দেলাক্রোয়া : লিবার্টি জনতার নেতৃত্ব করছেন (১৮৩০)

উনিশ শতকের ফরাসী চিত্রকলার একজন প্রধান গুরু দেলাক্রোয়া। মনকে

অনুপ্রাণিত করেন। দ্যমিয়ে এবং সেজানও অনুপ্রাণিত হ'ন। বোদলেয়ারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। ক্লাসিসিজমের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসাবে আঙ্গর দেলাক্রোয়াকে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে পেলেন। দেলাক্রোয়াকে কেউ রোমান্টিক বা আধুনিক বললে দেলাক্রোয়া চটে যেতেন। সজ্ঞানে তিনি ছিলেন ক্লাসিসিস্ট, কিন্তু কার্যকালে রোমান্টিক। পুসাার স্তবগান করতেন, কিন্তু আসলে ছিলেন রুবেন্সের ভক্ত। 'প্রাচীনদের চেয়েও রুবেন্স বেশী হোমেরিক'। তাঁর জীবনের প্রতিস্তরে ক্লাসিসিস্ট ভাব এবং রোমান্টিক কাজ বিরোধ বাধিয়েছে। বোদলেয়ার বলতেন 'দেলাক্রোয়া প্যাশনকে বড্ড বেশি প্যাশনেটলি ভালবাসেন, অথচ তিনি অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় যথাসম্ভব দূরত্ব রেখে প্যাশন ফুটিয়ে তুলতে চান।'

চিত্র ৪৪ । গুস্তাভ কুর্বে : আত্মপ্রতিকৃতি, কোলে কুকুর (১৮৪২)

দ্রঃ 'চিত্রে রসবিচার' ও অন্যান্য অধ্যায়।

চিত্র ৪৩ । এডুয়ার মানে : ক্রোকে পার্টি (তারিখ ?)

দ্র : 'চিত্রে রসবিহার' ও অন্যান্য অধ্যায়।

চিত্র ৫ । দ্যমিয়ে : রেলের তৃতীয় শ্রেণীর কামরা (১৮৬২ ?)

দ্যমিয়ে'র উপর শিল্পী হোগার্থ নিশ্চয় বিশেষ গভীর প্রভাব ফেলেন। কারণ দ্যমিয়ে ক্যারিকেচিওরে হোগার্থের মতই মহান। নিজের জীবনে দ্যমিয়ে মীলে এবং গুস্তাভ কুর্বের মত বাস্তবধর্মী বা রিয়ালিস্ট হলেন। পোস্টার তৈরির সিদ্ধহস্ত হয়ে লিথোগ্রাফিতে গেলেন। ফলে তাঁর রীতি হল সরলীকৃত বলিষ্ঠ। বক্তব্য সদা সুস্পষ্ট। রঙও স্বল্প কয়েকটি। ক্লাসিক ঋজুতা, স্পষ্টতা, বলিষ্ঠতা এবং অপেক্ষাকৃত সরল কম্পোজিশন সেইজন্য সম্ভব হয়। বাহুল্য এবং বাহাদুরি বর্জিত। •

চিত্র ১৯ । রেণোয়ার : কালো পোষাকে অল্পবয়স্ক মেয়েরা (১৮৮০)

দ্রঃ 'ছবিতে প্রকাশশক্তি ও অলঙ্কার', 'চিত্রে রসবিচার' এবং অন্যান্য অধ্যায়

চিত্র ৩৯ । ভ্যান গখ : চষা খেত (১৮৯০)

ভ্যান গখ আঁকা শুরু করেন যাকে বলে কমপ্লিমেন্টারি রঙ দিয়ে। কমপ্লিমেন্টারি রঙ তাকেই বলে যেগুলি পরস্পর পরস্পরের উপর প্রকটভাবে ঘাত প্রতিঘাত করে যেমন হলদে এবং ভায়োলেট, কমলা এবং নীল। এই রঙগুলি নিউটোনিয়ান ইন্দ্রধনুর সাক্ষাৎ বিরোধী। নিউটোনিয়ান রামধনুতে কোন রঙ কার পর আসবে বলে দেওয়া যায়! কমপ্লিমেন্টারি রঙে বলা যায় না। ভ্যান গখ তার পর নিজস্ব টেনিক আবিষ্কার করলেন। যে রঙ তিনি চান প্যালেটে প্রথমে সেই রঙ মেশালেন, তার পর পুরু, মোটা, ছোট আকারে চাপ চাপ করে লাগালেন। প্রতিটি পোঁচড়ে পাশের পোঁচড় থেকে স্বতন্ত্র করে লাগানো। ছোট ছোট পোঁচড়ে মিলে ছোট ছোট ফর্ম বা আকারের সৃষ্টি হল। এইভাবে পাশাপাশি বহু সমকেন্দ্রিক বুরুশের প্যাটার্ণ মিলে বহির্মুখী হয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল জলের ঢেউয়ের মত এবং মিশে গেল ঐরকম অন্য একটি ঢেউয়ের ক্ষেত্রের গায়ে।

চিত্র ১২ । সেজান : সাঁৎ ভিক্টোয়ার ও একুইডাক্ট (১৮৯০)

দেলাক্রোয়া এবং কুর্বেকে যিনি গুরু করে জীবন আরম্ভ করলেন, ১৮৬৫ সালের পর তিনি চলে গেলেন, অধরার সন্ধানে। সারাজীবন তাতেই কাটিয়ে দিলেন। এই ছবিটি সেজানের শেষ পর্যায়ের রীতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আমরা যখন কোন দূরের পাহাড়,

বাড়ি, গাছপালা, ঘর দেখি, তখন সেসবগুলি যদি পরিপ্রেক্ষিতের রীতি কঠোরভাবে অনুসরণ না করে আঁকি তাহলে দেখবো সেগুলি একের পর এক জোট পাকিয়ে ক্যানভাসের উপরে ভার্টিকাল ভাবে একত্রিত হচ্ছে। সেজানের কাজে ঠিক তাই হল। এই ভার্টিকাল বিকৃতি তিনি ইচ্ছা করে ঘটালেন। যা দেখছেন সবকিছু, এমন কি তাঁর পায়ের কাছের বস্তু শুদ্ধ এসে ভীড় করেছে। এই ছবিতে সেজান যা দেখাচ্ছেন, বাস্তব চোখে তার বেশ কিছু চোখের দৃষ্টির জমির বাইরে পড়ে যাবার কথা। সেইজন্য তাঁর ছবি অবাস্তব বা বিকৃত (ডিসটর্টেড) দেখায়। কিন্তু আসলে তা নয়, ওয়াইড অ্যাঙ্গল ক্যামেরায় যা ধরা পড়ে তা সাধারণ লেন্সে ভীড় করে ঠেসে দিলে যা হয় তাই। আমরা যদি একটা হলের যে-কোন দেয়ালের মাঝ বরাবর দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে সমুখের দেয়ালের দিকে তাকাই তাহলে পাশের দেয়াল ববাবর দৃষ্টি চালালে দেখব ঘরেব ছাদের লাইনগুলি ডাইনে বাঁয়ে নিচু হয়ে বেঁকে যাচ্ছে। আরো খুঁটিয়ে দেখলে মনে হবে—যেহেতু ছাদের লাইন সরাসরি ঘুরে চলে গেছে—অতএব সে রেখাটি বঙ্কিম। অথচ আমরা 'জানি' যে রেখাটি বঙ্কিম নয়, চর্তুদিকে ঋজু এবং সরল। সেজান এবং তাঁর উত্তরাধিকাবীরা ছবি আঁকায় এই ধবনেব দ্ব্যর্থক, আপাতবিরোধী কূট তত্ত্বের অবতারণা করলেন।

চিত্র ৪০। গোগ্যাঁ : ফলহাতে টাহিটীয় রমণী (১৮৯৩)

চিত্র ৪১। ক্লোদ মনে' : জিভের্নিতে খেত ও পালুই (১৮৯৯)

ছবিটিতে মনে' তাঁর আলোর খেলা এবং পরিপ্রেক্ষিত ভাঙ্গা দেখিয়েছেন। তাঁর প্রত্যেকটি ছবিতে এখন থেকে প্রায় প্রাচ্য পরিপ্রেক্ষিতের রীতি এল। খড়ের পালুইটি সেজানের মত চারদিক ঘুরিয়ে দেখান হয়েছে, যেন মনে' পালুই-এর উপর শূন্যে উঠে দেখছেন। দ্রষ্টব্য চিত্র ৪৩।

চিত্র ১৬। পিসারো : অ্যাভেন্যু দে লোপেরা (১৮৯৯)

পিসারো সেজানকে ইমপ্রেশনিজমে দীক্ষিত করেন। বিপ্লবী মন নিয়ে শুরু করেন। বলতেন লুভরে আগুন ধরিয়ে দেওয়া উচিত। অ্যাটেলিয়ার সুইসে ক্লোদ মনে'র সঙ্গে ১৮৫৯ এবং ১৮৬১তে সেজানের সঙ্গে পরিচয়। আটটি ইমপ্রেশনিস্ট প্রদর্শনীর প্রতিটিতে ছবি দেন। ১৮৮৪-৮৫ সালে জর্জ সোরার সঙ্গে পরিচয় হয়। সোরা তাঁকে পোঁয়াটিলিজমে দীক্ষিত করেন। ইমপ্রেশনিজমের অষ্টম ও শেষ প্রদর্শনীতে তাঁর ছবি, সোরা'র ছবির সঙ্গে, পোঁয়াটিলিস্ট ঘরে টাঙ্গানো হয়। ১৮৮৬ সালে ভ্যান গখের সঙ্গে আলাপ হয়। এই ছবিটিতে পোঁয়াটিলিস্ট রীতিই প্রধান যদিচ পুরনো ইমপ্রেশনিস্ট রীতি এবং ভ্যান গখের তুলির প্রভাবও উঁকি ঝুঁকি মারছে।

চিত্র ৩। পিকাসো : স্টিল লাইফ (১৯০৮)

ছবিটি পিকাসোর রোজ পিরিয়ডের। অর্থাৎ তাঁব জীবনের দুঃখকষ্টের ব্লু-পিরিয়ডের পরবর্তীকালের। দেমোয়াজেল দাভিনিয়র পরে আঁকা ছবিটিতে পিকাসো সেজানের কাজ আরো এগিয়ে নিয়ে গেছেন। টেবিলের উপর জিনিসগুলি তিনি কোন এক জায়গা থেকে দেখছেন না, টেবিলের মধ্যস্থলের উপর শূন্য থেকে যেন দেখছেন। সেইজন্য সেজানের মত ফল বা গ্লাসের চারদিক ঘিরে এঁকেছেন। কোন বিশেষ বিন্দু থেকে পরিপ্রেক্ষিত নিয়ে আঁকা নয়। ছবিটিতে আছে স্ফিয়র, লম্বীকৃত কোন বা পিরামিড, এবং

গ্লাসের দুটি পিঠোপিঠি লাগানো কোন। টেবিলটি গোল। সেজান মারা যান ১৮০৫ সালে। ছবিটি আঁকা হয় ১৯০৮ সালে।

চিত্র ৩৮। মাতিস : পারিবারিক দৃশ্য (১৯১০)

১৯১০ সালে মিউনিখে ইসলামিক আর্টের একটি প্রদর্শনী হয়। মাতিস প্রদর্শনী দেখেন। তাঁর মনে গভীর দাগ কাটে। ক্লে'র মনেও। কিন্তু দুজনের উপর ভিন্ন ভিন্ন ভাবে। মাতিসের মনে পারসী মিনিয়েচারও বিশেষ প্রভাব ফেলে। ছবিতে দেখি মাতিসের দুটি ছেলে ড্রাফট্ খেলছে, তাদের পাশে বই হাতে মেয়ে দাঁড়িয়ে। বাঁ দিকে সোফায় বসে স্ত্রী কাপড়ে নকশা তুলছেন। অন্যান্য ছবিতে মাতিস বড় বড় জমি মোটা মোটা রঙে দেখিয়েছেন, অনেকসময়ে একটি বড় জমিতে শুধু একটিমাত্র রঙ। কিন্তু এছবিতে সারা জমিটি ছোট ছোট অলঙ্কারপূর্ণ চৌখুপিতে ভরা। সর্বত্র অলঙ্কার কার্পেটে, দাবাখেলার বোর্ডে, সোফাকৌচের ঢাকনায়, দেয়াল কাগজে। নানাধরনের অলঙ্কার, সবেতেই অত্যন্ত উজ্জ্বল রঙ। এমন কি ফায়ার প্লেসের গায়েও নকশা। দুটি ধরনের বিপরীত ছন্দের ফলে এবং অলঙ্কারের বাহুল্য সত্ত্বেও কিন্তু জ্যাবড়া বা বিশৃঙ্খল দেখাচ্ছে না। তার জন্য দায়ী প্রথম, ড্রয়িং-এর সরল ছন্দ, দ্বিতীয় রঙের বৈচিত্র্য। হলদে কার্পেটের উপর মাতিস গাঢ় নীল পটি দিয়ে চৌখুপি করলেন। লাল সোফায় হলদে এবং নীল বৃত্ত। সমস্তই ভেবে চিন্তে করা। এই ভাবে নানা ধরনের রঙ দিয়ে বড় জমি বা স্পেস তৈরি করলেন, তার মধ্যে ছেলেদুটিকে দুটি শক্তিশালী ভাস্বর প্লেন হিসাবে তৈরি করলেন। শুধুমাত্র রঙের সাহায্যে স্পেসের মায়া তৈরি করলেন সমুখভূমি, মধ্যভূমি পশ্চাদভূমি। অথচ কোনখানেই ছায়াতপ বা কিয়ারস্ক্যুরো নেই। ফলে পারসী মিনিয়েচারের অন্তরঙ্গতা ত্যাগ করে ছবিটি হল বিরাট, মনুমেন্টাল।

চিত্র ১৩। দেরাঁয়া : পাইন বন (১৯১২)

খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যাবে ছবিটি সুন্দর, মনোরম সরলীকৃত একটি ছন্দ। তার বেশি কিছু নয়। সেজানের অনুকরণ কিন্তু সেজানের সমস্যা, চিন্তা ভাবনা এতে নেই। সুন্দর, লীলায়িত নয়নস্নিগ্ধকর প্যাটার্ণ, তার বেশি নয়।

চিত্র ৪২। মাতিস : ওড়নামুখে নারী (১৯৪২)

চিরাচরিত পদ্ধতিতে পোর্ট্রেট আঁকা না হলেও চরিত্র ফুটে ওঠে। মনে হয় বিশেষ একটি নারীর শরীর, অবয়ব, চাউনি, ভঙ্গী। খুব সুকোমলভাবে শরীরের সমস্তটি তুলি দিয়ে ফোটানো, ফিকে গোলাপীতে। নরম আরামে থাকা নারী মনে হয়। পিছনে হলদে এবং লাল, উপরে ডান দিকে মাস্টার্ড রঙ, আরামে থাকার দ্যোতনা জোগায়। হাত দুটি ছবির নিচে বেঁকিয়ে মিলেছে। পিছনে সবুজ ঘরে রাখা পাতাগাছ, মনে হয় ঘরে রাখা পাতাগাছের মতই মহিলা পেলব। সেই সুকুমারত্ব উজিয়ে দেয় জামার এবং ওড়নার এমব্রয়ডারি ও স্বচ্ছতা। সব মিলিয়ে অতি সযত্নে তৈরি চীনেমাটির পুতুলের কথা মনে করিয়ে দেয়।

চিত্র ৩৭। বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় : মধ্যযুগের সন্তগণ (১৯৪৭)

দ্রঃ 'রূপভেদ ও প্রমাণ বা প্ল্যাস্টিক ফর্ম' ও অন্যান্য অধ্যায়।

চিত্র ৩৬। যামিনী রায় : মেরী ও খ্রীষ্ট (তারিখ ?)

দ্রঃ 'রঙ' ও অন্যান্য অধ্যায়।